প্রথম প্রকাশ
কবিপক্ষ ।১৩৫৫

প্রকাশক
শ্রীনির্মল কুমার সাহা
১৮বি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

ব্লক, প্রচ্ছদ ও চিত্র মুদ্রণে
ন্যাশানাল হাফটোন কোম্পানী
৬৮ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর
মদনমোহন চৌধুরী
শ্রীদামোদর প্রেস
৫২এ, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

RABINDRA BICHITRA

Edited by : Biswanath Dey

Price : Rs. Eight only

বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত

'স্মৃতি' পর্যায়ে আমাদের অন্যান্য বই

সূচীপত্র

শান্তিনিকেতনের স্মৃতি

প্রাসঙ্গত

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীত বিষয়ক রচনা সংগ্রহ করে এই 'রবীন্দ্র বিচিত্রা' সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করা হ'লো। মানুষ রবীন্দ্রনাথ এবং পুরোনো দিনের শান্তিনিকেতনের স্মৃতিকথাও কয়েকটি সংগৃহীত হয়েছে এই সঙ্গে। এ লেখাগুলিতে পুরোনো দিনের হারিয়ে যাওয়া সবুজ শ্যামল বর্ণের নরম মাটির শান্তিনিকেতনের স্মৃতিচিত্র ফুটে উঠতে দেখা যাবে, যা আজকের দিনে শান্তিনিকেতনের মাটিতে দাঁড়ালে উপলব্ধি করা কোনমতেই সম্ভব নয়।

এ বইয়ের ভূমিকা লিখতে বসে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু লেখা ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছুই হবে না, কারণ সে-কথা নানা বর্ণে, নানা চিত্রে লিখে এই সংকলন-গ্রন্থের রচনাকাররা বইটি বিচিত্রিত করে তুলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন সম্পর্কিত আমার প্রথম সংকলন-গ্রন্থ 'রবীন্দ্র স্মৃতি' প্রকাশিত হয় ১৯৬১তে, রবীন্দ্র-জন্ম-শতবর্ষপূর্তির প্রাক্কালে। তবে মনোযোগী পাঠক লক্ষ্য করলে বুঝবেন 'রবীন্দ্র স্মৃতি' এবং 'রবীন্দ্র বিচিত্রা'র মধ্যে পার্থক্য অনেক।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির শেষ নেই, তাঁর সম্পর্কে নিত্য-নতুন লেখারও শেষ নেই—এ-কথাই আমার বার-বার মনে হ'য়েছে।

—বিশ্বনাথ দে

১৩ই নভেম্বর ১৯১৩

বন্ধু

পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন
জয়মাল্য ভূষিত না দেখিয়া বেদনা
অনুভব করিয়াছি। এতদিনে
দুঃখ দূর হইল। দেবতার বরে
তোমার কাজ কি কখন ধরার
কর্ম্মের অবসান হইবে? চিরকাল
শক্তিশালী হও; চিরকাল
অতৃপ্ত হও। ঈশ্বর তোমার
চির সহায় হউন।

তোমার
জগদীশ

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর শুভেচ্ছা-লিপি।

চেয়ে দেখো তার পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জ্বালা;
তোমার তপস্যাক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা
বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয়-সন্ধ্যাকালে
কবি-হাতে বরমাল্য সে বন্ধু পরায়েছিল ভালে;
অপেক্ষা করে নি সে তো জনতার সমর্থন তরে,
দুর্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যথালি পরে।
আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, ধন্য ধন্য তুমি,
ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
১৪ অগ্রহায়ণ
১৩৩৫

১৯২৮ সালে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ৭০ বছরের জয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের শুভেচ্ছা-লিপি।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের নবাভ্যুদয়ে নূতন প্রভাতের অরুণ-কিরণ-পাতে যখন নব-শতদল বিকশিত হইল, ভারতের সনাতনী বাগ্‌দেবতা তদুপরি চরণ অর্পণ করিয়া দিগন্তে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনি দিগ্বধূগণ প্রসন্ন হইলেন, মরুদ্‌গণ সুখে প্রবাহিত হইলেন, বিশ্বদেবগণ অন্তরীক্ষে প্রসাদপুষ্প বর্ষণ করিলেন, ঊর্ধ্বব্যোমে রুদ্রদেবের অভয়ধ্বনি ঘোষিত হইল, নবপ্রবুদ্ধ সপ্তকোটি নরনারীর হৃদয় মধ্যে ভাবধারা চঞ্চল হইল। বঙ্গের কবিগণ অপূর্ব স্বরলহরীর যোজনা করিয়া দেবীর বন্দনাগানে প্রবৃত্ত হইলেন; মনীষীগণ স্বহস্তাবচিত কুসুমোপহার তাঁহার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

কবিবর···এক শুভদিনে তুমি যখন বঙ্গজননীর অঙ্কশোভা বর্ধন করিয়া বাঙ্গালার মাটি ও বাঙ্গালার জলের সহিত নূতন পরিচয় স্থাপন করিলে, বঙ্গের নব-জীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন তোমার অর্ধস্ফুট চেতনাকে তরঙ্গায়িত করিয়াছিল; সেই তরঙ্গাভিঘাতে তোমার তরুণ জীবন স্পন্দিত হইল; সেই স্পন্দন প্রেরণায় তোমার কিশোর হস্ত নব নব কুসুমসম্ভার চয়ন করিয়া বাণীর অর্চনায় প্রবৃত্ত হইল। তোমার পূর্বগামীগণের স্নিগ্ধনেত্র তোমাকে বর্ধিত করিল; অনুগামীগণের মুগ্ধনেত্র তোমাকে পুরস্কৃত করিল; বাগ্‌-দেবতার স্মেরাননের শুভ্রজ্যোতি তোমার ললাটদেশে প্রতিফলিত হইল। তদবধি বাণীমন্দিরের মণিমণ্ডিত নানাপ্রকোষ্ঠে তুমি বিচরণ করিয়াছ; রত্নবেদীর পুরোভাগ হইতে নৈবেদ্যকণা আহরণ করিয়া তোমার দেশবাসী ভ্রাতা-ভগিনীকে মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়াছ; তোমার ভ্রাতা-ভগিনী দেবপ্রসাদের আনন্দ-সুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। বীণাপাণির অঙ্গুলিপ্রেরণে বিশ্বযন্ত্রের তন্ত্রীসমূহে অনুক্ষণ যে ঝঙ্কার উঠিতেছে, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে তোমার অগ্রজাত কবিগণের পশ্চাতে আসিয়াও তুমি তাহা কর্ণগত করিয়াছ; সুপর্ণরূপিণী

গায়ত্রী কর্তৃক গন্ধর্বরক্ষিত অমৃতরসের দেবলোকে নয়নকালে মর্ত্ত্যোপরি যে ধারাবর্ষণ হইয়াছিল, পৃথিবীর ধূলিরাশি হইতে নিষ্কাশিত করিয়া নরলোকে সেই অমৃত-কণিকার বিতরণে তোমার সহকারিতা গ্রহণ দ্বারা তাঁহারা তোমায় কৃতার্থ করিয়াছেন। পঞ্চাশৎ সংবৎসর তোমাকে অঙ্কে রাখিয়া তোমার শ্যামা জন্মদা তোমাকে স্নেহপীযুষে বর্ধন করিয়াছেন; সেই ভুবনমনোমোহিনীর উপাসনা-পরায়ণ সন্তানগণের মুখ স্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ বিশ্বপিতার নিকট তোমার শতায়ুঃ কামনা করিতেছেন।

কবিবর, শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন।

তুমি যখন নিতান্ত বালক, তখন হইতেই তোমার কবিতায় বাঙালী মুগ্ধ। তোমার যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তোমার প্রতিভা বিকাশ হইতে লাগিল। সে প্রতিভা যেমন একদিন দেশ হইতে দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, তেমনি সাহিত্যের সকল মূর্তিই আয়ত্ত করিতে লাগিল। সে প্রতিভা প্রথম কবিতায় আবদ্ধ ছিল, ক্রমে গদ্য, নাটক, নবেল-রচনা, ছোট গল্প, বড় গল্প, সমালোচনা, রাজনীতি, সমাজনীতি, কর্মনীতি এইরূপে সমস্ত সাহিত্য-সংসারে ছড়াইয়া পড়িল। তুমি সাহিত্যের যে মূর্তিতেই হাত দিয়াছ, তাহাকে উদ্ভাসিত ও সজীব করিয়া তুলিয়াছ। কারণ তোমার প্রাণ আছে, সে প্রাণে যেমন মধুরতা আছে, তেমনি তেজ আছে—যেমন মোহিনী-শক্তি আছে, তেমনি উন্মাদিনী শক্তি আছে—যেমন সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছে তেমনি দূরদৃষ্টি আছে। তোমার প্রতিভা যেমন গড়িতে পারে, তেমনি ভাঙ্গিতে পারে, যেমন মাতাইতে পারে—তেমনি ঠাণ্ডা করিতে পারে—যেমন কাঁদাইতে পারে তেমনি হাসাইতে পারে। কিমধিকং, তোমার প্রতিভা সর্বতোমুখী, সর্বতঃপ্রসারী এবং সর্বতোমুগ্ধকারী। সঙ্গীতের সহিত সাহিত্যের মিলনে তোমার হাতে উভয়ের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, তোমাকেও যশোমন্দিরের উচ্চ চূড়ায় তুলিয়া দিয়াছে।

ইংরাজ রাজত্ব হইয়া অবধি তোমার পূর্বপুরুষগণ ধনে, মানে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, সদ্‌গুণে সাহসে বাঙ্গালায় অতি উচ্চ আসন অধিকার করিয়া আসিতেছেন। তোমার প্রতিভায় সেই বংশের গৌরব উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর—উজ্জ্বলতম হইয়া উঠিয়াছে। তোমার গুণে বাঙ্গালা তো চিরদিনই মুগ্ধ—ভারত গৌরবান্বিত, এখন পূর্ব ও পশ্চিম, নূতন ও পুরাতন সকল মহাদেশই তোমার প্রতিভায় উদ্ভাসিত। আশীর্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া সমস্ত পৃথিবী

আরও উদ্ভাসিত কর। তোমার বংশই দীর্ঘজীবীর বংশ, তুমি শতায়ু হও, সহস্রায়ু হও। তোমার বয়স যতই পাকিতেছে, অভিজ্ঞতা বাড়িতেছে, ততই মানুষের ব্যথায় তোমার মন গলিতেছে, তোমার বীণার ঝঙ্কার গভীর হইতে গভীরতর হইতেছে। মানবের মঙ্গলের জন্য তোমার আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ যতই বাড়িতেছে ততই তুমি ব্যাকুল হইয়া মঙ্গলময়ের মঙ্গলাসনের সমীপবর্তী হইতেছ। তোমার মঙ্গল বাসনা চরিতার্থ হউক, তোমার নাম অক্ষয় হউক, তুমি অমর হইয়া ভারতের মঙ্গল কামনা করিতে থাকো। তুমি দিগ্বিজয় করিয়া, বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়া, আমার সোনার বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়াছ; তুমি আমাদের ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা ও স্নেহের উপহার-স্বরূপ এই পুষ্পমাল্য গ্রহণ করো। বিধাতার সৃষ্টিতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু সুরভি, সব এই পুষ্পেই আছে। আমাদের যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু সুরভি, তাহা তোমাতেই আছে। আইস, উভয়ে মিলন করিয়া দিয়া আমরা কৃতার্থ হই।

রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা করিয়া, বাঙ্গালী আজ আপনাকেই লোক সমক্ষে সম্বর্ধিত করিয়াছে। কোনো জাতির যখন আত্মচৈতন্যের উদয় হয়, তখন তারা এইরূপ করিয়া আপনাদের সমাজের মহৎ লোকদিগের মহত্ত্বের সমাদর করিয়া, পরোক্ষভাবে, আপনাদিগকে বাড়াইয়া তোলে। যে গুণের আদর জানে না, সে আপনিও গুণহীন হইয়া পড়িয়া থাকে। যে যোগ্য ব্যক্তির উপযুক্ত সম্বর্ধনা করিতে কুণ্ঠিত হয়, সে আপনিও যোগ্যতা-ভ্রষ্ট হইয়া রহে। বাঙ্গালী একদিন গুণীর আদর ভুলিয়া গিয়াছিল। যোগ্যের সম্বর্ধনা যে সমাজের একটা প্রধান কর্তব্য বাঙ্গালার সমাজ একদিন এ বিধানকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের অন্ত্যলীলা তার সাক্ষী। কিন্তু বাঙ্গালার সে আত্মবিস্মৃতি ক্রমে ঘুচিয়া যাইতেছে। এই কয় বৎসরে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই সম্বর্ধনাও তারই প্রমাণ।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধ আপনার প্রতিভা বলেই এইরূপ সমৃদ্ধ রাজসিক সম্বর্ধনা পাইয়াছেন, একেবারে এত বড় কথাটা বলিতেও সঙ্কোচ হয়। সরস্বতীর বরপুত্র হইয়াও রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্মীর কোমল অঙ্কেই ভূমিষ্ঠ হন। আজীবন তিনি সেই সম্পদের মধ্যেই লালিত-পালিত, সেবিত-বর্ধিত হইয়া আসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি বা মনীষী নহেন। তিনি "প্রিন্স" দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী ঠাকুর বংশের কুল-প্রদীপ। বাঙ্গালার বুনিয়াদী ও ইংরেজের বানানো রাজ-রাজড়ার সঙ্গে তাঁর পরিবার-পরিজনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাঁর কুলের গৌরব, রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক কবি-প্রতিভার সঙ্গে মিলিত হইয়া স্বর্ণ-সোহাগা যোগ সম্পাদন করিয়াছে। এরূপ যোগাযোগ সংসারে বিরল। এই শুভ যোগ না হইলে আজ রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর দ্বারা যে সমারোহ

সহকারে সম্বর্ধিত হইয়াছেন, সেরূপভাবে সম্বর্ধিত হইতেন কিনা সন্দেহের কথা।

ইহাতে রবীন্দ্রনাথের অগৌরবের কথা নাই। যেখানেই নানা ভাবের, নানা চরিত্রের, নানাবিধ শিক্ষাদীক্ষাপ্রাপ্ত নানা লোকে সমবেত হইয়া এক সঙ্গে কোন পূজা-অর্চনার আয়োজন করে, সেখানে এরূপ ভাবের খিচুড়ী পাকিয়া যাইবেই। এক্ষেত্রে কখনো সকলে এক ভাবাপন্ন হইয়া আসে না। কেহ বা অর্চিতের রূপে মুগ্ধ হইয়া আসে, কেহ বা তার গুণে বশ হইয়া আসে, কেহ বা সার্থের সন্ধানে, কেহ বা পরমার্থের অন্বেষণে আসে। আর কেহ বা সম্পূর্ণরূপেই উদাসীন ও উদ্দেশ্যহীনভাবে, শুধু যজ্ঞের জনতা বৃদ্ধি করিবার জন্য পূজাস্থানে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এই সকলের দ্বারা উপাসকের অধিকারই জ্ঞাপিত হয়। উপাসকের ক্ষুদ্রতার দ্বারা কুত্রাপি উপাস্যের যোগ্যতার কোনো হানি হয় না। যিনি যেভাবেই রবীন্দ্র সম্বর্ধনায় যোগ দিন না কেন, তাঁর ভাব তাঁহাকেই কেবল ক্ষুদ্র বা মহৎ করিয়াছে, তদ্বারা রবীন্দ্রনাথের যোগ্যতার কিছুই হ্রাস-বৃদ্ধি হয় নাই। এ যোগ্যতা রবীন্দ্রনাথের কুলের নহে। এ যোগ্যতা তাঁর কৌলিক ধন মর্যাদার নহে। এ যোগ্যতা তাঁর অলৌকিক কবি-প্রতিভার। তাঁর পৈত্রিক কুল ও ধনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই কবি-প্রতিভার এরূপ মণি-কাঞ্চন যোগ না থাকিলে, বাঙ্গালী হয়ত আজ এইভাবে তাঁর সে শুদ্ধ সাত্ত্বিকী যোগ্যতার সম্বর্ধনা করিত না। কিন্তু তাহাতে কেবল আমাদের হীনতা প্রকাশিত হইত, রবীন্দ্র-প্রতিভার অযোগ্যতা প্রমাণিত হইত না।

বাঙ্গালা-ভাষা ও বাঙ্গালা-সাহিত্যকে যাঁহারা এই কালে অভূতপূর্ব শ্রীসম্পদে বিভূষিত করিয়াছেন ; বাঙ্গালীর জ্ঞান ও বাঙ্গালীর ভক্তিকে, বাঙ্গালীর আদর্শ ও বাঙ্গালীর আশাকে, বাঙ্গালীর ধর্ম ও বাঙ্গালীর কর্মকে যাঁহারা ইদানীন্তনকালে নানা প্রকারে ফুটাইয়া ও বাড়াইয়া তুলিয়াছেন ; রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহাদের অগ্রণী দলভুক্ত একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। ডাক্তার যেমন শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া

শরীরতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন, সাহিত্য-সমালোচক যদি সেই প্রণালীতে রবীন্দ্রনাথের চিত্তের ও চরিত্রের বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করেন, তবে এদিক ওদিক দিয়া অপূর্ণতা খুঁজিয়া পাইবেন, জানি। বাঙ্গালার অপরাপর শ্রেষ্ঠ কবিদিগের তুলনায় রবীন্দ্র-প্রতিভার সমালোচনা করিলে, তিনি তাঁহাদের চাইতে কোথায় বড় বা কোথায় ছোট, এ সকল কথা লইয়া তর্ক-বিতর্ক উঠিতে পারে, ইহাও মানি। বাঙ্গালা গদ্যে রবীন্দ্রনাথের দান কতটা ও স্থান কোথায়, এ প্রশ্ন লইয়াও মতভেদ হইতে পারে, স্বীকার করি। রবীন্দ্রনাথের ধর্মের সাধনা ও সমাজের আদর্শ সর্ববাদীসম্মত হওয়া সম্ভব নহে; এ সকল মতান্তর অনিবার্য। কিন্তু এ সকল খণ্ডতা দ্বারা কোনো মহীয়সী প্রতিভার বিচার-বিবেচনা হয় না, হইতে পারে না। কোনো কিছুর সত্যকে তার আংশিকতার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রূপের যাচাই করিতে হইলে তাহাকে সমগ্রভাগে দেখিতে হয়, ভাগ ভাগ করিয়া দেখিলে সত্য দেখা হয় না। রূপ বস্তুটা সমগ্রেই থাকে, একত্বেই বিরাজ করে, খণ্ডে খণ্ডে পৃথকভাবে তাহাকে পাওয়া যায় না; নাক, কান, চোখ, হাত, পা, চুল, রং—এ সকল খুঁটিনাটি ধরিলে প্রকৃত রূপের পরিচয় পাওয়া যায় না, তার ঠিক মূল্য নির্ধারণও সম্ভব হয় না। যাঁহারা খুঁটিনাটি ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিচার আলোচনা করিতে যাইবেন, তাঁহারা কদাপি সে প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাইতে পারিবেন না। রবীন্দ্রনাথ কবিই। রবীন্দ্রনাথ শক্তিশালী লেখক। রবীন্দ্রনাথ জনপ্রিয় লোকনায়ক। জাতীয় জীবনের বিশাল কর্মক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ধর্মপ্রচারক ও সমাজ-সংস্কারক। এই ত্রিশ বৎসর কাল তাঁহার অলোক-সামান্য প্রতিভা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন বিভাগে আত্ম-প্রকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইয়াছে ঋজু কুটিলভাবে, তির্যক গতিতে, তাঁহার জীবন ও কর্মস্রোত এই পঞ্চাশ বৎসর কাল এক নিত্য লক্ষ্যাভিমুখে ছুটিয়াছে। তিনি নানা সময়ে নানা কথা কহিয়াছেন, নানা মত প্রচার করিয়াছেন; নানা আদর্শের অনুসরণ করিয়াছেন, অথচ তাঁর জীবনে ও চিন্তায়, ভাবে ও কর্মে এই সকল বিভিন্ন আদর্শ ও

অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যাহা সর্বদা আত্মপ্রকাশের প্রয়াস পাইয়াছে, সে বস্তু এক, বহু নহে ; সে বস্তুর রূপ অনেক, কিন্তু স্বরূপ এক। সেই স্বরূপেই রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে বুঝিতে হইলে, সর্বাদৌ তাঁর এই ভিতরকার স্বরূপটিকে ধরিতে হইবে।

আর আপনার স্বরূপে রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানীও নহেন, কর্মীও নহেন, কিন্তু কবি। এই কবি বস্তু কি, তাহা দেখিলে চেনা যায়, কিন্তু মুখে বলিয়া বোঝানো সহজ নহে। রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলা যাইতেও বা পারে, কিন্তু রসাত্মক বাক্য রচনায় নিপুণতা থাকিলেও, কেহ সত্য কবি নাও হইতে পারেন। চোখে যাহা দেখা যায় না, তাহাই দেখা ; কানে যাহা শোনা যায় না, তাহাই শোনা ; যাহা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ নহে, তাহারই প্রত্যক্ষ লাভ করা, আর এ সকল অতীন্দ্রিয় বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিয়া ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ রূপরসের সঙ্গে তাহাদিগকে মিলাইয়া দিয়া, অদ্ভুত অদ্ভুত ভাবজগতের সৃষ্টি করা, ইহাই কবির সত্যধর্ম। প্রকৃত কবি তর্ক করেন না, যুক্তি করেন না, বিচার করেন না, আলোচনা করেন না, কেবল আপনার অন্তশ্চক্ষুতে সত্য ও সৌন্দর্য দেখেন, আর এই রূপে যাহা দেখেন, তাহাই ভাষার তুলিকায় আঁকিয়া লোকসমক্ষে ধারণ করেন। এই অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি কবির প্রাণ। এইজন্য ঋষিদিগের ন্যায় কবিও দ্রষ্টা কিন্তু দার্শনিক নহেন, জ্ঞাতা কিন্তু বৈজ্ঞানিক নহেন। দার্শনিক সম্যক বিচারের উপরে আপনার সিদ্ধান্তকে স্থাপন করেন। কবি শুদ্ধ আত্মানুভূতির উপরে সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বিচারের জন্য চারিদিক দেখা আবশ্যক। শুদ্ধ অনুভূতির জন্য এইরূপ সম্যক দর্শন নিষ্প্রয়োজন।

আমরা আজিকালি যাহাকে বিজ্ঞান বলি—যাহা প্রকৃতপক্ষে কেবল জড়বিজ্ঞান মাত্র—এই বিজ্ঞানও বিষয়ীকে পশ্চাতে রাখিয়া বিষয়কেই সর্বদা আগাইয়া দেয়। জ্ঞাতার নহে, কিন্তু জ্ঞেয়ের প্রকৃতি ও গুণাদির পরীক্ষা করাই এই বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং এই বিজ্ঞান জ্ঞেয় বিষয়ের বিশ্লেষণ করিয়া তাহার গুণ ও ক্রিয়াদি আবিষ্কার করিতে ব্যস্ত। এই পথে যেভাবে যতটুকু সত্য পাওয়া

যায়, বৈজ্ঞানিক তারই অন্বেষণ করেন। কিন্তু কবির পথ এ নহে। কবি বস্তুর ভিতরকার গুণাগুণের প্রতি লক্ষ্য করেন না, কিন্তু বস্তু-সাক্ষাৎকারে তাঁর আপনার অন্তরে কোন্ রসের কতটা উদ্রেক হইল, তাহাই দেখেন ও আস্বাদন করেন। বৈজ্ঞানিক যেরূপ বস্তুতন্ত্রতা চাহেন, কবির সেরূপ বাহ্য বস্তুতন্ত্রতার একান্তই প্রয়োজনাভাব। বৈজ্ঞানিকের অধিকার বাহিরে, বিষয় জগতে; কবির অধিকার ভিতরে, অন্তর্জগতে। বৈজ্ঞানিক বহির্মুখীন এবং বিষয়াভিমুখীন, কবি অন্তর্মুখীন ও আত্মাভিমুখীন। বৈজ্ঞানিক বাহিরের প্রামাণ্য না পাইলে, সত্যের প্রতিষ্ঠা হইল বলিয়া বিশ্বাস করেন না। কবি ভিতরের ভাবের, রসের, আত্মানুভূতির প্রামাণ্যকেই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট মনে করিয়া বাহিরের প্রামাণ্যের প্রতি উদাসীন হইয়া থাকেন। কবিতে ও বৈজ্ঞানিকে এই প্রভেদ। অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মানুভূতি, এই সকলই কবি-প্রতিভার স্বরূপ লক্ষণ যে কবির কবিত্বে যতটা বেশী প্রকাশিত হয়, তাঁর কবি-প্রতিভাকে সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে।

এই কষ্টিপাথর দিয়া পরীক্ষা করিলে, রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভাকে কেবল বাঙ্গালার নহে, সমগ্র সভ্যজগতের কবিসমাজে অতি উচ্চ আসন দিতেই হইবে! শব্দ-সম্পদে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ কবি আরও আছেন। চিত্রাঙ্কনের চাতুর্যেও তাঁহার সমকক্ষ কিম্বা তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিল্পীও পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু রসানুভূতির তীক্ষ্নতা ও অধ্যাত্ম-দৃষ্টির প্রসার ও গভীরতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পরে, বাঙ্গালায় জন্মিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। আর কালধর্মবশতঃ বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যেও যতটা প্রসার ঘটিবার অবসর হয় নাই, যুগ প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের সে প্রসার ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে রবীন্দ্রনাথ অনুভূতির বিস্তৃতে ও অনুভাব্য বিষয়ের বিচিত্রতাতে যতটা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, অন্য দিকে সেই পরিমাণে তাঁর রসানুভূতির গভীরতা ও বাস্তবতা বৈষ্ণব কবিদিগের অপেক্ষা হীন

বলিয়া মনে হয়। বৈষ্ণব কবিগণ কেবল কবি ছিলেন না, অতি উচ্চ অধিকারের সাধকও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথেরও ধর্মপিপাসা প্রবল। সাধনের আকাঙ্ক্ষাও বহুদিন হইতেই জন্মিয়াছে। আপনার অলৌকিক কবি-প্রতিভার স্ফূরণেই তিনি জীবনের সার্থকতা লাভ হইল মনে করেন নাই। ধর্মকে এবং ব্রহ্মকে না পাইলে, তাঁহার সকলি বিফল হইয়া গেল,—রবীন্দ্রনাথের এই ভাবটা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাঁহার আপন সম্প্রদায় মধ্যে যে সাধন প্রচলিত আছে, সে সাধনেও রবীন্দ্রনাথ এখন আর উদাসীন নহেন। কিন্তু বৈষ্ণব-কবিদিগের সাধনায় এমন একটা বস্তুতন্ত্রতা ছিল, আমাদের এই নবীন-যুগে প্রমুক্ত সাধনায় সে বস্তুতন্ত্রতা নাই।

প্রাচীন ধর্ম সকলেই গুরুমুখী। সকলেই অবতাররূপে ভগবানের একটা বহিঃপ্রকাশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণ ভগবানের দ্বিবিধ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এক, অন্তরে—চৈত্যগুরু-রূপে ; অপর, বাহিরে—মোহান্তগুরুরূপে। এই জন্য তাঁদের সাধনা যুগপৎ অন্তর্মুখীন ও বস্তুতন্ত্র হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তে ও সাধনায় কেবল চৈত্যগুরুর স্থান আছে, বৈষ্ণবেরা যাহাকে মোহান্ত-গুরু বলেন, তার স্থান নাই। ভগবান চৈত্যগুরুরূপে জীবের অন্তরে, তার ভিতরকার জ্ঞানভাবাদির ভিতর দিয়া, তার স্বানুভূতিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হন। চৈত্যগুরুকে অগ্রাহ্য করিলে চলে না। কিন্তু এই চৈত্যপ্রকাশ আংশিক, পূর্ণ নহে। এই প্রকাশে জীবের অহংবুদ্ধি ভগবানকে ওতপ্রোতভাবে ঘেরিয়া থাকে। এখানে জীব অনেক সময় আপনার প্রাকৃত বুদ্ধির (বুদ্ধির ?) সিদ্ধান্ত ও অসংস্কৃত প্রবৃত্তির খেয়ালকে ইন্দ্রিয়বিকারপ্রসূত বিবিধ রসরাগে রঞ্জিত করিয়া ভগবৎ প্রকাশ বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে। মোহান্তগুরু এই ভ্রম নিরস্ত করিয়া থাকেন। চিত্তে যে ভগবৎপ্রকাশ হয়, তাহা যখন মোহান্তগুরু বা সদগুরুতে তাঁর যে অধিষ্ঠান হয়, তার সঙ্গে মিলিয়া যায়,—চৈত্যপ্রকাশ ও মোহান্তপ্রকাশ যখন একে অন্যের সমর্থক ও পরস্পরকে প্রতিষ্ঠিত করে, তখন ভিতরকার আদর্শ ও ভাব

সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র হয়। বৈষ্ণব সাধনাতে ভিতর-বাহিরের এই অপূর্ব সমাবেশ আছে বলিয়া বৈষ্ণব কবিগণ একান্ত অন্তর্মুখীন হইয়াও অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কদাপি বস্তুতন্ত্রতা-ভ্রষ্ট হন নাই। রবীন্দ্রনাথের সাধনার সঙ্গে তুলনায় বৈষ্ণব কবিদিগের সাধনার ইহাই বিশেষত্ব। আর এই বস্তুতন্ত্র সাধনগুণেই তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে কোনো কোনো দিকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন, নতুবা তাঁদের প্রতিভা ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাতে জাতিগত শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট ভেদে কোনো বিশেষ তারতম্য আছে কিনা সন্দেহ।

যে ঐকান্তিকী অন্তর্মুখীনতা ও রসানুভূতি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত করে, তাহাই আবার তাঁর দুর্বলতারও মূল কারণ হইয়া আছে। একদিক দিয়া একান্ত অন্তর্মুখীন প্রতিভা যেমন আপনার ভিতরকার ভাব গ্রহণ করিয়া থাকে ও তাহাতে একান্তভাবে আত্মসমর্থন করে, অন্যদিকে সেইরূপ সর্বদা একান্তভাবে বাহিরের প্রেরণারও অধীন হইয়া রহে। একান্ত অন্তর্মুখীন প্রতিভা সত্যের একদেশ মাত্র প্রত্যক্ষ করে। সত্য কেবল বাহির লইয়া নহে, কেবল ভিতর লইয়াও নহে। বাহির ও ভিতর, এই দুই অঙ্গ। এই দুই অঙ্গে সত্য পূর্ণতা লাভ করে। বাহিরের সহিত ভিতরের যে সম্বন্ধ তাহা আকস্মিক নহে, অঙ্গাঙ্গী। একটিকে ছাড়িয়া অপরটিকে ধরা সম্ভব নহে। 'যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে' এই কথা যেমন সত্য, যাহা পাই না ব্রহ্মাণ্ডে, তাহা জাগে না ভাণ্ডে একথাও তেমনি সত্য। ভাণ্ডকে ছাড়িয়া ব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার। ব্রহ্মাণ্ডকে ছাড়িয়া ভাণ্ড শূন্য, নিরাকার। আর অন্ধকার ও নিরাকার উভয়ই জ্ঞানসীমার বহির্ভূত। দুইএর কোনোটাই জ্ঞানগোচর করা সম্ভব নহে। একান্ত অন্তর্মুখীন বুদ্ধি ও প্রতিভা কেবল ভাণ্ডেতেই, কেবল ভিতরকার অনুভূতির মধ্যেই, সত্যের প্রামাণ্য অন্বেষণ ও প্রতিষ্ঠা করিতে চায়; ব্রহ্মাণ্ডের বা বহির্বিষয়ের প্রামাণ্যের প্রতি দৃকপাত করে না। ইহার ফলে মতে ও সত্যে, কল্পনাতে ও বস্তুতে মূলত কোনো প্রভেদ আর থাকে না। এ অবস্থায় পরিণামে কেবল

ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই বস্তুর প্রমাণ্য হইয়া দাঁড়ায় এবং একমাত্র অনুভূতিই সত্যের আসর অধিকার করিয়া বসে। সত্যের সার্বজনীনতা রাখা তখন একান্ত দুষ্কর হইয়া উঠে। যে তত্ত্বে এই সার্বজনীনতা রক্ষা পায়, রবীন্দ্রনাথ এখনো সে তত্ত্বকে ভাল করিয়া ধরিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আর তাঁর অলৌকিক প্রতিভার ঐকান্তিকী অন্তর্মুখীনতাই এ পথে সিদ্ধির অন্তরায় হইয়া আছে।

মানুষ যতই কেন অন্তর্মুখীন হউক, কিছুতেই সহজে বাহিরের প্রেরণার হাত এড়াইতে পারে না। বৈদান্তিক সাধনে বাহিরের সঙ্গে সর্বপ্রকারের সম্বন্ধ ছেদনের পন্থা ও প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সে পথ সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রশস্ত, গৃহীর সাধ্যায়ত্ত নহে। সে পথে চলিতে গেলে, যথাসম্ভব বিষয়ের সঙ্গে সর্বপ্রকারের সম্পর্ক ছেদন করা আবশ্যক হয়। রবীন্দ্রনাথ সে পথের পথিক নন। "ভিক্ষাশনঞ্চ জীবিতম্" তাঁর জীবনের ধর্ম বা আদর্শ নহে। রবীন্দ্রনাথ গৃহী। রবীন্দ্র-নাথ সংযমী, কিন্তু কখনো সন্ন্যাসী ছিলেন না। সুতরাং বাহিরের সম্পর্ক ও প্রেরণা হইতে তিনি মুক্তিলাভ করেন নাই। আর এই জন্য ক্ষণে ক্ষণে বহির্বিষয়ের তাড়নায়, বাহিরের অভিনব অবস্থায় বা অভিজ্ঞতার আঘাতে এক একবার রবীন্দ্রনাথের মনগড়া জগৎ ভাঙিয়া চুরিয়া যায় ও তাহাকে আবার নূতন করিয়া জীবনের সমস্যাভেদে নিযুক্ত হইতে হয়।

এই ঐকান্তিকী অন্তর্মুখীনতা রবীন্দ্রনাথের পৈত্রিক বস্তু। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেও ইহা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। আধুনিক যুগের ধর্মসংস্কারকদিগের ইহা একরূপ সাধারণ ধর্ম বলিলেও হয়। যে ব্যক্তিত্বাভিমান আমাদের দেশে ও অন্যত্র শাস্ত্রগুরুর প্রয়োজন ও প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া, আপনার ধর্মের প্রামাণ্যকে একান্তভাবে প্রাকৃত বুদ্ধি-বিচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হয়, তাহা এই ঐকান্তিকী অন্তর্মুখীনতার ফল। এই অন্তর্মুখীনতার আতিশয্য হইতে, ইংরেজীতে যাহাকে subjective Individualism বলে, তাহার উৎপত্তি হয়। এই নিঃসঙ্গ স্বানুভূতির উপরে বহুদিন

হইতে আমাদের ব্রাহ্মসমাজের ধর্মের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে। যাঁরা শাস্ত্র-গুরু বর্জন করিয়া ধর্মসাধনে প্রয়াসী হইবেন, তাঁদের পক্ষে এই subjective individualism বা ব্যক্তিগত অনুভূতির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব ও অসাধ্য। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় প্রবর্তক রাজর্ষি রামমোহন শাস্ত্র মানিতেন, গুরু-গ্রহণও করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার নিজের ধর্মের প্রামাণ্য শুধু স্বানুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রকৃত জনে যে শাস্ত্র-প্রামাণ্যে বিশ্বাস করে, রামমোহন সে শাস্ত্র-প্রামাণ্য মানিতেন না, সত্য, কিন্তু ভারতের প্রাচীন ঋষি-সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তেও এইরূপ অতিপ্রাকৃত শাস্ত্র-প্রামাণ্য গৃহীত হয় নাই। রামমোহন এই বিষয়ে প্রাচীন ঋষি-পন্থা অবলম্বন করিয়া, যোগবাশিষ্ঠের নির্দেশ অনুসারে সুশাস্ত্র, সদ্‌গুরু ও স্বানুভূতি এই তিনের এক-বাক্যতার উপরে সত্যের ও ধর্মের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজার পরবর্তী ব্রাহ্ম আচার্যগণ ঠিক এই পথ ধরিয়া চলেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র উভয়েই শাস্ত্রের প্রামাণ্য সদ্‌গুরুর প্রয়োজন অস্বীকার করিয়া, প্রথমে শুধু স্বানুভূতির উপরে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিলে ব্যক্তিগত মতামতে ও সার্বভৌমিক সত্যে প্রবৃত্তির প্ররোচনাতে ও ধর্মের প্রেরণাতে যে বস্তুর কোনো প্রভেদ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়. মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দ উভয়েই ক্রমে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা উভয়েই পরে আপনাদের সম্প্রদায়কে নিঃসঙ্গ ও নিরঙ্কুশ স্বানুভূতির অরাজকতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আপনারাই শাস্ত্র-প্রবর্তক হইয়া পড়েন। মহর্ষি প্রথম বয়সে বেদের প্রামাণ্য অগ্রাহ্য করিয়া, শেষ জীবনে আপনার সংকলিত ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থকেই ব্রাহ্মসম্প্রদায় মধ্যে শাস্ত্রের আসনে বসাইয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ ভগবৎ প্রেরণাতেই সংকলিত হয়, ও এই গ্রন্থে সংকলিত শ্রুতি সকলের যে ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও যে তাঁর নিজের কল্পিত নয়, কিন্তু সর্বতোভাবে ঈশ্বরানুপ্রাণিত, মহর্ষি ইদানীং বহুবার এই কথা

বলিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এক সময়ে প্রাচীন শাস্ত্র-সংহিতাকে বর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার শিষ্যমণ্ডলীর স্বানুভূতির অনিয়ন্ত্রিত প্রভুত্বে সমাজে অরাজকতার ও যথেচ্ছাচারের প্রতিষ্ঠার আশঙ্কা করিয়া, শেষে আপনিই "নবসংহিতা" প্রণয়ন করেন। কেশবচন্দ্রের নববিধানমণ্ডলী মধ্যে এই "নবসংহিতা" হিন্দুর মনুসংহিতার ন্যায় স্বীকৃত ও সম্মানিত হইয়া আছে। কিন্তু এ-সকল চেষ্টা সত্ত্বেও ব্রাহ্মসম্প্রদায় মধ্যে নিঃসঙ্গ স্বানুভূতি বা subjective individualism-এর প্রভাব এখনো অপ্রতিহত রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিকী অন্তর্মুখীনতা এই নিঃসঙ্গ স্বানুভূতির বা subjective individualism-এর রূপান্তর মাত্র। এ বস্তু তাঁর পৈত্রিক ও সাম্প্রদায়িক। যে শিক্ষা ও সাধনাতে এই অন্তর্মুখীনতাকে বস্তুসংস্পর্শে সংযত ও শোধিত করিতে পারিত; রবীন্দ্রনাথ সে সুযোগ ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হন নাই। কলিকাতার আধুনিক অভিজাত সমাজ একটি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাস করেন। সহরের সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রমুক্ত মেশামেশির অবসর ও প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। সকলেই আপন আপন সংসার ও স্বার্থের সন্ধানেই ফেরে, একে অন্যের সঙ্গে আলাপ আত্মীয়তা করিবার অবসর পায় না। যাঁদের অন্নচিন্তা নাই সঞ্চিত ধন যাঁহাদিগকে দৈনন্দিন জীবিকা উপার্জনের শ্রম ও ব্যস্ততা হইতে মুক্তি দিয়াছে, তাঁহারাও কেবল আপনাদের সমশ্রেণীর ধনীগণের সঙ্গে আলাপ-আত্মীয়তা করেন, জনসাধারণের সঙ্গে কোনরূপ ঘনিষ্ঠতা তাঁহাদেরও জন্মিতে পারে না। পল্লীসমাজে ধনী-নির্ধনের মধ্যে, বিজ্ঞ ও অজ্ঞের মধ্যে, লোকে যাহাদিগকে ভদ্র বলে ও যাদের ইতর বলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ হইয়া থাকে, এবং এইজন্য যেরূপ একটা মেশামেশি খোলাখুলি ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, বড় সহরে, বিশেষ আজিকালিকার দিনে, তাহার একান্ত অভাব হয়। এই মেশামেশির অভাবে কলিকাতার বড় লোকদের পক্ষে দেশের সাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কোনো যোগাযোগ স্থাপন করা একরূপ অসম্ভব ও অসাধ্য। ইঁহাদের জীবনের অন্তঃপুরে জনসাধারণের

প্রবেশাধিকার নাই। চারিদিকের দীনদরিদ্রেরা কিরূপে দিনপাত করে, তাহাদের সংসারের সমস্যা, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ের আবেগ, জীবনের সংগ্রাম, কোন দিক দিয়া, কিভাবে যে উঠে পড়ে, প্রতিবেশী ধনীসম্প্রদায় তাহার কিছু জানিতে পারেন না। তাঁহারা আপনাদের প্রাসাদ হইতে গরীবের খোলার চালা ও মাটির দেওয়ালমাত্র দেখেন। ঐ চালার নীচে ঐ দেয়ালের মাঝখানে, ঐ ক্ষুদ্র জঞ্জালময় কুটীর-প্রাঙ্গণে কত আশা, কত ভয়, কত অনুরাগ, কত বিরাগ, কত লোভ ও কত ত্যাগ যে দিবারাত্রি কি ছুটাছুটি করিতেছে, সেখানে জীবে ও শিবে কি যে মাখামাখি, কি যে লীলাখেলা, কি যে হুড়াহুড়ি কাড়া-কাড়ি লাগিয়া আছে, এ-সকল দেখিবার অবসর ও বুঝিবার অধিকার তাঁহাদের হয় না। তাঁহাদের নিজেদের জ্ঞানের, ভাগের, ভোগের, বিলাসের, সখ্যের ও সৌখীনতার জগৎটাই তাঁহাদের কাছে প্রত্যক্ষ ও সত্য এবং ইহার বাহিরে যে বিশাল সমাজ পড়িয়া আছে, সেটা তাঁহাদের অপ্রত্যক্ষ ও অজ্ঞাত।

রবীন্দ্রনাথ এই ধনী সমাজে জন্মিয়া, তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠেন। তাহার উপরে মহর্ষি আপনার ধর্মমতের জন্য সমাজচ্যুত হওয়াতে তাঁহার পরিবারবর্গের জীবন কলিকাতার সাধারণ ধনী সম্প্রদায়ের জীবন অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণতর হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথের উদার প্রাণ এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আপনার স্বাভাবিক যুক্তভাব আস্বাদন করিবার জন্য, আশৈশব এক সুবিশাল কল্পিত জগৎ রচনা করিয়া, তাহার মধ্যে বিচরণ করিয়াছে। তাঁহার আপনার পরিবারের দু'চারটি মানুষের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের প্রাণের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। এই গুটিকয়েক আধারেই রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎভাবে লোকচরিত্র অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন। স্নেহের, প্রেমের, ভক্তির এই গুটিকয়েক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের উপরে রবীন্দ্রনাথ আপনার বিচিত্র রসজগৎ নির্মাণ করিয়াছেন। এর বাহিরে তিনি যাহা গড়িতে গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অলোক-সামান্য প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক প্রভাবই প্রকাশিত হইয়াছে।

অলৌকিক কবি-প্রতিভার এ 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী' মায়িক প্রভাব সর্বত্র থাকে। আর এইরূপ মায়িক সৃষ্টির একটা মোহিনী শক্তিও থাকে যাহাতে মানুষকে এমন করিয়া মাতাইয়া তুলিতে পারে যে, সত্যিকার সুখ-দুঃখের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ সর্বদা সকলকে সেরূপভাবে মাতাইয়া তুলিতে পারে না। কল্পনার তুলিকায় দারিদ্র্য দুঃখ অঙ্কিত করিয়া, সেই চিত্র সহায়ে দারিদ্র্যের মধুটুকু আমরা আস্বাদন করিয়া থাকি, তার তীক্ষ্ণ হুলটা আমাদের গায়ে বিঁধে না। উৎকৃষ্টতম তৈল-চিত্র যেমন কতকটা দূরে দাঁড়াইয়াই দেখিতে হয়, একান্ত নিকটে গেলে, বর্ণের বন্ধুরতা চক্ষুগোচর হইয়া চিত্রের সৌন্দর্য নষ্ট করিয়া ফেলে, জনচিত্র সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। এ সংসারে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সকলের মধ্যে ছায়াতপের ন্যায় ভালমন্দ মিশিয়া আছে। দূর হইতে ভালটুকু আমরা অনেক সময় দেখি, মন্দটুকু চোখে পড়ে না। এইজন্য দরিদ্র ধনীকে ঈর্ষা করেন, আর কখনো কখনো ধনীও যে আপনার বিষয়ের দুর্ভাবনায় ও প্রতিদিনের জীবনের অসার কৃত্রিমতা দ্বারা একান্ত পীড়িত হইয়া পর্ণকুটীরের সরল, সহজ জীবনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি প্রেরণ করেন না, এমনো নহে। কিন্তু কল্পনার দূরবীক্ষণ সহায়ে, দূরস্থিত পর্ণকুটীরের অনাবিল প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ করাতে যে আনন্দ জাগিয়া উঠে, সেই পর্ণকুটীরের জীর্ণবস্থার কীটানু-লীলা ও শীর্ণদেহ, দীনপ্রাণ কুটীরবাসীদিগের কলহ কোলাহল প্রত্যক্ষ করিলে আর সে আনন্দটুকু থাকে না। বস্তু সংস্পর্শে এই কল্পিত জগৎ মায়াপুরীর ন্যায় শূন্যে মিলাইয়া যায়।

আমি একথা ভুলি নাই যে, তাঁর পৈত্রিক জমিদারী তত্ত্বাবধানের ভার কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া রবীন্দ্রনাথের উপরেই ন্যস্ত ছিল এবং এই উপলক্ষে তিনি বহুকাল শিলাইদহ ও অন্যান্য স্থানে থাকিয়া সাক্ষাৎ-ভাবে বাঙ্গলার পল্লীজীবন পর্যবেক্ষণ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই বাহ্য যোগ নিবন্ধন যে, সে জীবনের অন্তঃপুরে তিনি প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিলেন, একেবারে এ মীমাংসা করা যায় না। বড় বড় জমিদারীর "বাবুদের" সঙ্গে তাঁহাদের প্রজাসাধারণের

কোনো প্রকারের ঘনিষ্ঠ ও প্রমুক্ত মেশামেশি কুত্রাপি সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথের উদার অন্তরে এইরূপ যোগাযোগ স্থাপনের বলবতী আকাঙ্ক্ষার উদয় হওয়া স্বাভাবিক। সাংসারিক ধনপদাদির অবস্থার আকস্মিক তারতম্যকে অগ্রাহ্য করিয়া, মানুষ বলিয়াই মানুষকে শ্রদ্ধা ও প্রীতিভরে চিত্তকে যে সময় সময় আকুল করিয়া তুলিয়াছে, ইহাও সত্য। সাংসারিক অবস্থার তারতম্য মানুষে মানুষে যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে, আপনার আচার ব্যবহারে ও সন্তানগণের শিক্ষাদীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ সে ব্যবধানটাকে ঘুচাইবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন, ও করিতেছেন, ইহাও জানি। কিন্তু এ সকল চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের প্রাণের উদারতাই প্রকাশিত হয়, সে সকল চেষ্টার সফলতা প্রমাণ হয় না। বড় ছোট উভয় পক্ষের সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতির উপরেই এ সকল চেষ্টার সফলতা নির্ভর করে। আর এ আত্মবিস্মৃতি লাভ করিতে গেলে, ধনীকে ধনের মূল্যটা ভুলিতে হয়, জ্ঞানীকে জ্ঞানের প্রাধান্যটা ভুলিতে হয়, ললিতকলার উপাসককে ললিত লালিত্যের সুকুমার অনুভূতিটা ভুলিতে হয়, আর ধার্মিককে অপরের ধর্ম হইতে আপনার ধর্মটা যে শ্রেষ্ঠ, এই ভাবটা পর্যন্ত একেবারে বিস্মৃত হইতে হয়। যেখানে সমাজের সাধারণ বিধিব্যবস্থা আপনা হইতে ধনী ও নির্ধনের, বিজ্ঞ ও অজ্ঞের, ধার্মিক ও অধার্মিকের মধ্যে কোনো প্রকারের আত্যন্তিক ব্যবধান প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত না জন্মায়; যেখানে সামাজিক জীবনে ধনী দরিদ্রের সঙ্গে দৈনন্দিন কার্যকলাপের মধ্যে নিঃসঙ্কোচে ও নিরভিমান সহকারে মেশামেশি করেন না; যেখানে বিজ্ঞেরা আপনাদের বিজ্ঞতার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে খৃষ্টীয় কথাপ্রসিদ্ধ সেণ্ট সাইমনের মত দিবানিশি বসিয়া রহেন, 'অজ্ঞের' ন্যায় অজ্ঞের সঙ্গে প্রমুক্তভাবে মিশিবার প্রবৃত্তি ও অবসর লাভ করেন না; যেখানে ধার্মিক একচক্ষে আপনার সম্প্রদায়গত সিদ্ধান্ত ও সংস্কারাদির শ্রেষ্ঠত্ব ধ্যান করেন, আর অপর চক্ষে অন্য সম্প্রদায় সকলের সিদ্ধান্ত ও সংস্কারাদির হীনতা দেখিয়া সেগুলিকে উন্নত ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন; সেখানে এ ব্যবধান নষ্ট করা অসাধ্য যে তাহা

নহে, চেষ্টামাত্রেই যে ব্যবধানকে নষ্ট করিতে যাওয়া হয় তাহাকে আরো বাড়াইয়া তোলে। এই জন্য এই শতাধিক বৎসরের অশেষ চেষ্টাতেও মার্কিন সমাজে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের সামাজিক ব্যবধানটা নষ্ট তো হয়ই নাই, বরং এই সাধু চেষ্টার ফলে শ্বেত-কৃষ্ণে বাহিরের আইন কানুনের বৈষম্য যেন পরিমাণে আরো বাড়িয়া যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার আধুনিক অভিজাত সমাজে জন্মিয়া তাহার অঙ্কে, তাহার দোষগুণের ভাগী হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছেন। এই সমাজে এই ব্যবধানটা চিরদিন আছে। কলিকাতার বড় বড় জমিদারদের জমিদারীতে এ ব্যবধানটা স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। সেখানে না আছে প্রজার কুলের আদর, না আছে তার বিদ্যার গৌরব, না আছে তার চরিত্রের মর্যাদা। মহর্ষির জমিদারীতেও এ-সকলের কোন বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। আর বহুকাল হইতে তাঁহাদের জমিদারীতে যে সকল জমিদারী আচার নিয়ম প্রবর্তিত রহিয়াছে তাহার কিম্বদন্তী পর্যন্ত যতদিন প্রজাবর্গের স্মৃতিতে জাগরূক থাকিবে, ততদিন তাহাদের পক্ষে আপনাদের প্রজাদের অগৌরব বিস্মৃত হইয়া একান্ত প্রমুক্তভাবে জমিদারবাবুদের সঙ্গে মেশামেশি করা সম্ভব নয়। আর প্রজারা যতদিন না এ অকুণ্ঠা লাভ করিয়াছে, ততদিন কেবল জমিদারের উদারতায় পরস্পরের মধ্যকার পুরুষানুক্রমিক ব্যবধানটা কিছুতে ঘুচিবারও নহে। আর এই ব্যবধান নষ্ট হয় নাই বলিয়া আপনার জমিদারীর পল্লীসমাজের মাঝখানে বহুদিন বাস করিয়াও ঔদার্য সাধনের আন্তরিক আগ্রহ চেষ্টা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথ সে সমাজের প্রাণের অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করেন নাই। অতি নিকটে থাকিয়াও বাঙ্গলার পল্লীজীবন ও বাঙ্গালীর সাচ্চা প্রাণটা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথের অনেক সৃষ্টি এইরূপ মায়িক। উর্ণনাভ যেমন আপনার ভিতর হইতে তন্তু বাহির করিয়া অদ্ভুত জাল বিস্তার করে, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ আপনার অন্তর হইতে অনেক সময় ভাবের ও রসের তন্তু সকল বাহির করিয়া আপনার অদ্ভুত কাব্য সকল রচনা

করিয়াছেন। তাঁর কাব্যে যেমন, তাঁর চিত্রিত লোকচরিত্রেও তেমন অনেক সময় এই বস্তুতন্ত্রতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষুদ্র গল্প লিখিয়াছেন, দু'চারখানি বৃহদাকারের উপন্যাসও রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁর চিত্রিত চরিত্রের প্রতিরূপ বাস্তব জীবনে ক্বচিৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কেবল রবীন্দ্রনাথ যেখানে আধুনিক ইঙ্গবঙ্গের বা তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের চরিত্র চিত্রিত করিতে গিয়াছেন, সেখানে তাঁর চিত্রগুলি অসাধারণ বস্তুতন্ত্রতা লাভ করিয়াছে। এ বিষয়ে "গোরা"র হারাণবাবুটি অপূর্ব বস্তু হইয়াছে। কিন্তু এরূপ গুটিকতক চিত্র ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের অনেক সৃষ্টি মায়িক। আর যেমন তাঁর কাব্যে ও গল্পে এই মায়ার প্রভাব বেশী, সেইরূপ তাঁর সমাজ-সংস্কারের প্রয়াস ও ধর্মের শিক্ষাও বহুল পরিমাণে বস্তুতন্ত্রতাহীন হইয়াছে। তিনি একটা কল্পিত স্বদেশ রচনা করিয়া, তাহার উপরে একটা সত্য স্বদেশী সমাজ গড়িয়া তুলিতে গিয়াছিলেন। সে মায়ার সৃষ্টি কিছুদিন পরে আপনাতে আপনি মিলাইয়া গিয়াছে। আশৈশব রবীন্দ্রনাথের ধর্মের রচনায় ও উপদেশে এই মায়ার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তাঁর স্বাদেশিকতা কেবল শৈশবে নয়, আজি পর্যন্ত বহুল পরিমাণে বস্তুতন্ত্রতাহীন হইয়া আছে। আর আজ তিনি যে এক বিশাল বিশ্বমানব কল্পনা করিতেছেন—তাহারও প্রতিষ্ঠা তাঁহার অলৌকিক কবি-প্রতিভার অঘটনপটীয়সী মায়াশক্তিতে।

আর মায়ার মোহিনী শক্তিই আছে, তৃপ্তিদানের অধিকার নাই। এ সংসারে মায়াধীন জীব নিত্য পাই-পাই পাই না ; ধরি-ধরি ধরিতে পারি না ;—এরূপ অপূর্ণ চেষ্টা ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল হইয়া রহে। রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক সৃষ্টিও পাঠকের প্রাণে এই নিত্য অতৃপ্ত ভাবের সঞ্চার করে। রবীন্দ্রনাথ একবার "অতঃ কিম্ ?" নামে একটি উপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের লেখাতেও প্রায় সর্বদা ঐ দুর্দমনীয় প্রশ্নটা জাগিয়া রহে। রবীন্দ্রনাথের রচনা সর্বদা বড় মিষ্টি লাগে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা অপূর্ণতা ও অতৃপ্তি বোধ জাগিয়া উঠে। ইহাও মায়ার ধর্ম।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার অলৌকিক শক্তিকে মায়িক বলিলে তার কোনই গৌরবের হানি হয় না। কবিত্বের শক্তি সর্বদাই মায়িক। অশরীরীকে শারীরধর্মে বিভূষিত করা, অজ্ঞাত অজ্ঞেয়কে নামরূপ দিয়া জ্ঞানাধিকারে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করা, ইহাই কবি-প্রতিভার সাধারণ ধর্ম। ইহাকেইঅঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াধর্ম বলে। কবি-প্রতিভা যে কদাপি এই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না, তাহা নয়। সেখানে কবি শুধু কবি নহেন, কিন্তু সাধকও ; সাধন বলে কবি যেখানে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, সেই নিগূঢ় তত্ত্বের উপরে আপনার কবিকল্পনাকে গড়িয়া তুলেন, সেখানে তাঁর প্রতিভা এই মায়াকে অতিক্রম করিয়া যায়। সেখানে কবি ঋষিত্ব লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের এই পরমপদ লাভের অনেক যোগ্যতাই আছে, অভাব কেবল এক বস্তুর। অভাব পূরণ করিবার জন্য যীশু যোহনের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার নিকটে দীক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যাহার জন্য শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরপুরীর শরণাগত হন, যে সঞ্চারের অভাবে অধ্যাত্মজীবনের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকিতেও তাহা কদাপি ফলপ্রসূ হয় না, রবীন্দ্রনাথের অভাব সে বস্তুর। এই সঞ্চারের অভাবে রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক কবি-প্রতিভা এখনো মায়াতীত সত্যলোক ও ব্রহ্মলোক অধিকার করিতে পারিতেছে না। কিন্তু আজ না হউক, একদিন, এ অভাব তাঁর পূর্ণ হইবেই হইবে।

যে স্বপ্ন দেখে আমরা বিভোর হয়েছি তাহা শুধু স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নয়। আমরা চাই ন্যায় ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক স্বাধীন রাষ্ট্র— আমরা চাই এক নূতন সমাজ ও এক রাষ্ট্র, যার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠবে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম আদর্শগুলি। গুরুদেব! আপনি বিশ্বমানবের শ্বাশত কণ্ঠে আমাদের সুপ্তোত্থিত জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছেন। আপনি চিরকাল মৃত্যুঞ্জয়ী যৌবনশক্তির বাণী শুনিয়ে আসছেন। আপনি শুধু কাব্যের বা শিল্পকলার রচয়িতা নন। আপনার জীবনে কাব্য এবং শিল্পকলা রূপ-পরিগ্রহ করেছে। আপনি বিশ্ব কবি। আমাদের স্বপ্ন মূর্ত হতে চলেছে দেখে যে সমস্ত কথা, যে সমস্ত চিন্তা, যে সমস্ত ভাব আজ আমাদের অন্তরে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে—তাহা আপনি যেমন উপলব্ধি করবেন, তেমন আর কে করবে? যে শুভ অনুষ্ঠানের জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি তার হোতা আপনি ব্যতীত আর কে হতে পারবে? গুরুদেব! আজকার এই জাতীয় যজ্ঞে আমরা আপনাকে পৌরোহিত্যের পদে বরণ করে ধন্য হচ্ছি। আপনার পবিত্র করকমলের দ্বারা "মহাজাতি সদনের" ভিত্তি স্থাপনা করুন। যে সমস্ত কল্যাণপ্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তি ও জাতি মুক্ত জীবনের আস্বাদ পাবে এবং ব্যক্তির ও জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হবে—এই গৃহ তারই জীবনকেন্দ্র হয়ে, "মহাজাতি সদন" নাম সার্থক করে তুলুক—এই আশীর্বাদ আপনি করুন। এই আশীর্বাদ করুন যেন আমরা অবিরাম গতিতে আমাদের সংগ্রাম পথে অগ্রসর হয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করি এবং মহাজাতির সাধনাকে সকল রকমে সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত করে তুলি।

গোরা একজন আইরিশ বালক। কৃষ্ণদয়াল ও তাঁহার স্ত্রী আনন্দময়ী গোরার মাতার মৃত্যুর পর তাঁহাকে স্বীয় পুত্ররূপে লালন-পালন করেন। গোরা বড় হইয়াও ইহা জানিতে পারেন নাই। তিনি জানিতেন যে, কৃষ্ণদয়াল তাঁহার পিতা ও আনন্দময়ী তাঁহার মাতা।

বিনয় গোরার বন্ধু। তিনি ব্রাহ্ম পরেশবাবুর কন্যা ললিতাকে বিবাহ করেন। গোরা স্বয়ং আইরিশম্যান জানিবার পর পরেশবাবুর পালিতা কন্যা রাধারাণী ওরফে সুচরিতাকে বিবাহ করেন।

অন্য বিশেষ কোন ঘটনা উপন্যাসে নাই। অন্যান্য ঘটনার মধ্যে মহিম তাঁহার কন্যা শশিমুখীর সহিত বিনয়ের বিবাহ দিবার জন্য বহু প্রয়াস পাইয়া নিষ্ফল হন। সুচরিতার মাতৃষ্বসা হরিমোহিনী, সুচরিতার সহিত তাঁহার দেবর কৈলাসের বিবাহকার্য সম্পাদন করিতে ব্যর্থকাম হন। গোরা আর্তরক্ষার্থে জেলে যান; ললিতা বিনয়ের সহিত ষ্টীমারে চড়িয়া পিত্রালয়ে চলিয়া আসেন; এবং ব্রাহ্মসমাজের চাঁই হারাণবাবু সুচরিতাকে বিবাহ করিবার জন্য তাঁহার বহু উদ্যম ব্যর্থ দেখিয়া সেই রাগে ব্রাহ্মসমাজে ইহা লইয়া একটা বিশেষ ঘোঁট করেন।

এই ব্যাপার লইয়া এই বৃহৎ ৬০০ পৃষ্ঠাব্যাপী উপন্যাস রচিত হইয়াছে এবং এরূপ কৌশলের সহিত ইহা রচিত হইয়াছে যে, আদ্যোপান্ত আমি মুগ্ধ হইয়া এ উপন্যাসখানি পাঠ করিয়াছি।

গোরার চরিত্র অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার একান্ত নিষ্ঠা ও হিন্দুর সমাজ রক্ষণে একান্ত জিদ অসাধারণ কৌশলের সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। এই প্রদীপ্ত হিতৈষণার কাছে তাঁহার বন্ধুত্ব, পিতৃভক্তি, মাতৃস্নেহ পর্যন্ত ম্লান হইয়া যায়। তাহার উপর তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা, সাহস, উদ্যম, পরার্থে আত্মবিসর্জন তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যের

মহাচরিত্রগুলির সহিত একাসনে বসাইয়া দিয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার ভক্তিহীন সামাজিকতা নিজের হিন্দুত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত—মহাকল্যাণের উপর নহে। যেই তিনি জানিলেন তিনি হিন্দু নহেন, আইরিশম্যান—তৎক্ষণাৎ তাঁহার মতের পরিবর্তন হইল; ভারতবর্ষের সমস্ত মানবজাতি তাঁহার আপন হইয়া গেল। যে ব্যক্তি স্বয়ং হিন্দু বলিয়া হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠাসাধনে ব্রতী হয়, তাহার মতের বল কাল্পনিক—তাহার দেশানুরাগ প্রকৃত দেশানুরাগ নহে, আত্মানুরাগ। হিন্দু জাতি লাঞ্ছিত বলিয়া তাহার ক্রোধ নহে। তাহার ক্রোধ 'আমার জাতি' লাঞ্ছিত বলিয়া। গোরা হিন্দুত্বের গোঁড়ামী করিয়া একরূপ হিন্দুত্বের প্রতিহিংসা লইতে বসিয়াছিলেন। যে দেশানুরাগের ভিত্তি হিংসা, তাহা দেশানুরাগ নহে—তাহা বিজাতি-বিদ্বেষ! ধর্ম বলিয়া যে অনুরাগ তাহাই ধর্ম; আমার ধর্ম বলিয়া যে অনুরাগ তাহা 'আমারত্ব' ঘুচিলেই গেল। গোরার হিন্দুধর্মে 'অনুরাগ সেই রকমের অনুরাগ। কবি অসামান্য কৌশলে দেখাইয়াছেন যে, এরূপ স্বার্থ সেবার কি জীর্ণ ভিত্তি।

পৃথিবীতে দুই সৈন্য পরস্পরের প্রতি চক্ষু রক্তবর্ণ করিতেছে—এক ধর্ম সৈন্য, আর এক অধর্ম সৈন্য। যোগ দিতে হইবে ধর্ম সৈন্যের সঙ্গে—সে সৈন্য ইংরাজের হউক, মুসলমানের হউক, হিন্দুর হউক কিছু যায় আসে না। ইংরাজ প্রদত্ত উপকারগুলি ভুলিয়া অপকারগুলি স্মরণ করিয়া যদি আমরা কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, তাহাকে স্বদেশ-ভক্তি বলে না; তাহা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি। ধর্মে ঈর্ষা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি, দেশানুরাগ নহে, তাহা স্বার্থ-সেবার নামান্তর মাত্র। হিন্দুজাতিকে যদি সত্যই ভালবাসি, তাহা হইলে ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, ইংরাজ রাজত্বে অমঙ্গলের চেয়ে মঙ্গল বেশী কিনা; আমাদের হস্তে রাজত্ব আসিলে আমরা এই অবস্থায় রাজ্য চালাইতে পারি কিনা; হিন্দুর সঙ্কীর্ণতা ও অবিচার তাহার বিরোধী কি না। গোরা এসব ভাবিবার অবসর পান নাই। তিনি হিন্দুর যাহা আছে তাহাই ভাল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। তাহা রক্ষা করিবার জন্য জীবনের সমস্ত

সাধনা উৎসর্গ করিয়াছিলেন ও আপনাকে ও আপনার জাতিকে ইংরাজ দ্বারা অপমানিত বিবেচনা করিয়াছিলেন। এইজন্য এত উদ্যম, সাহস, নিষ্ঠা এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ হইল।

এক কথায় গোরার ধর্ম প্রবৃত্তিমূলক—ভক্তিমূলক নহে। সে প্রবৃত্তিও একটা মহৎ প্রবৃত্তি নহে। সে প্রবৃত্তি প্রতিহিংসা—হদ্দমদ্দ আত্মরক্ষা, তাহার অধিক কিছু নহে। "তুমি বল আমার সব খারাপ, অতএব যাহা খারাপ তাহা পরিত্যাগ করিব না বরং প্রমাণ করিব যে তাহা ভাল এবং দ্বিগুণ জোরে তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিব" গোরার এইরূপ প্রকৃতি। কিন্তু যেই সে 'আমারত্ব' গেল—আর সব ভাসিয়া গেল। মেঘ কাটিয়া গেল। অমনি গোরা দেখিলেন উপরে নির্মুক্ত নীল আকাশ—সূর্য হাসিতেছে। গোরার এই চরিত্র এই অপূর্ব উপন্যাসে একেবারে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে।

বিনয় গোরার বন্ধু। গোরার প্রতি তাঁহার অসীম ভক্তি। কিন্তু তাঁহার যে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে তাহা আমরা গ্রন্থে ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাই। ক্রমে ক্রমে তিনি গোরার সমকক্ষ এবং শেষে তিনি গোরাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় কোমল। গোরা যেরূপ কঠোর দিক্ দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছেন, বিনয় তেমনি কোমল দিক দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছেন। গোরার জীবনে মূলমন্ত্র কর্তব্যজ্ঞান—বিনয়ের জীবনে মূলমন্ত্র প্রেম। সেই প্রেম প্রথমে গোরার দোর্দণ্ড প্রতাপে দিবসের চন্দ্রমার মত পাণ্ডুর; পরে গোরার প্রভাব চলিয়া গেলে নিশীথে স্থির জ্যোৎস্নায় পরিণত হইয়াছে। গোরা সত্য খুঁজিয়াছেন আত্মরক্ষার তন্ত্র দিয়া। বিনয় সত্য খুঁজিয়াছেন আত্মদান দিয়া। গোরার ভ্রান্তি গেল আকস্মিক বিপ্লবে; বিনয়ের ভ্রান্তি কাটিয়া গেল ধীর সহিষ্ণু বিবেচনায়। গোরা ও বিনয় উভয়েই প্রেমের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়াছেন. কিন্তু গোরা সুচরিতাকে বিবাহ করিলেন—যখন বাধা আপনি সরিয়া গেল; বিনয় ললিতাকে বিবাহ করিলেন—বাধা চরিত্রবলে নিজে সরাইয়া দিয়া। গোরার বিবাহে উৎসর্গের লেশমাত্র নাই; বিনয়ের বিবাহে উৎসর্গ আছে। গোরা

সমাজ ত্যাগ করিলেন—বাধ্য হইয়া ; বিনয় সমাজ ত্যাগ করিলেন স্বেচ্ছায়। গোরার চেয়ে বিনয়ের চরিত্র মহৎ, উদার, পবিত্র। তাঁহার সহিত গোরার বন্ধুত্বেও যেন একটা দাম্ভিকতা, স্পর্ধা আছে। বিনয়ের চরিত্র হইতে গোরা কিছু লাভ করিতে পারে নাই, স্বীয় ধারণা হইতে একপদও বিচলিত হন নাই। কিন্তু বিনয় গোরার চরিত্র হইতে যাহা গ্রহণীয় তাহা অকুণ্ঠিতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাতে তাঁহার মর্যাদা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। মহতের একটি লক্ষণ এই যে, শিশু হইতে, পথের ভিক্ষুক হইতে, অধম হইতেও সার সংগ্রহ করিতে সে লজ্জিত হয় না। পৃথিবীতে কিছুই ফেলা যায় না। আবর্জনাকেও কৌশলে সারে পরিণত করা যায়। কিন্তু গোরা এতদূর স্বেচ্ছাচারী, এতদূরে egoistic যে তাঁহার যেন কাহারও কাছে কিছুই শিখিবার নাই ; জীবনে যাহা কিছু সার তাহা যেন তিনিই বুঝিয়াছেন, তাঁহার কাজ যেন শিক্ষা গ্রহণ করা নহে! বিনয় এত বিনীত, যেন তাঁহার নিজের একটা কোন দৃঢ় মত নাই ; তিনি যেন সকলেরই শিষ্য, তাঁহার কাজ যেন জ্ঞান কুড়াইয়া বেড়ানো। গোরা যখন তর্ক করেন, তখন যেন তিনি প্রচার করিতে বেদীতে বলিয়াছেন, আরও যেন বলিতেছেন যে when I do open my lips let no dog bark. বিনয় যখন তর্ক করেন তখন যেন তিনি দীক্ষিত হইতে বসিয়াছেন, তিনি যেন বলিতেছেন—"তুমি বল, আমি শুনি।" বিনয়েরই মত ব্যক্তিই শেষে জগতের প্রকৃত গুরু হয়।

পরেশ ব্রাহ্ম! এ চরিত্রটি এত সুন্দর যে, তাহার প্রতি একটা প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক হয়। স্নেহশীল, কর্তব্যপরায়ণ স্বামী—পরেশ চিন্তাশীল, পরম ধার্মিক, বিপদে অটল, পারিবারিক বিপ্লবে স্থির। পরেশ একটি আদর্শ চরিত্র। তিনি ধীর, বিবেচক, কদাচ কাহারো প্রতি রুক্ষ হন নাই ; নিজে সহ্য করিয়াছেন, কখনও কাহারো হৃদয়ে বেদনা দেন নাই , যখন যাহা উচ্চ ধর্ম অনুসারে কর্তব্য বুঝিয়াছেন তাহাই করিয়া গিয়াছেন ; একপদও তিনি কখন কর্তব্য-পথ হইতে স্খলিত হন নাই। তাঁহার স্ত্রী বরদাসুন্দরীর নীচতা ক্ষুদ্রতা তিনি

নীরবে দেখিয়াছেন, কখন তাঁহাকে একটুও কটুবাক্য বলেন নাই। অধম হারাণবাবুর অযথা তিরস্কারও তিনি মাথা পাতিয়া লইয়াছেন; প্রতি-তিরস্কার করেন নাই। তাঁহাকে দেখিয়া গোল্ডস্মিথের ভিকারকে মনে পড়ে—রবীন্দ্রবাবুরই বিসর্জনে অতুল চরিত্র রাজর্ষিকে মনে পড়ে। এই পুস্তকের যথার্থ নায়ক এই ব্রাহ্ম পরেশ। তাঁহারই প্রদর্শিত পথে গোরা আর বিনয় গিয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগকে অপার স্নেহ দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন।

অন্যান্য পুরুষ চরিত্রের মধ্যে হিন্দু কৃষ্ণদয়াল, অধমাধম হারাণ, সাংসারিক মহিম, নির্বোধ কৈলাস আর গোরার ভক্ত অবিনাশ আছেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। কবিবর যেরূপ যে চরিত্রটি ফুটাইতে চাহিয়াছেন সে চরিত্র সেইরূপই ফুটিয়াছে। কিন্তু তাহাদের বিশেষত্ব এমন কিছুই নাই।

স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে চারিটি চরিত্র—সুচরিতা, ললিতা, হরিমোহিনী ও বিশেষতঃ আনন্দময়ী চমৎকার।

সুচরিতা ধীরা, স্নেহময়ী তেজস্বিনী। তাঁহার চরিত্রের একটি শান্ত শক্তি আছে। তিনি কদাচিৎ উত্তেজিত হ'ন। তিনি তাঁহাব মাসী হরিমোহিনীর জন্য হিন্দু আচার মানিয়া চলিতে প্রস্তুত, আবাব ভগিনী ললিতার জন্য সে আচাব ভাঙিবাব জন্য প্রস্তুত। তিনি ধর্মেব গূঢ় তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য উৎসুক। তিনি গোরার চরিত্রবলে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে একেবারে গুরু বলিয়া মানিয়া লইতেও দ্বিধা করেন না। একটা সংযত তেজ: শান্ত ধার্মিকতা, স্বপ্রকাশ স্নেহ, ধীর কর্তব্যপরায়ণতা তাঁহাব চরিত্রের ভূষণ!

আর ললিতা? তাঁহার চরিত্র গোরার চরিত্রের মত দৃঢ় উজ্জ্বল। যাহা বুঝিব, ঠিক তাহাই করিব, কোন বাধা মানিব না। প্রথমে গোরার প্রতি তাঁহার ক্রোধ শেষে উদ্দাম ভক্তিতে পরিণত হইল। গোরা যে বিনয়কে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাঁহার চরিত্রের মৌলিকতা নাশ করিতেছেন, এ চিন্তা তিনি সহ্য করিতে পারেন না। আবার পরে

তিনিই গোরার লাঞ্ছনায় উদ্দীপ্ত হইয়া অসমসাহসিক কার্য করিতে দ্বিধা অনুভব করেন না। তিনি কালেক্টর সাহেবের গৃহে অভিনয়ে প্রথমে যেমন উৎসাহী, শেষে সেইরূপ বিদ্রোহী। তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রথমে যেরূপ আগ্রহে নিষ্ঠাবতী, শেষে সেইরূপ আগ্রহে তাহার প্রতি আক্রোশবর্তী। যাহা উচিত তাহা তাঁহার পক্ষে কর্তব্য। এই চরিত্র অদ্ভুত, সুন্দর এবং অনিবার্যরূপে হৃদয়কে আকৃষ্ট করে।

বিনয়ের সহিত ললিতার এবং গোরার সহিত সুচরিতার বিবাহে কবিবর মনুষ্য চরিত্রের একটি নিগূঢ় তত্ত্ব দেখাইয়াছেন যে, চরিত্রগত পার্থক্যই অনেক সময়ে প্রেমের অনুকূল হয়।

হরিমোহিনীর চরিত্র নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবার চরিত্র। আচার মানিয়া চলা তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ম। তিনি ব্রাহ্ম পরেশবাবুর গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিজের আচার হইতে অণুমাত্র স্খলিত হন নাই। সুচরিতা তাঁহার আদর্শে হিন্দুত্বে আস্থাবতী হইয়াছিলেন—যদিও মনে হয় গোরার প্রতি অনুরাগই ইহার প্রধান কারণ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা সুন্দর চরিত্র—আনন্দময়ীর। তিনি চরণের রেণু হইতে শিরের সিন্দুর বিন্দু পর্যন্ত মাতা। স্নেহে তিনি গলিয়া পড়িতেছেন। গোরার প্রতি যেমন তাঁহার অনুরাগ বিনয়ের প্রতিও সেইরূপ। তিনি হিন্দু আচার ত্যাগ করিয়াছেন—গোরার জন্য। গোরার মৃদু তিরস্কারে তাই তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসে। বিনয়ের বিবাহে গোরা যোগ দিবেন না, কিন্তু স্নেহময়ী আনন্দময়ী থাকিতে পারিলেন না—গোরার এমন স্নেহময়ী মাতা এ সময়ে যেদিকে কঠোরতা সেদিকে যাইতে পারিলেন না, বিনয়ের দিকে স্নেহভারে অবনত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ধার্মিকতা পরেশের ধার্মিকতার অনুরূপ। তাহাতে গোঁড়ামির লেশমাত্র নাই। তিনি ধর্মের মর্ম বুঝিয়াছিলেন। আর তাঁহার আচারে প্রয়োজন কি ? যাহা উত্তম তাহা উত্তম—সে হিন্দু ধর্মে থাকুক আর খৃষ্টধর্মে থাকুক, কিছু যায় আসে না। চিরন্তন সত্য তাঁহার অন্তরে বিরাজমান। আর কি

তিনি আচারের ধার ধারেন? তাই গোরা শেষে এই মাতার মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষকে পাইয়াছিলেন।

গ্রন্থে অন্যান্য স্ত্রী-চরিত্র: ললিতার ভগিনীগণ ও শশিমুখী—তাহাদের কোন বিশেষত্ব নাই।

গ্রন্থে একটি বালক, পরেশের পুত্র সতীশের চরিত্র অত্যন্ত মনোহর। এ চরিত্র অতি পরিস্ফুট হইয়াছে।

এই উপন্যাসে বহুল পরিমাণে তর্ক আছে; কিন্তু তাহাতে পাঠকের বিতৃষ্ণা হয় না, বরং সেইগুলি বোধ হয় যেন মাণিক্যের মত পুস্তক মধ্যে বিক্ষিপ্ত আছে। এ তর্কগুলির মজা এই যে, যখন যে উক্তিটি যে পক্ষে উক্ত হইয়াছে তখনই সে উক্তি সেই পক্ষের চরম যুক্তি বলিয়া বোধ হয় এবং বিপক্ষবাদী তাহার উত্তরে কি বলিবে তাহা জানিবার কৌতূহল বাড়ে। আমি সে তর্কের আবর্তের মধ্যে পড়িব না—নহিলে সমালোচনা শেষ করিতে পারিব না।

উপন্যাসখানির উদ্দেশ্য বোধ হয় ব্রাহ্মধর্মের একটি চরম লক্ষ্য নির্দেশ করা। চমৎকার কৌশলের সহিত দেখানো হইয়াছে যে, হিঁদুয়ানীর গোঁড়ামীর চেয়ে আধুনিক ব্রাহ্ম গোঁড়ামী কম অনিষ্টকর নহে। সত্যই ধর্ম, আচার ভেদে সমাজভেদ নীতিবিরুদ্ধ। এই মহাসত্য প্রচারের জন্যই যেন এই উপন্যাস রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সেই মহা উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

বস্তুতঃ এমন সুন্দর সামাজিক উপন্যাস কদাচিৎ নয়নগোচর হয়। ব্রাহ্ম সমাজের সৌন্দর্য ও কদর্যতা একসঙ্গে আর কোন উপন্যাসে দেখি নাই। জ্ঞান ও প্রেম, যুক্তি ও অনুভূতি, সহিষ্ণুতা ও বিদ্রোহ এ অপূর্ব উপন্যাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জ্বলিয়া উঠিতেছে। আর অপর দিকে স্বার্থ সেবা ও ক্ষুদ্রতা, হিংসা ও নিষ্ঠুরতা, কুৎসাপ্রিয়তা ও অত্যাচার তাহাদের অঙ্গে থাকিয়া তাহাদের আরও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

উপন্যাসখানি অনেকটা Vicar of Wakefield-এর ধরনে

লিখিত। ইহা শুধু উপন্যাস নহে, ইহা ধর্মগ্রন্থ। একদিকে 'যেমন ৬০০ পৃষ্ঠা পড়িতে পড়িতে কৌতূহল বাড়িতে থাকে এবং পাঠ অসমাপ্ত করিয়া উঠিতে অনিচ্ছা হয়, অন্যদিকে ইহা হইতে অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়। এ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের গৌরব। সকলেরই (বিশেষতঃ প্রত্যেক ব্রাহ্মের) এই উপন্যাসখানি পাঠ করা উচিত।

রবীন্দ্রনাথ কবি। আমি রাসায়নিক হইলেও অরসিক। আমার সহিত পরিচয় তাঁহার রসলোকের নয়, তাঁহার ব্যক্তিত্বের। রবীন্দ্রনাথকে মানুষ হিসাবে আমি শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি, তাঁহার লেখা পড়িয়া আনন্দে অভিভূত হই। সমালোচক আমি নই, সে স্পর্ধাও নাই, তথাপি এই কবির প্রতি আমার সকল শ্রদ্ধা আজ হৃদয়ে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে।

মনে হয়, বাংলাদেশের যে কি সম্পদ রবীন্দ্রনাথ, তাহা বিদেশী কেহ বুঝিবেন না। কৈশোর হইতে আজ পর্যন্ত, এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ বাংলার আসরে কাব্য গান গাহিতেছেন। বাংলার পথে, ঘাটে, হাটে, মাঠে এমনকি সুদূর নিভৃত পল্লীর ঘরে-প্রাঙ্গণে তাঁহার গানের সুর বাজিয়া উঠিতেছে। বাংলার চাষার ছেলেমেয়েরাও রবীন্দ্রনাথের গান গায়। তাহাদের অধিকাংশই কবির নাম পর্যন্ত শুনে নাই ; তাহারা জানে না এ গান কাহার লেখা, কি ইহার সুর, কি-ই বা ইহার তাল-মান ; কিন্তু তাহাদের কণ্ঠে কণ্ঠে সে-গান অতি সহজে আপনা-আপনি ধ্বনিয়া উঠে। আনন্দের আবেগ আসিলেই তাহারা রবীন্দ্রনাথের গান ধরে। রবীন্দ্রনাথের গান ও গীতি-কবিতা বাঙালীর প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে ; বাংলার ভাবধারাকে এক নূতন রসে কোমল করিয়া সমাজের চতুর্দিকেই এক নূতন সৌন্দর্য আনিয়া দিয়াছে। বাংলার নাড়ীর স্পন্দনে তাঁহার সুরে তাল শোনা যায়। আজ আমরা রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়া বাংলাদেশের কথা কল্পনাও করিতে পারি না।

ইহার কারণ অনেকগুলি। প্রথমতঃ, রবীন্দ্রনাথ খাঁটী বাঙালী কবি। রবীন্দ্রনাথের যে সত্যকার কবি-মূর্তি, তাহা সেই বাংলার বৈষ্ণব কবিরই প্রতিচ্ছবি। জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস পর্যন্ত যে কবিগণ রাধাকৃষ্ণের সেই

যমুনা পুলিনের (যমুনা পুলিনের ?) অনন্ত প্রেমলীলার গান গাহিয়া গিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহাদেরই ভাবে রসে পরিপুষ্ট ; সেইজন্যই তাঁহার প্রেম ও ধর্মবিষয়ক সঙ্গীতগুলিতে বৈষ্ণব-ভাব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

বাংলার এই নিগূঢ় রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আর একটি নূতন সুর বাজাইয়াছেন। তাহা হইল বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা। তাঁহার কাব্যে বাংলার আকাশ মাটি জল বাতাস, বাংলার পল্লীর সরল সুন্দর ছবিগুলি এমন স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তাহার আর তুলনা নাই। বাঙালী ঘরের অতি তুচ্ছ সুখ দুঃখ হাসি কান্নার কথাগুলি তাঁহার ভাষায় এমন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, সাধারণ দরিদ্র বাঙালীও তাঁহাকে অনায়াসে নিজেদেরই একজন মনে করিয়া লয়, কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। সম্ভ্রান্ত ধনীগৃহে রবীন্দ্রনাথ লালিত। কিন্তু ঐশ্বর্যের সকল অভিমান ব্যর্থ করিয়া পল্লীজীবনের সঙ্গে এই যে অন্তরের সহজ নিবিড় আত্মীয়তা, ইহা তাঁহার গল্পগুচ্ছের পাতায় পাতায় সৌরভের মতো ভরিয়া আছে। বঙ্গমাতার গভীর প্রেমে তাই তিনি গাহিয়াছিলেন—

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।

আর—

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জনম, মাগো, তোমায় ভালবেসে।

মনে হয় যে, সারা বঙ্গ-সাহিত্য একদা লোপ পাইলেও এই গানগুলি কখনও বাংলার কণ্ঠ হইতে লুপ্ত হইবে না।

রবীন্দ্রনাথের দেশ-প্রীতি এইখানেই শেষ নয়। বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তিনি যেমন পিককণ্ঠ, বাঙালীর জাতীয়তাবোধেও তেমনি তিনি মেঘমন্দ্র-স্বরে গান গাহিয়াছেন। যে-গান কর্মের উদ্দীপনায় তেজস্বী, নির্ভীক, সাহসী। ১৯০৫ সালে বাংলা দেশ আলোড়ন করিয়া যেদিন

স্বদেশী আন্দোলনের ডঙ্কা নির্ঘোষ বাজিয়া উঠিল, সেদিন রবীন্দ্রনাথই সকলের আগে ভাবাবিষ্ট হইয়া, সেই উত্তেজনা স্পন্দনকে এক শংকাহরণ ওজস্বী জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত করিয়াছিলেন। বাংলার স্বাদেশিকতার বহ্নিশিখার পাশে সেদিন তিনি যে উদাত্ত বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, তাহাই বাংলার কর্মের পিছনে দিল শ্রদ্ধা, জাতীয়তার পিছনে দিল মধুর দেশভক্তি, আর নব্য বস্তুবাদের পিছনে মেলিয়া ধরিল উদার আদর্শবাদ। যেদিন সরকারী নিষেধের রক্তচক্ষু অবহেলা করিয়া বাংলায় রাখীবন্ধনের পুণ্যযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল, সেদিন তিনিই তাহার স্বস্ত্যয়ন করিলেন—

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু ; বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক
পুণ্য হউক, হে ভগবান।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন ভারতীয় জাতীয়তার কর্মযোগ সাধন করিয়াছিলেন, বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষের জীবনে আমরা যেমন পাই তার জ্ঞানযোগ, রবীন্দ্রনাথের সাধনায় তেমনি পাই দেশ-প্রীতির ভক্তিযোগ।

কয়েক বৎসর না যাইতেই স্বদেশী আন্দোলনের তপোবনের আড়ালে সহসা বিপ্লবের বিষধর ভুজঙ্গ ফণা বিস্তার করিল। সে-দিন রবীন্দ্রনাথই আবার দেশবাসীকে সাবধান করিয়া বলিলেন,—এই শ্বাপদ ক্রীড়া ভারতীয় সাধনার বহির্ভূত, এই ক্রীড়ায় কল্যাণ নাই। দেশকে সত্য ও শান্তির পথে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য তিনি আবার লেখনী ধরিলেন। সেদিন রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে আমরা যে ওজস্বী গদ্য-ভাষায় রচনাগুলি পাইলাম, তাহা বুঝি কবি রবীন্দ্রকেও চকিতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। আমার বিশ্বাস, আজিকার প্রত্যেক দেশ-হিতৈষী যুবক যুবতী যদি দৈনিক সংবাদপত্রের আবর্জনা ফেলিয়া, রবীন্দ্রনাথের তখনকার লেখা 'স্বদেশ','সমাজ', 'সমূহ', ও 'রাজাপ্রজা'

এবং বিশেষতঃ 'স্বদেশী-সমাজ', 'দেশ নায়ক', 'পথ ও পাওয়া' প্রভৃতি নিবন্ধগুলি অধ্যয়ন করেন রাজনৈতিক জীবনে অনেকে উপকার পাইবেন।

কিন্তু জাতীয় জাগরণের ঝঞ্ঝাবর্তে ভাবাদর্শ কোথায় উড়িয়া যায়, মানুষ যুক্তি-তর্ক হারাইয়া ফেলে। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃই স্বদেশী উগ্র কর্মস্রোত হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন অনুভব করিয়া বুঝিলেন, কবি কেবল জাগরণী-গান গাহিতে পারেন, বিপুল কর্মতরীর কাণ্ডারী হওয়া তাঁহার সাধ্য নহে। কর্ম সাগরের তরঙ্গ-ভঙ্গে তাঁহার আসন নয়, তাঁহার আত্মা শুধু আকাশের ধ্রুব নক্ষত্রের মতো উর্ধ্বলোক হইতে রশ্মিপাত করিবে। অতএব দেশের অবস্থা-পরিবর্তনে তাঁহার পূর্বের আশায় আঘাত লাগিল। তিনি দূরে সরিয়া এইবার তাঁহার সাধনার তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত করিলেন। সংকীর্ণমনা কুটিল দেশ-প্রেম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন আন্তর্জাতিক সৌম্যের বাণী, মানব জাতির ঐক্য সম্ভারের মূলমন্ত্র, বিশ্বপ্রেমের বার্তা। ইহারই ফলে শান্তিনিকেতনের ক্ষুদ্র শিক্ষালয়টি দিনে দিনে এক সার্বভৌম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইল। সেই শান্তিনিকেতন আজ প্রাচী-প্রতীচির সৃষ্টি-কলার মিলনক্ষেত্র; সর্বদেশের মনীষীবৃন্দের সঙ্গমতীর্থ। এইখানে রবীন্দ্রনাথ জগতের শিক্ষাগুরু এবং এইখানের কাব্যলোকে তিনি গীতাঞ্জলির কবি। তাঁহার ভাব-মধুর বিশ্বপ্রীতির গীতিকাব্য তাই অতি সহজেই পাশ্চাত্য সভ্য জগতের মন হরণ করিল। ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যের জন্য নোবেল প্রাইজ লাভ করিলেন। যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলার চারণ-কবি, ভারতীয় জাতীয়তার উদ্গাতা, তিনি হইলেন বিশ্ব-মানবের মিলন-যজ্ঞের ঋষি।

আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহার এই বিশ্বপ্রেম ঘোষণার ঠিক পর বৎসরেই পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের প্রচণ্ড অগ্ন্যুদ্গার আরম্ভ হইল। জাতির পর জাতি সেই প্রলয়কাণ্ডে ঝাঁপ দিয়া পুড়িতে লাগিল। পাঁচ বৎসর ধরিয়া নরহত্যার তাণ্ডবলীলার পর আবার জাতিসমূহ দুঃসহ ক্লান্তি ও অবসাদে ভার্সেলের সন্ধিদ্বারা কোনমতে একটা জোড়াতালি দেওয়া শান্তির

আয়োজন করিল। ঐ বিগত মহাযুদ্ধে যে স্বার্থান্ধ আত্মম্ভরী উদ্ধত জাতীয়তাবাদ লম্ফঝম্ফ করিয়া আপনার অসম্ভবতায় আপনি আছাড় খাইয়া মরিল, তাহারই বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বেই বাংলাদেশে সতর্কতার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। সেই জন্যই রণশ্রান্ত অবসন্ন জগতে তাঁহার সঙ্গীত, শান্তি ও মৈত্রীর বাণী মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায় সাগ্রহে সমাদৃত হইল। এবং য়ুরোপ ও আমেরিকায় যে-দিন এই প্রাচ্য ঋষি তাঁহার আশা প্রেম বিশ্বাসের মন্ত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন, সে-দিন সে-দেশের নরনারী তাঁহাকে সাদরে সম্বর্ধনা করিলেন।

আর, আমরা, তাঁহার স্বদেশবাসীর দল, আনন্দে গৌরবে মাতিয়া উঠিলাম যে, আমাদেরই কবি রবীন্দ্রনাথ, যাঁহার সঙ্গীতে এ-দেশের লক্ষ লক্ষ স্ত্রী পুরুষ ছেলে মেয়ে মাতোয়ারা হইয়াছে যাঁহার বৈতালিক গীতে জাগিয়া এ জাতি দেশকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে, তিনিই অবশেষে সমগ্র সভ্যদেশের ঘরে ঘরে পূজিত হইলেন। বিশ্বপ্রেমের হোতারূপে তাঁহার আবির্ভাব ;—ইতিহাসের অনন্ত আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলে তাঁহার স্থান চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া গেল। আমাদের সেদিনের সে আনন্দের কথা আমাদেরই প্রাচ্যভাষায় বলিতে হয়—কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা। আর, সেই আনন্দ আজিও আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া আছে। ভাবিতেছি, দেশের এই অসহায় দুর্ভাগ্যের দিনেও ব্যাস-বাল্মীকি কালিদাসের জননী ভারতভূমি রবীন্দ্রনাথের মতো আর একটি বরপুত্র লাভ করিয়াছেন। আজিকার এই উৎসবক্ষণে সেই আনন্দই আমার একমাত্র সম্বল। অতএব আর্য ঋষিদের সেই প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণই আমার শেষ কথা—

জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।

এবারকার "সাধনা"র সর্বপ্রধান ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "রাজসিংহ"এর সমালোচনা। লেখক প্রবন্ধটিকে সমালোচনা বলিতে সম্মত নন ; সমালোচনার ধরনে ইহা লিখিত হয় নাই। কিন্তু উপন্যাসের এমন উপন্যাসবৎ সুমিষ্ট সমালোচনা আমরা ইতিপূর্বে আর দেখি নাই। "রাজসিংহ"এর অনেক প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য রবীন্দ্রবাবু এমন কৌশল সহকারে ধীরে ধীরে ব্যক্ত করিয়াছেন, যাহা কেবল তাঁহার ন্যায় সৌন্দর্যের ঐন্দ্রজালিকের পক্ষেই সম্ভবে।

বঙ্কিমবাবুর বিষয়ে এ পর্যন্ত যিনি যাহা বলিয়াছেন, বা লিখিয়াছেন, রবীন্দ্রবাবুর "বঙ্কিমচন্দ্র" তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। বঙ্কিমবাবুর বিষয়ে আমরা এরূপ রচনা দেখিতে পাইব, সে আশা ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রবাবু বাঙ্গালা সাহিত্যের মুখ রাখিয়াছেন। যথার্থ সাহিত্যসেবীর মত তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-মূর্তির উজ্জ্বল নিখুঁত চমৎকার ছবি আঁকিয়াছেন। আমরা সকলকে রবীন্দ্রবাবুর "বঙ্কিমচন্দ্র" পড়িতে অনুরোধ করি। এরূপ প্রবন্ধ ভাষার গৌরব।

"ক্ষুধিত পাষাণ" একটি অতি চমৎকার সুরচিত গল্প—একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। এই গল্পের রচনা প্রণালী যেমন সুন্দর—ইহার কল্পনা কৌশলও তেমনি মনোহর। বর্ণনা যেমন স্বাভাবিক তেমনই কবিত্বপূর্ণ। গল্পটিতে পাঠকের আগ্রহ আদ্যন্ত জাগরিত থাকে,—এবং নিঃশেষে পাঠ করিয়াও কৌতুহল পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। এই গল্পের সেই মায়া মন্দির, সেই তরুণী ইরাণী, সেই অরালী পর্বতের শিখরে ঘন সন্ধ্যা প্রভৃতি কবির অতি সুন্দর সৃষ্টি—সত্য সত্যই যেন আরব্য উপন্যাসের স্বপ্ন।

সাহিত্য সংসারে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্পাদক হইয়া "সাধনা"কে সিদ্ধির পথে আনিয়াছিলেন। তাহার পর "সাধনা" ত্রৈমাসিক হইতেছে শুনিয়া, আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, বাঙ্গলা

সাহিত্যের একটি গুরুতর অভাব পূর্ণ হইবে। কিন্তু সহসা "সাধনা"র বিলোপ হইল দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। "সাধনা" বিলুপ্ত হইল কেন, তাহার কোন কারণ সাধারণের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। তথাপি মনে হয় বাঙ্গালী পাঠকের সম্পূর্ণ সহানুভূতি পাইলে "সাধনা" বিলুপ্ত হইত না। যে দেশে "সাধনা"র মত উচ্চ শ্রেণীর মাসিকও বিলুপ্ত হইবার অবসর পায় সে দেশ নিশ্চয়ই অত্যন্ত দুর্ভাগা!

এবারকার "সাধনা"র প্রথমেই সম্পাদকের রচিত "বিদ্যাসাগর চরিত"—এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ সম্ভাবিত নহে। আমরা কেবল এ জন্য লেখকের নিকট আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। যেদিন এই প্রবন্ধ বিদ্যাসাগর-স্মরণার্থ সভায় প্রথম পঠিত হয় সেই দিন সভাপতি শ্রীযুক্ত জাষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন চরিত বিস্তৃতভাবে লিখিবার জন্য রবীন্দ্রবাবুকে সভাস্থলে অনুরোধ করিয়াছিলেন। জীবন চরিতের আলোচনায় যেরূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টি, উদার সহানুভূতি তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধি, উন্নত বর্ণনাকৌশল ও পরিণত লিপি-কুশলতার আবশ্যক—রবীন্দ্রবাবুর এই প্রবন্ধ পড়িয়া বোধ হয়, তাঁহার সে সংস্থান যথেষ্ট আছে। তিনি বিস্তৃত জীবন চরিতের রচনায় হস্তক্ষেপ করিলে সফলতা লাভ করিবেন, মনে করি!

রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্য সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখতে আমার সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে বহুবার অনুরোধ করেছেন, সম্ভবতঃ এই বিশ্বাসে যে, গদ্যলেখকরাই গদ্যসাহিত্যের মর্ম উদ্ধার করতে পারেন, আর পদ্যলেখকরা কবিতার। এ বিশ্বাস সম্ভবতঃ অমূলক। কাব্যের সমালোচনার অর্থ কবিত্ব করা নয়; এবং গদ্যসাহিত্যের সমালোচনার অর্থ নিজের অনুদার সাংসারিক মনের পরিচয় দেওয়াও নয়। যদি তাই হ'ত, তাহ'লেও কারও পক্ষে এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যের সম্যক পরিচয় দেওয়াও একেবারে অসম্ভব হ'ত। রবীন্দ্র-নাথের গদ্যসাহিত্য এত বিপুল ও বিচিত্র যে, সংক্ষেপে তা'র পরিচয় দেবার চেষ্টা করা অসাধ্য-সাধন করবার বৃথা চেষ্টা মাত্র। আজকে যে আমি উক্ত সাহিত্যের একাংশের পরিচয় দিতে উদ্যত হয়েছি, তার কারণ আজকের সভা রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচারালয় নয়। আজ এক্ষেত্রে আমরা সমবেত হয়েছি বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের প্রতি আমাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে; সমগ্র বাঙালী জাতি যে তাঁর কাছে কত বিষয়ে চিরঋণী তাই স্বজাতিকে স্মরণ করিয়ে দিতে।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বাঙালী জাতিকে বলে-ছিলেন যে—

"কোন দিন বা ভাবের স্রোত মন্দ হইয়া আসে, কোন দিন বা অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

"এরূপ হইয়া থাকে এবং এইরূপই হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কাহার প্রসাদে এরূপ হওয়া সম্ভব হইল, সে-কথা স্মরণ করিতে হইবে। আমরা আত্মাভিমানে সর্বদাই তাহা ভুলিয়া যাই।

"ভুলিয়া যে যাই তাহার প্রথম প্রমাণ, রামমোহন রায়কে আমাদের

বর্তমান বঙ্গদেশের নির্মাণ-কর্তা বলিয়া আমরা জানি না। কি রাজনীতি, কি বিদ্যাশিক্ষা, কি সমাজ, কি ভাষা, আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই, রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই।" (আধুনিক সাহিত্য, পৃঃ ৩)

পূর্বোক্ত কথা ক'টি সম্পূর্ণ সত্য। সেকালের চাইতে একালে আমরা রামমোহন রায়ের বহুমুখী প্রতিভার সঙ্গে কিঞ্চিৎ বেশি পরিচিত; কিন্তু অর্ধশতাব্দী পূর্বে রামমোহন ইতিহাসের বহির্ভূত হ'য়ে কিম্বদন্তির আশ্রয় নিয়েছিলেন। বর্তমান যুগে যে-সকল মহাপুরুষ বাঙালী জাতির মন গ'ড়ে তুলেছেন, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, তাঁদের স্মরণ "করিতেই হইবে।" কারণ এরূপ স্মরণ করায় আমরাই কৃতার্থ হই। ইংরাজ কবি Wordsworth বলেছেন যে, "By admiration we live," আর যা মহৎ তাকে admire করতে পারা আত্মোন্নতির একটি প্রধান উপায়।

রবীন্দ্রনাথ বাংলার আর একটি মহাপুরুষের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য এ সব কথা আমাদের বলেছিলেন, তাঁর নাম বঙ্কিমচন্দ্র। রামমোহন রায় যেমন বাংলার নব-জীবনের প্রবর্তক, বঙ্কিমচন্দ্র তেমনি বাংলার নব-যুগের নব-সাহিত্যের প্রবর্তক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, "বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে বঙ্গভাষার সহিত যেদিন নব-যৌবন-প্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন করাইয়াছিলেন সেইদিনের সর্বব্যাপী প্রফুল্লতা এবং আনন্দ-উৎসব আমাদের মনে আছে।" (আধুনিক সাহিত্য, পৃঃ ৬)। অবশ্য আমার মনে নেই। কারণ, বঙ্গদর্শন যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন আমি নিতান্ত বালক। তখন মন ব'লে আমার কোন পদার্থই ছিল না, সুতরাং সেকালে যদি কোন বিষয়ে বিশেষ আনন্দ পেয়ে থাকি সে বঙ্গ-সাহিত্যের মুক্তিতে নয়, খেলা-ধুলোয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-গগনে উদয়ে কি কারণে কিশোর রবীন্দ্রনাথের মন আনন্দে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছিল সে কথাও তাঁর মুখেই শোনা যাক্। তাঁর কথা এই—

"আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"কিন্তু এ-মিলন কে সাধন করিতে পারে? বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য। যখন বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শন একটি নূতন প্রভাতের মত আমাদের বঙ্গদেশে উদিত হইয়াছিল তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জগতে কেন এমন একটি অপূর্ব আনন্দ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল? য়ুরোপের দর্শনে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে পাওয়া যায় না এমন কোনো নূতন তত্ত্ব, নূতন আবিষ্কার, বঙ্গদর্শন কি প্রকাশ করিয়াছিল? তাহা নহে, বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল—বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দ-সম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল।" (শিক্ষার হেরফের, পৃঃ ১৩)।

একথা রবীন্দ্রনাথ প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে বলেছিলেন। আর রবীন্দ্র-সাহিত্য আজ চল্লিশ বৎসর ধ'রে বাঙালীর শিক্ষার সঙ্গে জীবনে সামঞ্জস্য সাধন, প্রাণের সঙ্গে ভাবের আনন্দ-সম্মিলন সংঘটন ক'রে আসছে।

এ সাধনার ছ'টি দিক্ আছে। তা'র একটি দিক্ হচ্ছে নব-রস-সাহিত্য সৃষ্টি করা, আর একটি দিক্ হচ্ছে নানা বিষয়ে মানুষকে উদ্বোধিত করা। তাই বঙ্কিমচন্দ্র শুধু উপন্যাস লেখেন নি, প্রবন্ধও লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথও শুধু কাব্য ও উপন্যাস লিখে ক্ষান্ত হন নি, নানা বিষয়ে তাঁর মতামত প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেছেন। এঁরা উভয়েই স্বজাতিকে আনন্দ ও শিক্ষা দুই-ই সমান দান করেছেন। বলা বাহুল্য আমরা যাকে প্রবন্ধ বলি তা ইংরাজী Essay শব্দের প্রতিবাক্য মাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যে Essay নেই, য়ুরোপীয় সাহিত্যেও ছিল না; Renaissance-এর সময়ে এ-সাহিত্য জন্মলাভ করে। য়ুরোপীয় সাহিত্যেও Essay বলতে কি বোঝায় সে-সম্বন্ধে নানা মত আছে, কারণ Essay বহুরূপী। আর ইংরাজী অভিধানেও কথাটির অর্থ খুব স্পষ্ট নয়। Johnson-এর Dictionary-তে Essay-র অর্থ—a

loose sally of the mind—এ ব্যাখ্যা কি ঈষৎ অবজ্ঞাসূচক নয়? সে যাই হোক্, Essay বর্তমান য়ুরোপীয় সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। জনৈক খ্যাতনামা ইংরাজ লেখক বলেছেন যে, য়ুরোপীয় সাহিত্যে দেখা যায়—প্রথমে ছিল কবিতা, তা'র পর এর treatise, তারপর আবির্ভূত হ'ল essay; that characteristic literary type of one of our time, a time so rich and various in special apprehensions of truth (Walter Pater—Plato and Plato'ism).

এ কথা যদি সত্য হয়, এবং আমার বিশ্বাস মূলতঃ সত্য, তা হ'লে প্রবন্ধ যে নবযুগের বঙ্গসাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ হবে সে-বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধ-সাহিত্যে বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যকে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছেন, তার কারণ তাঁদের মন was so rich and various in special apprehensions of truth.

প্রবন্ধ সাহিত্যের বৈচিত্র্যই তার বিশিষ্টতা এবং রবীন্দ্রনাথের সমগ্র প্রবন্ধাবলীকে বিচিত্র প্রবন্ধ বলা যায়। এই প্রবন্ধাবলী বিষয়ের বৈচিত্র্যে ও ভাবের ঐশ্বর্যে বাঙলা সাহিত্যে অতুলনীয়। এই প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রসাদে বাঙালী জাতির মনে নানা দিকে চিন্তা ও ভাবের নানা উৎস খুলে গিয়েছে। কি রাজনীতি, কি বিদ্যাশিক্ষা, কি সমাজ, কি ভাষা—আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নেই রবীন্দ্র-নাথের প্রতিভা যার উপর নূতন আলোকপাত করেনি। এ ক্ষেত্রে আমি, রবীন্দ্রনাথ আমাদের সম্বন্ধে যে-সব মতামত প্রকাশ করেছেন, তারই দু'একটি কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। কারণ, এ যুগে শিক্ষা ও সাহিত্যের যোগাযোগ অতি ঘনিষ্ঠ।

আমার বক্তব্য-কথা পরিষ্কার করতে রবীন্দ্রনাথের সদ্যপ্রকাশিত একখানি পুস্তকের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব। আজ পর্যন্ত স্বজাতির শিক্ষার কথাটা তাঁর মনের উপর কি রকম প্রভুত্ব করছে এই গ্রন্থে তা'র পরিচয়

পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের সদ্যপ্রকাশিত "রাশিয়ার চিঠি" প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের শিক্ষার অভাব ও ত্রুটির জন্য আক্ষেপ মাত্র। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "রাশিয়ায় গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখ্‌বার জন্য"। আর এই কথা তিনি একখানি চিঠিতে নয় বহু চিঠিতে বলেছেন এবং একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই যে, আজকের দিনে রাশিয়ায় যাওয়া সার্থক, বিখ্যাত আমেরিকান দার্শনিক Dewey-র তাই মত। তিনি বলেছেন যে—

One can appreciate the inner meaning of the New Russian Life more intimately and justly by contact with educational effort than with specific political and economic conditions.

(Impression of Soviet Russia)

য়ুরোপ ও আমেরিকার যে সব খ্যাতনামা লেখক, নব-রাশিয়া চোখে দেখে সে-দেশ সম্বন্ধে নিজেদের অভিজ্ঞতা পাঁচজনের কাছে প্রকাশ করেছেন—তাঁরা সে-দেশে গিয়েছিলেন অন্য উদ্দেশ্যে। Karl Marx-এর Das-Kapital মূর্তি পরিগ্রহ করে কি রূপ ধারণ করেছে, দেবতার না অপদেবতার, তারই সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করা ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য, এবং তাঁরা নিজের নিজের শিক্ষাদীক্ষা রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে, communism সম্বন্ধে কেউ আস্তিক, কেউ বা নাস্তিক হ'য়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। Karl Marx গড়েছিলেন Theory, Lenin করেছেন তা'র Experiment; সুতরাং সে প্রাচীন Theory-র সঙ্গে যাঁদের সম্যক পরিচয় ছিল, তাঁরা এই বিরাট Experiment-এর ফলাফল চোখে দেখবার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। নব-রাশিয়ায় নব শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে তাঁরা অনেকেই অল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন, আর তা'র দোষগুণও বিচার করেছেন, কিন্তু তা শুধু প্রসঙ্গত মাত্র। কারণ সর্বজনীন লোক-শিক্ষা তাঁদের দেশেও আছে। রবীন্দ্রনাথ হতভাগ্য ভারতবর্ষের লোক, তিনি বলেছেন, 'ঐ দেশের আবহাওয়াতেই আমিও

ত মানুষ, সেইজন্যেই জোরের সঙ্গে মনে করতে সাহস হয় নি যে, বহু কোটি জনসাধারণের বুকের উপর থেকে অপেক্ষা ও অসামর্থ্যের জগদ্দল পাথর ঠেলে নামানো সম্ভব।" ফলে, রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় শিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নতি দেখে যুগপৎ বিস্মিত ও চমৎকৃত হয়েছেন। কারণ—"আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে গিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।" এতে ভারতবাসী মাত্রই চমৎকৃত হবে। কারণ শিক্ষা সম্বন্ধে জারের রাশিয়ার লোকের অবস্থা আমাদেরই অনুরূপ ছিল। এবং রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্বে বলেছিলেন যে,

"এই সব মূঢ় ম্লান মুখে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে ভাষা।
এই সব ভগ্ন শুষ্ক বুকে জাগায়ে তুলিতে হবে আশা।"

কিন্তু আমরা কি উপায়ে তা করতে হবে তার সন্ধান করিওনি, পাইওনি।

ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোক আজও মূঢ় ম্লান ভগ্নোদ্যম ও আশাহীন, তাই নব-রাশিয়ায় মনের এ মুক্তি তাঁর কাছে miracle স্বরূপে প্রতিভাত হয়েছে। আমাদের শিক্ষাবিষয়ক দৈন্যের তুলনায় বোলশেভিক্ রাশিয়ায় লোকশিক্ষার ব্যবস্থা তাঁর নয়ন-মনকে মুগ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথ চিরকালই দেশের লোককে ব'লে এসেছেন যে ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান সমস্যা হচ্ছে শিক্ষার সমস্যা আর কি উপায়ে এ সমস্যার সমাধান করা যায় তারও বিচার করেছেন। শিক্ষাই যে জনগণের অভ্যুদয়ে প্রধান সহায়, এ জ্ঞান তিনি রাশিয়ায় গিয়ে লাভ করেন নি, তাই তিনি বলেছেন যে, "গ্রামের কাজ ও শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে আমি এতকাল যা ভেবেছি এখানে তা'র বেশী কিছু নেই, কেবল আছে শক্তি, আছে উদ্যম, আছে কার্যকর্তাদের ব্যবস্থাবুদ্ধি"। এক কথায়, শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা রাশিয়ায় দেহলাভ করেছে, ভারতবর্ষে করে নি। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি" ভারতবর্ষের শিক্ষার অভাবে এবং ত্রুটির জন্য আক্ষেপ মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ যে চিরদিন ধ'রে দেশবাসীর শিক্ষার কথা ভেবেছেন, তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধের অন্তরে।

এ দেশের অধিকাংশ লোক যে নিরক্ষর এ-কথা সকলেই জানেন। ভাষার বর্ণ-পরিচয় হলেই যে লোক শিক্ষিত হয়, তা অবশ্য নয়। কিন্তু বর্ণ-পরিচয়ের অভাবে এ-যুগে যে কেউ কোনও-রূপ শিক্ষা লাভ করতে পারে না—সে-কথাও নিঃসন্দেহ। একের সঙ্গে অপরের মনের যোগাযোগের প্রশস্ত পথ হচ্ছে লেখাপড়ার পথ। সুতরাং যে দেশে স্বল্পসংখ্যক লোক শিক্ষিত ও অসংখ্য লোক নিরক্ষর সে-দেশে, এই দুই শ্রেণীর ভিতর ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রভেদ সৃষ্টি হয়। ফলে, সমাজের অধিকাংশ লোককে মনোরাজ্যে অস্পৃশ্য ক'রে রাখায়, সমাজের উভয় শ্রেণীই পঙ্গু হয়ে পড়ে—বিশেষতঃ সেই দেশে যে-দেশে শিক্ষিত সমাজ বিদেশী শাস্ত্রে শিক্ষিত আর জনগণ সর্বশাস্ত্রে সমান অশিক্ষিত ?

দেশের অনেকেই কিছুদিন ধরে mass education-এর জন্য লালায়িত হয়েছেন, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে তাঁরা জনগণকে শিক্ষা দিতে চান তা খুব স্পষ্ট নয়; সম্ভবতঃ mass তাঁদের লেখা খবরের কাগজ প'ড়ে তাঁদের মতাবলম্বী হবে এই আশায়; আর কেউ বা একমাত্র বিলেতি সভ্যতার নকল হিসাবে। বিলাত দেশটা ধনে ও বলে সমৃদ্ধ দেশ, অতএব সে-দেশে যখন লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তখন এদেশেও উক্তরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা করতে পারলে আমরা ধন ও বল লাভ করব এই লোভে তাঁরা লোক-শিক্ষার পক্ষপাতী হ'য়ে পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ideal কিন্তু স্বতন্ত্র। তাঁর মতে মানুষকে মানুষ ক'রে তোলাতেই শিক্ষার সার্থকতা। আর এ সত্য তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ কথা—"ধনীর ঘরে ছেলে জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু ধনীর ছেলে বলিয়া বিশেষ একটা কিছু হইয়া কেহ জন্মায় না। ধনীর ছেলে ও দরিদ্রের ছেলে কোনও প্রভেদ হইয়া আসে না।" যিনি এই সহজ সত্যটি উপলব্ধি করেন নি তাঁর মুখে লোক-শিক্ষার কথা একটা বুলি মাত্র। কারণ mass-এর সঙ্গে আমাদের মত bourgeois

সম্প্রদায়ের প্রধান প্রভেদ। মূলতঃ আমরা সকলেই মানুষ। সুতরাং মানুষকে মানুষ ক'রে তোলাই যখন শিক্ষার উদ্দেশ্য তখন শিক্ষালাভে সকলের সমান অধিকার আছে। রাশিয়ার যে-শ্রেণীর লোক আজ সমগ্র জাতির হর্তা-কর্তা-বিধাতা হয়ে উঠেছেন, তাঁরা যে লোকসমাজকে মানুষ ক'রে তোলার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন এতেই রবীন্দ্রনাথ চমৎকৃত হয়েছেন, কারণ তা করা যে-কোন দেশে, অন্ততঃ আমাদের দেশে, সম্ভব তা রবীন্দ্রনাথ কখনও কল্পনাও করেন নি। আমাদের মনে নানারূপ সংকল্প জন্মলাভ করতে পারে, কিন্তু সে-সব সংকল্প কার্যে পরিণত করবার সামর্থ্য আমাদের নেই। "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথাঃ," আর আমরা জাতি-হিসাবে ধনে ও প্রাণে সমান দরিদ্র। আমি অবশ্য সে-জাতের লোক নই যাঁরা মনে করেন যে, অবস্থার দোষে যে ideal-কে হয়ত কার্যে পরিণত করা না যায় সে ideal-এর কোনও মূল্য নেই। একটা বড় ideal-কে জীবনে ভাঙিয়ে নিতে না পারলেও, আমাদের মনের উপরে তার প্রভাব প্রবল। আমরা যাকে শিক্ষা বলি, তার একটা উদ্দেশ্য কতকগুলি ideal-এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া, যাতে ক'রে আমাদের মনের শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে আমরা তাদের অন্তরঙ্গ করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ লোক-শিক্ষার যে ideal গড়েছেন, তা কোন সম্প্রদায় বিশেষের ideal নয় —সমগ্র মানব-সমাজের ideal এবং তিনি মনে করেন বর্তমান রাশিয়া সে ideal-কে সার্থক করেছে—এতেই তাঁর আনন্দ। এর থেকে আমরা আশা করতে পারি যে, আজ না হোক্ কাল ভারতবর্ষেও এ শিক্ষার ideal-কে real করতে পারব, যদিচ আমি জানি এদেশে মানুষকে মানুষ জ্ঞান করা আমাদের পক্ষে কত কঠিন। কারণ, আমরা যুগ-যুগ ধ'রে লক্ষ লক্ষ লোককে জীবনে অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছি, তার পর বিদেশী শিক্ষার প্রসাদে এ যুগে কোটি কোটি লোককে মনের কাছে অস্পৃশ্য ক'রে ফেলেছি। আমি পূর্বেই বলেছি যে, রাশিয়ার চিঠি প্রকারান্তরে স্বদেশের শিক্ষার অভাব ও ত্রুটির জন্য আক্ষেপ। এ

অভাব হচ্ছে লোক-শিক্ষার অভাব, আর এ ত্রুটি হচ্ছে আমাদের বর্তমান সরকারী শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি।

প্রাক্-বোলশেভিক যুগে রাশিয়ার উচ্চশিক্ষার পদ্ধতি যে কি ছিল, তা আমরা ঠিক জানিনে। তবে এইমাত্র জানি যে, Czarist যুগেও রাশিয়ায় বহু উঁচুদরের সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকের সাক্ষাৎ আমরা পাই যাঁদের নাম আজ জগৎ-বিখ্যাত। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, সে-দেশে পূর্বযুগের শিক্ষাপদ্ধতি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল না। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে কেউ বড় বৈজ্ঞানিক হ'তে পারে না। আর বড় সাহিত্যিকও শিক্ষিত সমাজের অন্তরেই আবির্ভূত হয়। রাশিয়ার পূর্ব শিক্ষার আর যাই দোষ থাক্ বিদেশী ভাষা সে-শিক্ষার বাহন ছিল না।

বর্তমান ভারতবর্ষে কলেজি-শিক্ষার প্রসাদে যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে, সে শ্রেণীর শিক্ষিত মন যে পক্ক-কষায় নয় তা সকলেই জানেন। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্বে বলেছেন যে—"এরূপ শিক্ষা-প্রণালীতে আমাদের মন যে অপরিণত থাকিয়া যায়, বুদ্ধি যে সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পায় না, সে-কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে।" রবীন্দ্রনাথের একথা অস্বীকার করা অসম্ভব। আমাদের শিক্ষিতাভিমানী সমাজের কাছে এ-কথাটা অপ্রিয় হ'লেও সম্পূর্ণ সত্য। যে-বিদ্যা আমরা স্কুলে-কলেজে অর্জন করি সে-বিদ্যা বেশীর ভাগই মুখস্থ বিদ্যা। আমাদের জাতের যে বুদ্ধি কম, এ-কথা আমরা মনে করিনে, রবীন্দ্রনাথও যে করেন না, তা তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন। বাঙালী জাতির মন যে বিদেশী বিদ্যার চাপে পঙ্গু হ'য়ে পড়ছে। মনোজগতে আমরা যে আজও পরভাগ্যোপজীবী, এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর নেই। আমাদের বর্তমান শিক্ষার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে, ইংরাজী আমাদের শিক্ষার বাহন আর প্রধান অভাব হচ্ছে শিক্ষার মিলন।

প্রথমেই শিক্ষার মিলন অর্থে রবীন্দ্রনাথ কি বোঝেন দেখা যাক্। তিনি বলেছেন যে, আমাদের দেশের বিদ্যা-নিকেতনকে পূর্ব-পশ্চিমের

মিলন-নিকেতন ক'রে তুলতে হবে। অর্থাৎ "যে বিদ্যার জোরে পশ্চিম বিশ্বজয় করেছে" সেই বিদ্যা আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। এ বিদ্যার নাম বিজ্ঞান। আর এ বিদ্যা যে পশ্চিমের লোকই আবিষ্কার করেছে ও আয়ত্ত করেছে এ-কথা সজ্ঞানে অস্বীকার করা চলে না। কারণ যারা অস্বীকার করে "বাইরের বিশ্বে তারা সকল দিকেই মার খেয়ে মরচে, তারা আর কর্তৃত্ব পেলে না।" জড়-জগতের উপর যথেষ্ট কর্তৃত্ব লাভ করা বিজ্ঞান-শিক্ষা-সাপেক্ষ। বাইরের বিশ্বের উপর প্রভুত্ব লাভ করতে হ'লে আমাদের পক্ষে বিজ্ঞানের জ্ঞান-মার্গ ও কর্ম-মার্গ উভয় মার্গই সাধনা করতে হবে। আমাদের বিদ্যালয়ে যে-ভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় তাতে আমরা শুধু ও শাস্ত্রের কতকগুলি সূত্র কণ্ঠস্থ করি মাত্র। তার ফলে বাইরের উপর আমাদের কোনরূপ কর্তৃত্ব জন্মায় না।

অপর পক্ষে পূর্ব মহাদেশ অন্তরাত্মার যে-সাধনা করেছে সেই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মতে অমৃতের অধিকার লাভ করবার উপায়। অতএব পূর্ব-পশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয়, তা হ'লে উভয়েই ব্যর্থ হবে। তাই রবীন্দ্রনাথের মতে পূর্ব-পশ্চিমের মিলন-মন্ত্র উপনিষৎ দিয়ে গেছেন। সে-মন্ত্র হচ্ছে—

"অবিদ্যায়া মৃত্যুংতীর্ত্বা বিদ্যায়া মৃতমশ্নুতে"

ভারতবর্ষে নব-শিক্ষার এই হচ্ছে যথার্থ ideal, কারণ আমরা পশ্চিমের নববিদ্যাকেও প্রত্যাখ্যান করতে পারিনে—ভারতবর্ষের সনাতন বিদ্যাকেও উপেক্ষা করতে পারিনে। রামমোহন রায়েরও শিক্ষার আদর্শ ঐ একই।

আমাদের বর্তমান শিক্ষার গোড়ায় গলদ হচ্ছে, এ শিক্ষার বাহন ইংরাজী ভাষা—আমাদের মাতৃভাষা নয়। এ শিক্ষার ফলে আমাদের শিক্ষিত সমাজ যে-বিদ্যা অর্জন করেন সে-বিদ্যা শুধু পুরোপুরি আমাদের মনে বসে না। এবং দেশের শিক্ষিত মন যে ফলে অপরিণত অবস্থাতেই থেকে যায় তাতে আর আশ্চর্য কি। রবীন্দ্রনাথ কন্মম ধ'রে অবধি এই সহজ সত্যটির প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি এ

যাবৎ শিক্ষা সম্বন্ধে যত প্রবন্ধ লিখেছেন তার প্রতিটিতেই এ-কথার পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু দেশের ইংরাজী শিক্ষিত লোক সে-কথায় বড় একটা কান দেয় নি এবং বহু শিক্ষাভিমানী লোকে কথাটিকে কবিত্ব ব'লে হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। যাঁরা মনে করেন য়ুরোপীয় সভ্যতা প্রাণপণে নকল করতে পারলেই আমাদের মোক্ষ লাভ হবে, তাঁদেরও এ সত্যটি চোখ এড়িয়ে গিয়েছে যে, য়ুরোপে এমন কোনও দেশ নেই যেখানে শিক্ষার বাহন স্বদেশী ভাষা নয়। এর কারণ শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। যে-শিক্ষা প্রণালীতে সকলেই অভ্যস্থ তার আমুল পরিবর্তন করাটাকে তাঁরা শিক্ষাজগতে revolution স্বরূপে গণ্য করতেন। এবং এ revolution করা যে অসম্ভব, এই ছিল তাঁদের ধারণা। যাঁরা মনে করেন যে, মাতৃভাষাকে আমাদের শিক্ষার বাহন করা অসম্ভব, তাঁদের অবশ্য আমাদের জগতের মনের স্বরাজ্য লাভের দুরাশায় জলাঞ্জলি দিতে হবে। এই যদি আমাদের কপালের লেখা হয় তবে বৃথা আক্ষেপের কোন কারণ নেই। দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে আমাদের সাংসারিক ও মানসিক অভ্যুদয়ের জন্য ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করা আমাদের যে নিতান্ত প্রয়োজন এ বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের মনে দ্বিধা নেই। তবে মাতৃভাষার উপর সম্যক্ অধিকার না জন্মালে একটি বিদেশী ভাষাকে যথার্থ আয়ত্ত করা যায় না তার প্রমাণ, যে দুটি বাঙালীর ইংরাজী রচনা ইংলণ্ডেও সাহিত্য-স্বরূপে গ্রাহ্য হয়েছে—তাঁরা উভয়েই প্রধানতঃ বাঙলা সাহিত্যিক, তাঁদের একজনের নাম রামমোহন রায়, অপরের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমি বিশেষ করে এ-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্বন্ধে মতামতের উল্লেখ করছি এইজন্য যে, চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমাদের যে ত্রুটি ও যে-অভাব রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছিল সে-অভাব ও সে-ত্রুটি আজও সমান রয়ে গিয়েছে। আজও আমাদের শিক্ষার বাহন ইংরাজী ভাষা এবং আজও আমাদের জীবনের মনোজগতে পূর্ব পশ্চিমের শিক্ষার মিলন

হয়নি। ফলে, আমাদের শিক্ষার সঙ্গে আমাদের জীবনের অসামঞ্জস্য ইতিমধ্যে কমা দূরে থাক্ বেড়েই চলেছে।

এ রোগের প্রতিকারের উপায় কি? এ স্থলে রবীন্দ্রনাথের একটি কথার পুনরুল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি। বহু পূর্বে রবীন্দ্রনাথের মনে এ প্রশ্নের উদয় হয়েছিল যে—"এ মিলন কে সাধন করিতে পারিবে?" তিনি বলেছিলেন—"বাঙলা ভাষা বাঙলা সাহিত্য।" এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য। আজকের দিনে বাঙলা সাহিত্য যে কতক পরিমাণে উক্ত মিলন সাধন করছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। আজকের দিনে বাঙালী জাতির প্রধান গৌরবের বিষয় হচ্ছে বাঙালা সাহিত্য। এ-সাহিত্য বাঙালী জাতির মনকে নব ভাবে উদ্বোধিত করেছে। আজ এ-সভায় যাঁরা সমবেত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই ইংরাজী শিক্ষিত অথচ বাংলা-সাহিত্যের ভক্ত। এই কি আমাদের নবভারতের প্রত্যক্ষ নিদর্শন নয়? এবং বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের বিস্তার ও উন্নতির জন্য বাঙালী জাতি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কাছে চিরঋণী থাকবে। আমাদের আত্মপ্রকাশের প্রেরণা এঁদের কাছ থেকেই এসেছে এবং বাঙলা ভাষার শক্তি ও ঐশ্বর্য যে কতদূর তা এঁরাই আমাদের কাছে reveal করেছেন।

শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দু'টি মূলকথা আপনাদের কাছে পুনরুত্থাপন করলুম, কারণ এ দু'টি যুগপৎ ভাবের কথা ও কাজের কথা। কিন্তু এ উপায়ে মূল উদ্ধার করতে গিয়ে আমাকে শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে অসংখ্য সত্য কথা বলেছেন, সে-সব কথা এ প্রবন্ধে উহ্য রয়ে গেল। শুধু শেষে এই কথাটি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, রবীন্দ্র-সাহিত্য is so rich and various in special apprehensions of truth যে, দু'কথায় তার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। আমার আসল কথা এই—বাঙলা-সাহিত্য যদি বাঙালী জাতির শিক্ষার অন্যতম উপায় হয়—তাহ'লে রবীন্দ্রনাথ যে এ-যুগে আমাদের সর্বপ্রধান শিক্ষাগুরু, তার আর সন্দেহ নেই।

কাল বিকেলে বসে বসে ইণ্ডিয়ান আর্টের গোড়াকার কথা ভাবছিলুম। পুবের আর্টের থেকে বিমুখ ছিলেন তখন সবাই। আমার ওর থেকে কিছু যে পাবার আছে মনেই আসতো না। যখন পুবের আর্টের দিকে ছাত্রদের চোখ ফেরানোর কাজ আমার উপরে পড়লো তখন কী উপায় করা যায়। জোর করে ঘাড় ফেরাতে গেলে নিজের-দেশের আর্টের দিক ছেলেরা ভাবতে পারে—জবরদস্তি করছি, সেই জন্যে প্রথম প্রথম আমি যেমন ছোট ছেলেকে ভোলায় একটু রং, একটু রূপ, একটু রস নিয়ে কারবার শুরু করলেম। এমনি করে ভুলিয়ে তাদের চোখ একদিক থেকে আর একদিকে ফিরিয়ে দিলুম। আমার দাদা এসে দিলেন একটু ধাক্কা। তখনকার মর্ডান ইউরোপিয়ান আর্ট যা এখন পুরোনো হয়ে গেছে ভূকম্পনের দোলার মত নাড়া খেলে গুরু শিষ্য সবার মনে; দুলেছিল মন; কিন্তু টলেনি পা নিজের পথ ছেড়ে।

তারপর রবিকা চিত্রকর্মে হাত দিলেন। রবিকা যা আঁকলেন তা নতুন নয়। যখন সবাই বললে—'এ একটা নতুন জিনিস; আমি বললুম, 'নতুন নয় এ'। নতুন হতে পারে না। রবিকা আমাকে একবার বললেন—'আচ্ছা, অবন, এই যে কিউবিজিম্ এলো এটা কিছু বুঝতে পারছিনে—তুমি কী বলো? বুঝিয়ে বলো তো'। আমি বললুম—'কী আর বলব রবিকা, রাধারও প্রেম আর কুব্জারও প্রেম। কিউবিজিম্ তো নয়, কুব্জাইজিম্ বলতে পারো'। শুনে রবিকা খুশী হয়ে উঠলেন। বললেন—'কথাটা বলেছ ভালো অবন'।

তাই বলছি—রবিকার আঁকা ছবিকে তো কিউবিজিম্ বলা যায় না, নতুনও বলতে পার না। রবিকার ছবিতে যা আছে তা বহু আগে থেকে হয়ে আসছে। যে সব রং নিয়ে উনি কারবার করেছেন নেচারে সে

সব আছে। মাঠের ডিজাইন, নদীর জলের ডিজাইন,—দেখো, সব ছড়ানো আছে। রবিকার ছবিও এসব থেকে হয়েছে। তাকে নতুন বলব কোন্ হিসাবে? সবই ছিল, সবই আছে নেচারে। রবিকার ছবিতে নতুন কিছু নেই, অথচ তারা নতুন—আমার শুধু এই আশ্চর্য ঠেকে। কেমন করে এই মানুষের হাত দিয়ে এই বয়েসে এই জিনিস বের হলো। অতীতের কতখানি সঞ্চয় ছিল তাঁর ভিতরে। অতি গভীর অন্তরের উষ্মা ও তাপে এই রং রূপ সমস্তই যেন প্রকৃতির খেলাঘরে লুকানো সামগ্রী হঠাৎ আবিষ্কারের আনন্দ দিয়ে নির্মিত; ফেটে বেরিয়েছে, রূপ পেয়েছে। এই যে একটা volcanic ব্যাপার—এ থেকে শিখতে পারবে না, হবে না তা। ভলকানিক্ ইরাপ্‌শনের মতো এই একটা একটা জিনিস হয়ে গেছে। এই থেকে আর্টের পণ্ডিতরা কোনো আইন বের করে যে কাজে লাগাতে পারবে আমার তা মনে হয় না। ভেবে দেখো, এত রং, এত রেখা, এত ভাব সঞ্চিত ছিল অন্তরের গুহায় যা সাহিত্যে কুলোলো না, গান হলো না—শেষে ছবিতেও ফুটে বের হতে হলো—তবে ঠাণ্ডা। আগ্নেয়গিরি—একটা পাহাড় যখন তার ভিতর ধাতু গলে টগ্‌বগ্ করে ফুটতে থাকে—পারে না আর ধরে রাখতে, ফেটে বেরিয়ে পড়ে,—চারিদিকে ছড়িয়ে যায় তবে পাথর ঠাণ্ডা হয়; এও ঠিক সেই ব্যাপার। যা করে গেছেন রবিকা তা এক একটি ছোট ছোট Lava-র টুকরো—ওঁর ভিতরে ছিল। সবাই এ জিনিস বোঝে না। আগ্নেয়গিরির কবল থেকে আগুন আহরণ করে আনা যে শক্ত ব্যাপার—সে কি সবাই পারে? আগে জ্বালা ধরুক তবে প্রকাশ পাবে। রবিকা বলতেন—'আমার আঁকা ছবি যখন দেখি, যেন কোনো অতীতকালের জিনিস বলে মনে হয়'। কত বড়ো কথা। কত এগিয়ে চলে যেতেন যে কয়েক বছর আগের তাঁরই আঁকা ছবি তাঁর নিজের কাছেই কোন্ অতীতকালের ব্যাপার বলে মনে হতো'।

গাছগুলো যে বীজ থেকে ঠেলে উপরে ওঠে, ঝড়, ঝঞ্ঝা সয়—কেন? মাটির নীচে থাকলেই তো পারতো। পারে না ভিতরে থাকতে,

মাটি ফুঁড়ে আলো আকাশের দিকে বেরিয়ে পড়ে, চারিদিকে হাত বাড়িয়ে ডালপালা বিস্তার করে, ফুলে ফলে পাতায় ভরে উঠে রূপ রং-এর ফোয়ারা ছিটিয়ে প্রকাশ পায়। রবিকার জিনিসও তাই। এ রকম কেউ পারে না—তা নয়। হয়ে গেছে, এই নেচারেই কত হয়ে গেছে। দেখছিলুম আজ একটা গিরগিটি, এই একটা গিরগিটি একটা ঝিনুকের মধ্যেও সব রং আছে। এই সব সঞ্চয় ছিল তাঁর। আমারও সঞ্চিত ছিল, দিতে পারলুম না; তাই আঁকুপাঁকু করি, ভাবি কি করলে কোন্ সাধনা করলে দিতে পারি এই জিনিস। আমি অল্প একটু দিতে পেরেছি ;ছোট্ট চড়ুই পাখী, তার ছোট বুকে করে যেমন বাচ্চাকে মানুষ করে, ছোট চঞ্চুতে করে খাইয়ে তাকে বাঁচায়। তবু এখনও আমি যেটুকু দিতে পারি, যেটুকু জোর পাই, তোমরা তাও পার না। না দেওয়ার দুঃখ যে কত।

ছবির গোড়াকার কথা হচ্ছে রূপভেদ। একটা গাছকে দেখছি—দেখি তার ভেতর Human quality। রবিকা গান গেয়েছেন—'তুমি কে গো? আমি বকুল।' কেন কিশোরী মেয়েটি ঝরে যাবে দু'দিন বাদে। 'তুমি কে গো? আমি পারুল।' হাসি খুশিতে ভরা আর সাজসজ্জার বাহারে উজ্জ্বল, তার যেন বিশেষ একটা গর্ব আছে। 'আমি শিমূল'—একটু লজ্জিত, একটু কুণ্ঠিত,—যেন সুকুমারী। তিনি তো শুধু ফুল দেখেন নি, দেখেছেন তার ভিতরে এই সব Human quality-র রূপ। এই যে রূপভেদ—আমরা দুই-ই দেখি। মানুষের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা, তাই এসে যায় মানুষই। রূপ is form, চোখে দেখি, মনেও দেখি। দুটো রূপ। মানুষের মনে যা-দেখি, তা মানুষিক ভাব আর চোখে দেখি প্রকৃতির ভাব। এই দুই মিলিয়ে সৃষ্টির পরিপূর্ণতা। দুই-ই থাকা চাই। মনের দেখাও থাকা চাই, চোখের দেখাও থাকা চাই। রবিকার গানে কথা ও সুরের পরিণয় হয়েছে। তার মাধুর্য আশ্চর্য জিনিস। আবার এরকম গান, তাতে সুর আছে শুধু। কিন্তু তাতেও একটা feeling আছে।

সুর মানে accent। তাতে মনের ভাব, রাগ অনুরাগ ধরা দেয়— ভিতরে পৌঁছয়। সাধারণ কথারও সুরের তফাতে মানে বদলায়।

শুধু রং-এর বা form-এর একটা appeal আছে বৈকি।

বর্ণের significance যেমন নীল ফুলটি, লাল ফুলটি চোখে লাগে বেশ।

অনেক সময় মনেও বেশ লাগে। মনটা বিক্ষিপ্ত আছে—কালো মেঘ করে এসেছে—দেখে মনটা শীতল করে। চক্ষুরও তাই, সবুজ রং—খোলা বিস্তীর্ণ মাঠ দেখে চোখটা জুড়োয়। আমরা যখন ছবি আঁকি, কালো রং বুলোই, তখনও আমরা রং দেখি। কালো শুধু কালো নয়। রাত্তির যেমন কালো হলেও, সব রংই তাতে থাকে— এও তাই।

আমাদের আগে তিন রকমের ছবি হয়ে গেছে। মোগল ছবি, পারসিয়ান ছবি, অজন্তার ছবি। এ তিনের তফাৎ আছে, কিন্তু তিনটিই ভালো। ছোট বড় নেই। মোগল ছবি একটু realistic। পোর্ট্রেট যা করেছে লাইট-শেড পড়েছে—মানুষগুলি মানুষ ঘেঁষা, ফুলগাছ বা নেচারের অন্য দিকটা তারা বেশি নেয় নি; মানুষের পিছনে যা একটু আধটু দিয়েছে। ঐ পর্যন্তই। রেমব্রেণ্ট আর একটু বড়, তিনি লাইটশেডের কোয়ালিটি বাড়িয়েছেন; কিন্তু মানুষের বাইরে যেতে ততটা সাহস করেন নি।

পারসিয়ান ছবি সেও একটা বড় জিনিস। তাতে realistic-এর দিকটা চেপে গেছে। তারা চিত্র লিখে গেছে। তারা রেখার ভঙ্গীতে ভাব ফুটিয়েছে। মেয়ে গালে হাত দিয়ে বসে আছে, মাথার উপর Willow গাছটি ঝুলে পড়েছে। সেখানে রেখার ভঙ্গীই আসল। মানুষকে তারা পুতুল সাজিয়েছে। মুখের ধরনও বেশি এগোয়নি, তারা একটা ধারা বেঁধে নিয়েছে পুরুষ মেয়েতে। তারপর সব পুরুষের বা সব মেয়ের মুখেতে আর পার্থক্য বা বিশেষত্ব রাখেনি।

অজন্তা—আমার মনে হয় এগুলো কেভের ভিতর বুদ্ধের জীবন-চরিত লেখার মতো। চরিত্রচিত্রণ, ভিত্তিচিত্রণ, সব বলতে পার—

সারি সারি আছে। যথেষ্ট রস নিয়ে কারবার নেই—সেটা পৃথক ধরনের ছবি। ভাবরাজ্যের দূত তারা। ভাবুক হয়তো বোঝে সে ছবি, নয়তো এড়িয়ে যায় দৃষ্টি। তারা সবকিছু এমন কি বুদ্ধকেও একটা ধারায় ফেলে নিয়েছিল। দু'একটি প্রিমিটিভ মেয়ে ছাড়া। বোধহয় যখন ওঁরা কাজ করতেন গাঁয়ের মেয়েরা এসে দাঁড়াতো সেখানে, তাঁদের কাজ দেখতো—শিল্পীর চোখ তা এড়ায়নি। তাদের ছাপ পড়ে গেছে ছবিতে। মুঙ্গেরে আমার হতো এই রকম। ছবি আঁকতুম—পিঠের দিকে গাঁয়ের ছেলেমেয়ের ভিড় জমে যেত।

হ্যাঁ, বুদ্ধের মূর্তির কথা বা নটরাজের মূর্তির কথা বলি। তাঁদের যা মূর্তি হয়েছে, মানুষ নয়—একটা টাইপ সৃষ্টি করেছে। সে সব মূর্তির ভিতরে মানুষ পাচ্ছি অথচ তা ছাড়িয়েও আর একটা কিছু পাচ্ছি। কত বুদ্ধের মূর্তি ভেঙে গেছে—নাক মুখ নেই, হয়তো কোথাও কোথাও মাথাটাও নেই, তবু বুদ্ধ বলে মনে হয় কেন? তা হচ্ছে, লাইনের ভঙ্গী। একটি লতা বেয়ে বেয়ে উঠেছে লতানো একটি লাইন, তখনি তার ভঙ্গী রয়ে গেল। সেই ভাবেই appeal করে জলের ঢেউ, হাওয়ার গতি মেঘলা খেলা। সোজা লাইন তালগাছ সোজা উপরে উঠে গেছে তারও একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে। আসল realism হচ্ছে এইখানে; কারণ নেচারের "সে" শান্ত হতে হলে যা ভঙ্গী দরকার তা তারা বুদ্ধমূর্তির জন্য নিয়েছে।

ভারতবর্ষ এই যে একটা টাইপ সৃষ্টি করেছে তা এমনি এমনিই হয়ে ওঠেনি। তার ভিতরে আছে নেচারের intimate স্টাডি। নিখুঁত স্টাডি করে তবে তারা এক একটি ধারা তৈরি করেছে, যার জোরে ভাঙা মূর্তিতেও বুদ্ধকে পাই।

লাইনের গুণ নিয়ে রং-এর গুণ নিয়ে convention সৃষ্টি করেছে। চোখ পড়ে আপনিই সব। form-এর ভাষা আপনিই এসে আমাদের কাছে পৌঁছয়। বলতে পার তবে, ঐ সব দেশের লোক নানা যুগে নানা ভাবে ছবি আঁকলে কেন। কথা হলো, যে যেভাবে রস ঢেলে

দিতে চাচ্ছে সেই সব আর্টিস্ট, তারা দেশকাল পাত্রের বাইরের মানুষ। তারা উপাদান সংগ্রহ করে বাইরে দেয়। যেমন করে সংগ্রহ করে মধুকর মধু নানা ফুল থেকে বেছে বেছে। তারই মধ্যে যে জায়গায় যে ফুলের আধিক্য বেশি—মধু যখন খাই তারই গন্ধ পাই। কোনটা কলালেবুর মধু কোনটা নিম ফুলের মধু—এমন কত ফুলের সৌরভ তা টের পাই। মোগল ছবি মোগলরা আঁকত বলেই বলে না। তাতে মোগলদের সৌরভ পৌঁচেছে। এটা উপাদানের আধিক্য হয়।

colour-এর association আছে বৈকি। তাও একটা বড় জিনিস। বাসর ঘরে যখন কনে লাল শাড়িটি পরে ঢোকে—সেই লাল রংটি কি মনে নাড়া দেয় না? আবার সেই লাল শাড়ি-পরা কনেটিই শাদা শাড়ি পরে যখন বাপের ঘরে আসে বুকের ভিতর সে কী যে করে ওঠে। চোখের জল চেপে রাখা যায় কি? colour-এর association তেমনি নাড়া দেয়।

তবে এই association একেবারে পারশোনাল জিনিস। সেটা প্রধান জিনিস নয়। আমার ছেলেটা কালো হোক যা-ই হোক তার সঙ্গে যেই আত্মীয়তা, তার কান্নার সুরটা যেমন কানে লাগে, অন্য ছেলেতে কি তা হয়? মায়ার মতো জড়িয়ে রাখে, সে জাল ছিঁড়ে অন্য যে জিনিস আছে তা নিতে হবে। বুদ্ধের ভাঙা মূর্তিতে association ছাড়াও আর একটা জিনিস আছে। যাতে সবাইকে সে একই ভাবে নাড়া দেয়।

এই ধরো পাকুড় গাছটি, সেটি আমি লাগিয়েছি বলে আজ তোমার কাছে তার আদর। যখন তুমি আমি আর থাকব না, তখন এই association-এ তো কারো কাছে পাকুড় গাছ ধরা দেবে না। association ছাড়া যে একটা জিনিস আছে তাতেই সবাইয়ের কাছে একদিন ধরা দেবে, ডালপালা মেলে বড় হবে, ছায়া ফেলবে, লোক বসবে সেই ছায়াতে, পাখী বাসা বাঁধবে, গান করবে। গাছ চায় পাখি—পাখি চায় গাছ।

association নিয়ে ঢুকে তা ছাড়িয়ে উঠবে। নয়তো তুমি যা

পাচ্ছ অন্যে তা পাবে না। ধরো না, এই গাছ যখন হয় মাটিতেই হয়। মাটি ফুড়ে সে ওঠে, আকাশের গায়ে ডালপালা মেলে ধরে—চারিদিকে শোভা বিস্তার করে মাটিতে থাকে সে, কিন্তু মাটির কথা তার মনে থাকে না—অন্য জিনিসে চলে যায়।

এখন মানুষের পক্ষে রুচিকর কোনটা সেটাই দেখতে হবে। মানুষের রুচি অনুসারে রস মিলিয়ে পরিবেশন করতে হবে। এই ধরো, এই যে ছেলেমেয়েদের রবিকা এখানে ধরে এনেছেন, এই প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র আলোবাতাস গাছপালা থেকে তারা কিছু পাবে—তাদের রুচি বদলাবে। মানুষের মন সহজে টানে একটু realism-এর দিকে।

যেটা চোখে দেখছি সেটা মনেও দেখতে হবে। কিন্তু হায় মনে যা দেখছি চোখের দেখার সঙ্গে তাকে মেলাতে গিয়েও বারে বারে ঠেকছি। এই হলো আর্টের খেলাঘরের আসল খবর। রং-এ লেখায়, বাঁধা পড়েও পড়ছে না মনের মানস এই চরম রহস্য আর্টের,—ওর ভেদ কেই বা জানে, কেই বা জানাবে।

অরবিন্দ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের কবিতা

রবীন্দ্রনাথের 'দুঃখাভিসার' কবিতাটিতে আমাদের শ্রেষ্ঠতম গীতিকাব্য রচয়িতার অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্যে ও মাধুর্যের সহিত, অমিত প্রাবল্যে প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অজস্র অনুকরণকারী রহিয়াছেন ও তাঁহাদের মধ্যে অনেকে তাঁহার রচনারীতি ও কাব্যের এক বিশেষ এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্য বিশিষ্ট ভঙ্গীর সফল অনুকরণ করিয়াছেন—পৃথিবীব্যাপী অনুকরণকারীরা চিরকাল তাহাই করিয়া আসিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় কবিতার (দুঃখাভিসার) সুতীব্র মাধুর্য, প্রবল আবেগ, আত্মিক গভীরতা এবং মরমী মায়াময়তা, এই কবিতার প্রাণমাতানো, আচ্ছন্ন করা সুরঝঙ্কার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তারে যাহা বাঁধা, যাহার উৎস নিছক শিল্প-শৈলী নয়; আত্মাই যাহার উৎস, এই কবিতার মধুমাখানো প্রকাশ স্বাচ্ছন্দ্য, এই সমস্ত কিছুই রবীন্দ্রনাথের মৌল-মানসের পরিচায়ক এবং তাহাদের অনুকরণ অসম্ভব। কারণ এইগুলি আত্মার সম্পদ এবং এই পরম আকাঙ্ক্ষিত গুণাবলীর একটিকেও অর্জন করিতে হইলে সমপরিমাণ আত্মিক গভীরতা ও মধুরিমার অধিকারী হইতে হইবে। আমরা রবীন্দ্রনাথের এই অননু করণীয়তার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে চাই এইজন্য যে, তাঁহার যে সমস্ত অসংখ্য অনুকরণকারীদের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা আমাদের কবিতার বিকাশের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি ও তাঁহাদের যিনি আদর্শ (রবীন্দ্রনাথ) তাঁহারও সুনামের হানি করিতেছেন। তাঁহাদের আমি উল্লিখিত কবিতাটি পাঠ করিয়া তাঁহাদের বর্তমান চেষ্টার ব্যর্থতা অনুধাবন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। রবীন্দ্র প্রতিভার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, তিনি এক আশ্চর্য রসবোধ ও মৌলিকতার সহিত বৈষ্ণবকবিতাকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার

অন্তর্লোকে প্রবেশ করিয়াছেন ও তাহার স্বরূপ বজায় রাখিয়াও তাহাকে যুগোপযোগী করিয়া নবভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সেই প্রাচীন অনুভূতিপ্রবণ, আবেগময় ধর্মের চিরাচরিত কান্তভাবকে আরও সুকুমার ও সমৃদ্ধ স্তরে উন্নীত করিয়া আত্মিক অভিজ্ঞতার আরও অনেক সূক্ষ্ম ও গভীর আলোছায়ার লীলা অঙ্কিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন—যাহা বাংলার সেই তনিষ্ঠহৃদয় কিন্তু সারল্যধর্মী যুগে সম্ভব ছিল না। প্রাচীন বৈষ্ণব ভাব (ভাব শব্দটির কোন ইংরাজী প্রতিশব্দ করা সম্ভব নহে) সহজেই ধরা যায়—তাহা উদার এবং তীব্র। এই সমস্ত কবিতাকে কবি যে ভাষায় রূপ দিয়াছেন, তাহা ব্যতীত অন্যভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "সোনার তরী" কবিতার কবি গদ্যে যে ব্যর্থ অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহার কথা উল্লেখ করা যায়। বুদ্ধি যখন কবির কবিতার অর্থ বুদ্ধিগত প্রতীকের ছাঁচে ফেলিবার নিষ্ফল প্রয়াস পায়, কবিতা তখন আমাদেব হৃদয়কে মথিত করিয়া আমাদেব কল্পলোকে নিশ্চিত প্রত্যয়ে পরিণত হয়। এই সমস্ত কবিতাবলীতে কাব্যের সারাৎসার রহিয়াছে এবং গদ্যে ইহাদের প্রকাশ অসম্ভব। ইহার সমজাতীয় কবিতা বুদ্ধি কিংবা কল্পনার বহিরাবরণের দ্বারা সৃষ্টি করা সম্ভব নহে, ইহা অন্তরেব আর সুগভীর স্তর হইতে উৎসরিত হয় এবং মানুষের অন্তরের দিব্যসত্তা মানবমস্তিষ্ককে আপন অধিকারে আনিয়া ইচ্ছাহীন যন্ত্রের মত তাহাকে নিজের উক্তি প্রকাশে নিযুক্ত না করিলে মানুষের পক্ষে সেই রাজ্যের নাগাল পাওয়া অসম্ভব, এবং মস্তিষ্কের ঐরূপ ব্যবহারের মুহূর্তে তাহাকে দিয়া যাহা প্রকাশ করান হইতেছে তাহার অর্থের পরিপূর্ণ হৃদয়াঙ্গমে সে অক্ষম হয়। ইহা দিব্য উন্মাদনা, দিব্য উৎসাহ এবং প্লেটো তাঁহার সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিচার ক্ষমতার দ্বারা, আমরা যাহাকে প্রেরণা বলি, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই দুরধিগম্য শক্তি স্রোত রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতম গীতিকবিতাসমূহের মধ্য দিয়া প্লাবনধারার ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে।

এই নূতন কাব্য-প্রেরণা এবং বিপুলতর ও গভীরতর কাব্য-লিপির পরিপূর্ণ উদ্ভবের জন্য, প্রথমেই মানুষের অনুভূতি ও বুদ্ধি যে আত্মিক বিকাশের পথে কেবলমাত্র পদক্ষেপ করিয়াছে তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তির প্রয়োজন। বর্তমানে মানুষের মন দুইটি রাজ্যের সীমারেখা অতিক্রম-কার্যে ব্যাপৃত। মানুষের মনে এতাবৎকাল এক সক্রিয় এবং প্রবল-মাত্রায় জড়বাদী বুদ্ধিবৃত্তির রাজত্ব চলিয়াছে ও মানুষের মনে এখন প্রাথমিক বোধিকে অবলম্বন করিয়া অন্বেষণকার্য চালাইবার ঝোঁক দেখা দিয়াছে—বুদ্ধির সাহায্যে সত্যানুসন্ধান করিতে গিয়া বুদ্ধির উপর যে প্রবল চাপ পড়িয়াছে তাহার ফলেই বুদ্ধি কখন অজানিত-ভাবে এক অপ্রত্যাশিত সীমান্তদেশে উপনীত হইয়াছে। সেইজন্য নানা-দিক হইতে এখন অনিশ্চিত পন্থায় পথ অন্বেষণের চেষ্টাই চলিতেছে এবং কিছু কিছু চেষ্টা সাময়িক প্রয়াস হিসাবে মূল্য পাইবার যোগ্য ; কিন্তু তাহারা যদি চরম প্রয়াস ও একান্ত পরিণতির মর্যাদা পায় তবে চমকদার অবনতি ও অবক্ষয়েই তাহাদের সমাপ্তি ঘটিবে। মানুষের প্রাণশক্তি হইতে উদ্ভূত এক ধরনের প্রাণময়-বোধির প্রকাশ রহিয়াছে এবং তাহা কখনও বিষয়ীগত কখনও বিষয়গত হইয়া দেখা দেয়। তাহা মনের প্রত্যন্তদেশে দৃষ্টিমোহী আলোর রাজত্বে বিরাজ করে, কিন্তু নিজের স্থূল ও অত্যুজ্জ্বল রং-এর আবরণ ভেদ করিয়া সূক্ষ্মতর ও অধিকতর সত্যময় আত্মিক দৃষ্টির স্তরে উন্নীত হইতে পারে না। প্রাণশক্তি হইতে অর্ধমুক্ত ও অর্ধ-জড়িত এক আবেগধর্মী, উত্তেজনা-তাড়িত, দেহনির্ভর বোধ রহিয়াছে এবং তাহার নিজস্ব এক মনোহর সৌন্দর্য ও চাকচিক্য আছে, যাহা বিকারের রঙ্গে কলুষিত কিংবা অস্পষ্ট কুহেলিকাময় হইয়া এবং প্রায়ই অর্ধ জৈব ও অর্ধ-দেহগত বাসনার উগ্র প্রকাশ হিসাবে দেখা দেয়। ইহা ছাড়া আর এক বিশুদ্ধতম ও সুকুমার ভাবময় বোধি রহিয়াছে, যাহা আত্মিক ব্যাপারে নিমগ্ন হইতে চায়। আইরিশ কবিরা ইংরাজী সাহিত্যে এই জাতীয় বোধিকে রূপ দিয়াছেন। হুইটম্যান ও তাঁহার উত্তর-সাধকদের কবিতায় প্রাণশক্তিই প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু এই প্রাণশক্তি

জীবাত্মা ও বিরাটতর মানবাত্মার কঠিন বুদ্ধিধর্মী বোধের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কবিতার জগতে এতাবৎকাল সূক্ষ্মতম ও অতি সুকুমার যাহা কিছুই হইয়াছে, তাহাদের উচ্চতম পরিণত স্তরের ঊর্ধ্বে, এক অমর্ত্য মর্ত্যলোকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলা যাইতে পারে উড্ডীন রহিয়াছে। তাহা অবশ্য পরিপূর্ণ আত্মিক জ্যোতিতে ভাস্বর নহে, কিন্তু, আত্মিক অন্বেষণা ও আলোর দীপ্তি তাহার রহিয়াছে, যে আলোক ও ছন্দময় গীতি মানসলোকে, আত্ম-লোকে সূক্ষ্মতম আত্মিক অভিজ্ঞতা হইতে জাত হইয়া বিরাজ করে, তাহা তাঁহার কবিতায় রহিয়াছে এবং তাহার আলোকময় স্পর্শে মর্ত্য ভূমির গীত স্বর্গীয় সঙ্গীতে পরিণত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যে বিপুল সাফল্য লাভ করিয়াছে এবং বিরাট স্পন্দন জাগাইয়াছে তাহাকে যুগ-মানসের তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষণ হিসাবে ধরা যাইতে পারে। এই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে এই সমস্ত কিছুকে অবশ্যই আমরা যে অখণ্ড পরিপূর্ণতার প্রত্যাশী তাহার পরিণতি ও রূপায়ন হিসাবে গণ্য করা চলে না। যেদিন আত্মার সত্য-আলোক প্রজ্বলিত হইবে, মনের সকল সূক্ষ্ম ভাবের পূর্ণ আনন্দময়তা জাগিয়া উঠিবে এবং জীবাত্মার বিপুল শক্তি ও প্রাচুর্য মর্ত্যকে স্ববশে আনিয়া স্বর্গলোকে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করিবে, সেইদিনই আত্মার, মনের, প্রাণের সেই মিলন কোণ অপরূপ কাব্যের অদ্বৈত অভিজ্ঞতার অকুণ্ঠ বাঁশরীধ্বনিতে সার্থকভাবে প্রকাশ পাইবে।

কবিতার এই নূতন ও মুক্তছন্দের উপযুক্ত প্রতিনিধিদের একজন ইংরাজ ও আরেকজন আমেরিকান—কারপেণ্টার হুইটম্যান। রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার অনুবাদ ইহার ভাণ্ডারকে হঠাৎ পাওয়া মূল্যবান রত্নের দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করা হইতেছে তাহার সহিত সেইগুলির বিশেষ সঙ্গতি নাই। কারণ তাহার অনুবাদসমূহ ছন্দময় কাব্যধর্মী গদ্য রচনা

ভিন্ন আর কিছু নহে এবং এই জাতীয় সুপরিচিত ধ্বনিময় কাব্যিক গদ্য কখনও কবিতার প্রচলিত মাত্রার নিয়মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না। ইহা কবিদের একজাতীয় বিলাস, সামান্য কিছু নূতনত্বের অবতারণা এবং ইহার বিশিষ্ট আসন রহিয়াছে ও ইহা এমন কোন উদ্দেশ্য পূরণ করে, যাহা অন্য কিছুর সাহায্যে পূরণ করা সম্ভব হইত না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনুবাদ কার্যের জন্য এই মাধ্যমই উপযুক্ত মনে করিয়াছেন, মূল রচনার যথার্থ ভাব ও অধ্যাত্ম-তত্ত্ব কাব্যিক গদ্যে বজায় থাকে। কারণ অন্য ভাষায় কবিতার ছন্দবিন্যাস ও মাত্রারীতি অনুযায়ী অনুবাদ করিলে মূলের বহিরঙ্গের পরিবর্তন তো হয়ই এবং তাহার ফলে তাহার বিরাট অন্তরঙ্গ পরিবর্তনও ঘটে। কবিতার ছন্দ এমনই শক্তিশালী, স্বতন্ত্র এবং সৃজনশীল পদার্থ যে তাহা না ঘটিয়া পারে না। কিন্তু কাব্যধর্মী গদ্যের ধ্বনি অনেক নমনীয় ও সহনশীল এবং তাহা মূল কবিতার অন্তরঙ্গ ভাবের আমূল পরিবর্তন হইতে দেয় না; বরং মূলের ভাব লইয়া রচনা করিলে তাহাতে মূলের দূরাগত আভাস পাওয়া যায়, মূলের প্রতিধ্বনি যেন তাহাতে মন্দ্রিত হয়, মূলের প্রতিভাস তাহাতে ফুটিয়া উঠে। অবশ্যই তাহা মূলের তুল্যগুণ অর্জন করিতে পারে না, কিন্তু মূলের ব্যঞ্জনার কিছু প্রতিধ্বনি তাহাতে বাজিয়া উঠে, সন্দেহ নাই। উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের কিছু ইংরাজী অনুবাদ তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে,—

"Thou settest a farrier in Thine own being and Thou callest the severed Self in myriad notes. This Thy self-separation has taken body in me. The great pageant of Thee and me has overspread the sky. With the tune of Thee and me all the air is vibrant and all ages pass with the hiding and saking of Thee and me."

উপরোক্ত উদ্ধৃতি সুন্দর সুষমান্বিত কাব্যিক গদ্য ব্যতীত আর কিছু নহে। মুক্তছন্দে কবিতা রচনাকারী কতিপয় ফরাসী কবি এবং

হুইটম্যান ও কারপেণ্টারের যাহা নাই, রবীন্দ্রনাথের তাহা আছে। তিনি সৌকুমার্য ও সূক্ষ্মতার শিল্পী এবং তাঁহার কবিতা ক্রটিহীন লাবণ্য যোজনা ও আত্মিক ভণিমায় সমৃদ্ধ। কিন্তু কোথায়ও তিনি তাঁহার যাহা করণীয় তদতিরিক্ত কিছু করিবার প্রয়াস পান নাই, কবিতার প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই, যদিও তাঁহার মাতৃভাষায় নব্যকাব্যরীতির অনিন্দ্যসুন্দর প্রবর্তনা তাঁহার লেখনী হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে। তাঁহার তেমন কিছু উদ্দেশ্য থাকিলে তাহা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াই আমাদের সাব্যস্ত করিতে হইবে। উপরোক্ত ইংরাজী অনুবাদ সুন্দর সন্দেহ নাই, কিন্তু মূল কবিতার সহিত তুলনা করিলে বোঝা যায় যে মূলের অনেকখানিই ইহাতে ধরা পড়ে নাই ; হয়তো এমন কিছু হইয়াছে যাহাতে ইংরাজ পাঠকেরা তৃপ্ত হন, কিন্তু যিনি কবির মাতৃভাষায় লিখিত মূল কবিতার মন্ত্র-মুগ্ধকর সুর একবার শুনিয়াছেন, তাঁহার শ্রবণ-মন কিছুতেই ইহাতে তৃপ্ত হইবে না। অনুবাদে কবিতার বুদ্ধিগ্রাহ্য বক্তব্য এবং চিন্তা মূলের তুলনায় অনেক সময় সুস্পষ্টরেখায়, পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠে, কারণ মূলে বক্তব্য ও চিন্তাকে কবিতার সুরের সমগামী ব্যঞ্জনার প্রাবল্য উর্মিলার মত আড়াল করিয়া ফেলে ; কথা অপেক্ষা সুর এত রণিয়া উঠে যে মন শুনিতে শুনিতে যেন অনন্তলোকে চলিয়া যায় এবং কবিতার বুদ্ধির-দানকে তখন সামান্য মনে করিয়া অগ্রাহ্যই করে। নূতন যুগে কবিতার সাহায্যে যে বিরাট কার্য সমাধা করিতে হইবে, তাহা কবিতার ছন্দের এই বিপুল শক্তি রহিয়াছে বলিয়াই তো করা সম্ভব হইবে এবং কবিতার আঙ্গিকের সামগ্রিক পরিবর্তন সাধন না করিয়াও কেবলমাত্র কবিতাকে নূতনভাবে ব্যবহার করিয়া তাহা করা সম্ভব হইবে। রবীন্দ্রনাথের মাতৃভাষায় তাঁহার গীতি কবিতাগুলি যেন ভাবীকালের সেই সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

আত্মিক সত্তা আমাদের মধ্যে শুধুমাত্র বিরাটতর সত্য-দৃষ্টির উন্মোচন করে না, উদারতম জীবনের প্রবাহও বহাইয়া দেয়, কারণ এই আত্মিক

তো কেবলমাত্র মানব চৈতন্যে ও জ্ঞানে প্রতিভাত আত্মাই নহে, সমস্ত প্রাণকে বিধৃত করিয়াই ইহা বিরাজমান। চিন্তার বায়বীয় স্তরে পরিভ্রমণান্তে নির্বাণলোকে যাত্রা-সমাপ্তি ঘটাইয়া আমরা আমাদের আত্মার সন্ধান পাইব না, আমাদের সমগ্র জীবনের মূলে থাকিয়া যে সত্তা সমস্ত কিছুকে অখণ্ড সূত্রে বাঁধিয়াছে তাহার সন্ধান পাইলেই আত্মার সন্ধান পাওয়া যাইবে। মানুষের এই প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়াই যে সমস্ত কবির মধ্যে জগতের সত্য এবং জীবনের দাবীর যুগলধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের গুরুত্ব অসাধারণ। ইদানীন্তন কালের সকল সার্থক কবিতাই এইভাবে অনুপ্রাণিত, ইহা ভিন্ন আর যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে তাহার মূল্য নিতান্তই সাময়িক, কেবল-মাত্র ঐ জাতীয় সার্থক কবিতাবলী ভাবীকালের সম্পদ। হুইটম্যানের ইহাই প্রধান সুর, যদিও মনে হয় অনেক অন্বেষণ ও ঈক্ষণের পরও তিনি পূর্ণকে পান নাই। তাঁহার কবিতায় যে নূতন পথ আবিষ্কারে তিনি উদগ্রীব, তাহার বিপুলতা রহিয়াছে; কিন্তু তাহাতে নূতন পথের আভাস পাওয়া গেলেও নূতন জীবনের পূর্ণতার চিত্র নাই। এ, ই-র কবিতার আধ্যাত্মিক তত্ত্বে ইহারই সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, মরলোক ও প্রাণলোককে ব্যপ্ত করিয়া যে সুন্দরের বন্দনা, যে স্বপ্ন-প্রয়াণ, ইয়েটসের সূক্ষ্ম কাব্যছন্দে প্রকাশমান তাহারও এই সুর; এবং কারপেন্টারের কবিতায় তাহার প্রতিধ্বনি সর্বাপেক্ষা প্রবল। এই যুগের সকল সৃজনপ্রতিভাধারী কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেই বর্তমান যুগের এই অন্বেষণ, এই সমন্বয় প্রচেষ্টাকে আমরা বেশী করিয়া অনুভব করি বলিয়াই তাঁহার কবিতা সহসা জগৎব্যাপী এত সার্থকতা লাভ করিয়াছে। তাঁহার কবিতা দুইটি রাজ্যের মিলনসঙ্গীতে মুখরিত, তাঁহার কবিতায় আত্মিক সত্যের আলোক ও সঙ্গীত জীবনের সূক্ষ্মতম দিকের অর্থকেও পরিস্ফুট করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিরুদ্ধে এই আপত্তি উঠিয়াছে যে, তাঁহার কবিতা বড়ই সূক্ষ্ম এবং তাহা অস্তিত্বের যাহা কিছু প্রত্যক্ষ ও বর্তমান এবং জীবনশক্তিতে উদ্বেলিত, সেইগুলি হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

ইয়েটস্‌কে অনেক কেল্টিক রোমান্টিকতার কবি ভিন্ন অন্য কিছু মনে করেন না। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশে কবিতায় ধোঁয়াটে দার্শনিকতত্ত্ব প্রচারকারী, বাস্তববিমুখ, এবং জীবনের প্রত্যক্ষ ও প্রবলদিগের সহিত অপরিচিত বলিয়া নিন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কাব্য-উদ্দেশ্যকে ভুল বুঝার ফলে এই জাতীয় মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে, এবং মানব-চৈতন্যের ক্রমোন্নতির ফলে মানুষের মন বহির্জগৎ ও আত্মজ্ঞানে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়া যে জীবনবোধে উদ্বোধিত হইতেছে তাহাকেও সঠিক বুঝিতে না পারা ঐ জাতীয় সমালোচনার মূলে রহিয়াছে। অবশ্য এই সমস্ত কবিরা, কবিদের যাহা কিছু করণীয় তাহা পূর্ণমাত্রায় করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কাব্যকে পরিপূর্ণ এবং সামগ্রিকভাবে রূপায়ণ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। জীবনকে এক নূতন ও গভীরতর দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করার চেষ্টা তাঁহাদের কাব্যে রহিয়াছে ; কাব্যের ধ্যানলব্ধ আলোক ও ছন্দের সাহায্যে মানুষের মন ও আত্মার সহিত অনন্ত ও অনাদির যাহাতে সেতুবন্ধ হয়, সেই কার্যেই তাঁহারা ব্যাপৃত। অনাগতকালের কবিতা, তাঁহারা যেখানে পৌঁছিয়াছেন, সেখানে সীমাবদ্ধ থাকিবে না ; যাত্রারম্ভের সেই দ্বারপ্রান্ত হইতে নির্গত হইয়া তাহা আরও পথ অতিক্রম করিবে ; যে গভীরতার এখনও পরিমাপ হয় নাই সেই গভীরতায় অবগাহন করিবার চেষ্টা করিবে, যাহা অর্ধ-সমাপ্ত, তাহাকে সমাপ্ত করিবে, যাহা অলব্ধ রহিয়াছে তাহাকে লাভ করিবে। মানবাত্মার সমস্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া ইহা মানবাত্মা ও বিশ্বাত্মার যোগে জীবনের উদারতম পটভূমিকা অঙ্কিত করিরার চেষ্টা করিবে। এই সাধনায় পূর্ণ-সিদ্ধিলাভ দৈবাৎ সম্ভব নহে, কিন্তু কাব্য-দৃষ্টির এই পরিপূর্ণতার প্রয়াস, এই অসীমের রাজত্ব প্রবেশ-প্রচেষ্টার ভিত্তি যাঁহার কাব্যে রচিত হইয়াছে, তিনি তাঁহার সমকালীন একটি সমগ্র যুগকেই মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর বিলাতের সুবিখ্যাত "টাইমস্" পত্রিকায় তাঁহার চরিত্র আলোচনা করিয়া লেখা হয় যে, তিনি অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন, নিজেও অভিজাত প্রকৃতির (aristocratic লোক) ছিলেন এবং সমস্ত জীবন জনসাধারণ হইতে দূরে নিঃসঙ্গ একাকী দাঁড়াইয়া থাকিতেন।

এ-কথার অর্থ এরূপ নহে যে, রবীন্দ্রনাথ নিজেকে নবাবজাদা মনে করিয়া সমস্ত দেশবাসীদের ঘৃণা করিতেন, তাহাদের অস্পৃশ্য বলিয়া তাহাদের সুখ-দুঃখ, ঘরকন্নার কথা নিজের মনে কখনও আনিতেন না। সকলেই জানেন যে তাঁহার জীবনে এবং সৃষ্ট সাহিত্যে ধনের গর্ব, বিলাসিতা বা কৌলিন্য-অভিমান কিছুই ছিল না ; বরং তাঁহার জীবন যাত্রা, চালচলন, লোকের সঙ্গে মেশামেশি ঠিক আমাদের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের মত সাধাসিধা ; কেবলমাত্র তাঁহার ঘরবাড়ি কলাবিদ্যার শ্রেষ্ঠ চর্চার (নকল brumagem নহে) দ্বারা এক নতুন সুন্দর আলোকে উদ্ভাসিত ছিল, যাহা তোমার আমার মত ব্যস্ত চাকরের ঘরে হয় না। তাঁহার এইমাত্র বৈশিষ্ট্য। ভুলি নাই যে, তিনি একবার আত্রেয়ীগ্রামের "পাটের হাটে মথুর কুণ্ডু, শিবু শা'র সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া পাটের দোকান খোলেন, যদিও অবশেষে বহু অর্থক্ষতি দিয়া পলাইয়া বাঁচেন। এটা ঠিক অস্ত্রজীবী রাজ্যশাসনকারী সামন্ত (aristrocrat) জাতের কাজ নহে। আরও তাঁহার রচনার মধ্যে এমন একটি ছত্রও নাই, যাহাতে দেখা যায় যে, তিনি কোনও লোককে অস্পৃশ্য অবজ্ঞার পদার্থ বলিয়া মনে করিতেন। বরং তিনি সমাজের দলিত, রাজ্যশক্তির লাঞ্ছিত, মূক অসহায় জনসাধারণকে নিজের লোক বলিয়া হৃদয়ে টানিয়া লইয়াছেন, জাতিভেদকে, অর্থ-দম্ভকে ধিক্কার দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কখনও টাকার গরম ছিল না, কারণ জমিদার-পুত্র হিসাবে

তাঁহার ভাগে অতি কম টাকাই পড়ে, এবং কবি হিসাবে তিনি রাজার গলা হইতে হীরার হার লাভ করেন নাই, মূল্যহীন পুষ্প মাল্যটাই গৃহে আনেন।

তবে কি "টাইম্‌স"এর উক্তিটি মিথ্যা? তাহা নহে। জগতের সকল দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীগণ একা, তাঁহাদের একটিও বন্ধু নাই যাহার সঙ্গে সমানভাবে চিন্তা ও ভাব আদান-প্রদান করিতে পারেন। তাঁহাদের ভালো করিয়া বুঝিতে পারে, এমন লোকও তাঁহাদের জীবিতকালে পাওয়া যায় না; তাঁহাদের মৃত্যুর অনেক পরে তাঁহাদের কাব্যের যথার্থ ব্যাখ্যা হয়, তাঁহাদের বাণী ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করে। এইরূপ একটি নিঃসঙ্গ মনীষী ছিলেন দান্তে, এবং তাহার অনেক পরে আসেন মিল্টন—তাঁহাদের ললাট চিন্তায় ভরা। দুঃখে অন্ধকার মুখ নীরব, ওষ্ঠ দুইটি চাপা। আর, শেক্সপীয়রও বাদ যান না; সত্য বটে তিনি পরিবার সন্তান লইয়া বাস করিতেন, থিয়েটারে তাঁহার অনেক বন্ধু ও শত্রু ছিল, বেশ টাকা জমাইয়া নিজ সহরে "কোঠাবাড়ি" খরিদ করেন। কিন্তু এসব বাহ্য, তাঁহার মুখে সদা হাসি সত্ত্বেও তাঁহার অন্তর ছিল নিঃসঙ্গ, একেলা। একজন আধুনিক ইংরেজ কবি এই সত্যটা ধরিয়া ফেলিয়াছেন এবং সেক্সপীয়রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "তুমি চিরদিন অচেনা রহিবে......"

Others abide our question. Thou art free,
Thou didst walk on Earth unguess'd at.

রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর মনীষী।

আর এক শ্রেণীর কবি আছেন, তাঁহাদের দানও জগতে মূল্যবান। কিন্তু তাঁহারা এই কয়টি চিরধবল নিষ্পন্দ মাউণ্ট এভারেষ্ট বা কাঞ্চন-জঙ্ঘার মত মানস-জগতের সর্বোচ্চ চূড়া নহেন। তাঁহারা অধিকতর আপাত-ফলপ্রদ, অতি শীঘ্র জনসাধারণের মন অধিকার করিতে পারেন। কারণ তাঁহারা ঠিক তোমার আমার মত লোকদের মনের ভাব ও আকাঙ্ক্ষা সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করেন, লক্ষ লক্ষ লোকের সঙ্গে

মিশিয়া একদলে অগ্রসর হন—জয়ধ্বনি করিয়া, শোকগীতি গাহিয়া, অথবা মানব-প্রগতির শত্রুদের বিরুদ্ধে সমর-অভিযান লইয়া। এই দ্বিতীয় শ্রেণীটির ভালো দৃষ্টান্ত রুসো, ভিক্টর হুগো, লর্ড বায়রণ।

"দলের অনুভূতি"তে ইঁহাদের কাব্য অনুপ্রাণিত, ইঁহারা সব মানুষকে একত্র করেন (comrades), আমাদের সকলেরই যে সমান স্বার্থ, সমান বিপদ, একই পন্থা—এই বিশ্বাস লক্ষ লক্ষ সাধারণের মনে জাগাইয়া দেন, এই কবিরা যে আমাদের "জনগণ কর্ম অধিনায়ক" সংগ্রামে যে একাধারে তূর্যবাদক ও ধ্বজাধারী, তাহা আমরা মর্মে মর্মে বুঝিতে পারি। একবার "বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ" এই গানটি স্থির হইয়া শুনুন; আর একদিন "ওই ভুবন মনোমোহিনী" গান করান। তাহার পর একাকী চুপ করিয়া ধীরভাবে প্রত্যেক গানটি শোনার পর আপনার মনোভাবের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া দেখুন। তখন বুঝিবেন যে, এই দুইটি গানে আপনার হৃদয়ে দুইটি অতি বিভিন্নভাব জাগাইয়া দিয়াছে, সে পার্থক্য শ্রেণীগত, সেটা কম-বেশীর বা ভালো-মন্দের কথা নহে।

রবীন্দ্রনাথ কখনও জনতার মধ্যে ঝাঁপাইয়া নেতৃত্ব-লোভে হুঙ্কার—অর্থাৎ বীণার সপ্তমে চড়াসুর বাদন করেন নাই; এরূপ ধ্বস্তাধ্বস্তি কাজের পক্ষে তাঁহার আন্তরিক অসামর্থ্য ছিল। যে দাঁড়িপাল্লায় মণে মণে কয়লা ওজন হয়, তাহার কাজ বৈজ্ঞানিক গবেষণা গৃহের কেমিক্যাল ব্যালান্সে করিতে পারে না। তিনি একবার স্বদেশপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া কিছুদিন সংবাদপত্র চালাইবার ইচ্ছা করেন, তাহার ফল ও স্থায়িত্ব ঠিক সেই আত্রেয়ীগ্রামে পাটের ব্যবসার মতই হয়। ফলত যদি এই দেশে এবং এই যুগে সফল খবরের কাগজ চালাইতে চাও, তবে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ অথবা পাঁচকড়িবাবুর মত সম্পাদক লাগাইয়া দাও। কারণ তাঁহাদের "আকাশ ঘিরে জাল ফেলে তারা ধরাই ব্যবসা" নহে এবং অভিজ্ঞতাও অন্যরূপ।

এতক্ষণে বোধহয় বুঝাইতে পারিয়াছি যে, বঙ্গ-সাহিত্য এবং

বাঙ্গালীর আধুনিক চিন্তা জগতে রবীন্দ্রনাথের অদ্বিতীয় দানটি কি। যে মনোভাব হইতে এই দান সৃষ্টি হয়, তাহা তাঁহার একটি ছোট গল্পে অল্প কথায় অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে ঃ

মৎস্যপুচ্ছের তাড়নায় জলের মধ্যে যে গূঢ় আন্দোলন চলিতে থাকে, সরোবরের পদ্ম যেমন তাহার প্রত্যেক আঘাত অনুভব করিতে পারে, শেখর তেমনি তাঁহার চতুর্দিকবর্তী সভাস্থজনের মনের ভাব হৃদের মধ্যে বুঝিতে পারেন।......

শেখর প্রান্তভাগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কেবল এই ক'টি কথা বলিলেন—বীণাপাণি শ্বেতভুজা, তুমি যদি তোমার কমল বন শূন্য করিয়া আজ মল্লভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইলে, তবে তোমার চরণাসক্ত যে ভক্তগণ অমৃতপিপাসী, তাহাদের কী গতি হইবে?—"জয় পরাজয়।"

আমি এই পার্থক্য কি উপমা দিয়া বুঝাইব? যেন একদিকে কর্ণভেদী ঢক্কানিনাদ অথবা পাঁচকড়িবাবুর দৈনিক হ্রেষারব, আর অপর দিকে রবীন্দ্রনাথের সংযত মিহি সুর। অথবা একদিকে হাতকাটা সার্ট, খাঁকি সার্ট এবং ফুটবল বুট পরা যুবক, আর অপরদিকে শান্তিপুরে মিহি ধুতি, ধোলাই মলমলের চুড়িদার পাঞ্জাবি এবং কারুকার্য মণ্ডিত গ্রীসিয়ান স্লিপার পরা তরুণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ই বলি, আহিরগ্রাম পত্রিকা আর জাহিরগ্রাম পত্রিকা।

রবীন্দ্রনাথ যে গুণটি বঙ্গ-সাহিত্যে আনিয়া দেন, এবং যাহার অনুশীলনে কেহই এ পর্যন্ত তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই, তাহার ইংরেজি নাম—refined delicacy, এবং তাহার বিপরীতটির নাম—vulgarity of taste. "কোমলতা" বা "মার্জিত রুচি" বলিলে এটিকে ঠিক বুঝাইবে না, কারণ "কোমল" কথাটা প্রায়ই আমাদের মনে আনে—মেরুদণ্ডহীন দুর্বলতা বা অস্থিহীন মাংসপিণ্ডের ছবি, যেমন বৈষ্ণব সাহিত্যে "প্রেমরসগলিতং" বলিলে বুঝায়। আবার "মার্জিত রুচি" বলিলে সাধারণতঃ অশ্লীলতার বিপরীত মাত্র বুঝায়। আমি চাই এমন একটি কথা, যাহাতে কবিশেখর এবং দিগ্বিজয়ী

পণ্ডিত পুণ্ডরীকের মধ্যকার মানসিক পার্থক্য বুঝাইতে পারে। বঙ্গ-সাহিত্যের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের কবিশেখর।

তেমনই "ইতুরে" বলিলে vulgar শব্দটির ঠিক অনুবাদ হয় না, কারণ অভিজাত-কুলের ছেলে এবং হঠাৎ লক্ষপতিও রুচি হিসাবে ভাল্গার হইতে পারে এবং আমেরিকায় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

৺লালমোহন ঘোষ এবং এন. এন. ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য আমার জীবনে ঘটে। এরূপ আর কেহ কী বাঁচিয়া আছেন? যদি থাকেন, তবে তাঁহারা এই দুইটি মহাত্মার বক্তৃতার ধরণ ও ভাষা এবং আজকার রাজনৈতিক মঞ্চে কোন বিখ্যাত নেতার হুঙ্কার ও আস্ফালন তুলনা করুন।

অথবা, পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর আগেকার বাংলার পেশাদার থিয়েটারে যে "পেটেণ্ট করা গলার স্বর" (রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব উক্তি) চলিত, তাহার সহিত ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে উচ্চ শিক্ষিত শখের অভিনেতাদের গলা ও ভঙ্গি—অথবা "বিচিত্রা"য় "ডাকঘর" প্রভৃতির অভিনয় প্রণালী—তুলনা করুন। একবার আমি প্যারীচরণ সরকার স্ট্রীটে একজন সাধারণ লোককে দেখি, তাহার গায়ে গেঞ্জির উপর একটি ওয়েষ্টকোট মাত্র, কিন্তু সেই ওয়েষ্টকোটের সামনের ভাগ উজ্জ্বল লাল সাটিনের এবং পিছনের অর্ধেক উজ্জ্বল সবুজ রং-এর। (সে ফুটবল প্লেয়ার ছিল না।) অনেক উচ্চশ্রেণীর লোকেরও টাইয়ের (স্ত্রী-পক্ষে রিবনের) রং এবং কারুকার্য সেইমত প্রকৃত আভিজাত্য ও ইতুরে ভঙ্গির পার্থক্য দেখাইয়া দেয়।

ক্ষীরোদবাবুর একখানা নাটক আর রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' বা 'নটীর পূজা, পাশাপাশি রাখুন। দুই নাট্যকারই প্রশংসনীয়, আমি ক্ষীরোদবাবুকে নগণ্য বলিতেছি না, অথবা দুইজনের প্রতিভা তুলনায় ওজন করিতেছি না। কিন্তু তাঁদের প্রণালী ও সুর দেখায় যে, তাঁহারা দুই ভিন্ন-জাতীয় লোক। ক্ষীরোদবাবুকে "ইতুরে" বলিলে

মিথ্যা বলা হইবে। তবে তিনি ধারাবাহিক "সাধারণ প্রণালী"র অনুসরণকারী ছিলেন।

চারিদিক দেখিয়া বহুজনের সহিত মিশিয়া (অথচ এক হইতে না পারিয়া), মর্ম পীড়িত রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে সেই মার্জিত রুচি, সেই আত্মসংযত মিহি সুর চালাইবার চেষ্টা করেন। আকাশের রবি সহস্র কিরণ; আমাদের রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও শতধারা জাহ্নবীর মতই শতমুখী। অনেক ক্ষেত্রে অনেক শিষ্য তাঁহার কোন বিশেষ প্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন এবং কম বেশি সফলও হইয়াছেন। যেমন ৺রায় বাহাদুর রমণীমোহন ঘোষ আমার সহিত এক ছাত্রাবাসে থাকিতেন এবং দুই তিন বৎসর নীচের ক্লাশে পড়িতেন। তিনি স্বয়ং কবি এবং খুব রবি-ভক্ত ছিলেন; আর আমি ছিলাম কবি-মাংসাশী জানোয়ার অর্থাৎ সমালোচক। রমণীমোহন স্বরচিত পদ্য আমাকে শুনাইলে আমি চেঁচাইয়া উঠিতাম, stop thief! stop thief! এবং রবীন্দ্রনাথের যে সব কথা বা ভঙ্গি অনুকরণ করা হইয়াছে তাহা দেখাইয়া দিতাম। তিনি উত্তর দিতেন, "এটা চুরি নহে, এটা unconscious cerebration of admire" এমন আরও অনেকে আছেন।

কিন্তু আজ আমাদের বিশ্বকবির যে গুণটি বলিলাম, তাহার প্রসার বঙ্গ-সাহিত্যে, বাঙ্গালীর চিন্তার প্রণালীতে ও ভাব প্রকাশে কোনই বিস্তৃতি লাভ করে নাই। ইহাই বাঙ্গালীর সর্বাপেক্ষা বেশি দুর্ভাগ্য।

গুণী ব্যক্তির সহস্তরচনা সঞ্চয় করতে আমরা সম্প্রতি শিখেছি। পাশ্চাত্যদেশে প্রাচীন চিত্রকরের চিত্র, লেখকের হস্তলিপি, শিল্পীর হস্তকর্ম প্রভৃতি বহুকাল থেকে সমাদর পেয়ে আসছে। প্যারিসের লুভর প্রাসাদে বিস্তর প্রাচীন চিত্রাদি জাতীয় ঐশ্বর্যরূপে সঞ্চিত রয়েছে। যন্ত্রও বাদ যায় নি, ষ্টিভেনসনের উদ্‌ভাবিত রেলগাড়ির আদিম এঞ্জিন 'রকেট' নির্মাতার মৌলিক কৌশলের নিদর্শনরূপে বিলাতের এক মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। অসংখ্য লোকে এই সকল বস্তু পরম শ্রদ্ধায় দেখে এবং রচয়িতাকে বা সৃষ্টিকারীকে স্মরণ করে।

ষ্টিভেনসনের পর লক্ষ লক্ষ এঞ্জিন তৈরী হয়েছে এবং বারে বারে এত পরিবর্তন হয়েছে যে এখনকার মহাকায় খর্বচোঙ গম্ভীরনাদী এঞ্জিন দেখলে মনে হয় না যে এদের মূল আদর্শ সেই ক্ষুদ্রকায় দীর্ঘচোখ শ্বাসগ্রস্ত রকেট। এই পরিবর্তনে এঞ্জিনের উপযোগিতা ক্রমশঃ বেড়েছে, এবং এমন আপত্তি শোনা যায় নি যে এতে ষ্টিভেনসনের কিছুমাত্র অমর্যাদা ঘটেছে। পক্ষান্তরে কীর্তিমান চিত্রকরদের মূল চিত্রের অসংখ্য প্রতিলিপি এবং লেখকদের রচনার অসংখ্য সংস্করণ প্রচারিত হয়েছে, মুদ্রণেরও ক্রমোন্নতি হয়েছে, কিন্তু রচনার পরিবর্তন ঘটেনি। বিজ্ঞানী ও যন্ত্রী অবাধে অপরের উদ্ভাবিত বস্তুর উন্নতি-চেষ্টা করতে পারেন, সফল হলে প্রশংসাও পান, কিন্তু কোনও পণ্ডিত বা চিত্রবিশারদ যদি পূর্বগুণীদের রচনার সংস্কার করতে চান তো সে চেষ্টা মহাপাতকতুল্য হেয় গণ্য হবে।

যন্ত্র, শিল্পজবস্তু, সাহিত্য, চিত্র—সমস্তই আমাদের প্রয়োজন সাধন করে, কিন্তু সমান মর্যাদা পায় না। যে সব বস্তু জীবনযাত্রার প্রধান সহায় তাদের উদ্ভাবক বা নির্মাতা মহা প্রতিভাশালী হলেও নিতান্ত পরোক্ষ। তাঁরা একেবারেই আড়ালে থাকেন, ভোগের সময় আমরা তাঁদের কথা ভাবি না। অথচ যে বস্তু স্থূল সাংসারিক

ব্যাপারে অনাবশ্যক, কিন্তু আনন্দ দেয় বা রসোৎপাদন করে, তার রচয়িতা রচনার সঙ্গে একীভূত হয়ে থাকেন, ভোগের সঙ্গে সঙ্গে আমরা রচয়িতাকেও স্মরণ করি। রচনা থেকে রচয়িতার তিলমাত্র বিচ্ছেদ আমরা সইতে পারি না, তাই এমন স্পর্ধা কারও নেই যে দাভিঞ্চি-শেক্সপীয়ার-রবীন্দ্রনাথের উপর কলম চালাবেন—যদিও সমালোচনা যত খুশি করতে পারেন।

রসসৃষ্টি ও রসস্রষ্টার এই যে অঙ্গাঙ্গি ভাব, এর ইতর বিশেষ আছে। রচয়িতার পরিচয় আমরা যত বেশী জানি ততই রচনার সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্বন্ধ উপলব্ধি করি। যাঁরা বেদ বাইবেল রচনা করেছেন তাঁরা অতিদূরস্থ নক্ষত্রতুল্য অস্পষ্ট। তাঁদের পরিচয় শুধুই বিভিন্ন ঋষি আর প্রফেটের নামে। বেদ বাইবেল অপৌরুষেয়, অর্থাৎ রচয়িতার অজ্ঞাতপ্রায়। বাল্মীকি, কালিদাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কিংবদন্তী আছে বলেই পাঠকালে আমরা তাঁদের স্মরণ করি। শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাই সম্বল করে পাঠক তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, যদিও তিনি তন্নামে খ্যাত নাটকাদির লেখক কিনা সে বিতর্ক এখনও থামে নি। লেওনার্দো দাভিঞ্চি সম্বন্ধে লোকের যতটুকু জ্ঞান ছিল সম্প্রতি তাঁর নোটবুক আবিষ্কৃত হওয়ায় তা অনেক বেড়ে গেছে। এখন তাঁর অঙ্কিত চিত্রের সঙ্গে তাঁর অজ্ঞাতপূর্ব বহুমুখী প্রতিভার ইতিহাস জড়িত হয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বকে স্পষ্টতর করেছে।

রবীন্দ্রনাথের পরিচয় আমরা যত এবং যেভাবে জানি, আর কোনও রচয়িতার পরিচয় কোনও দেশের লোক তেমন করে জানে কিনা সন্দেহ। আমাদের রবীন্দ্র-পরিচয় কেবল তাঁর সাহিত্যে সংগীতে শিক্ষায়তনে আবদ্ধ নয়। তাঁর আকৃতি-প্রকৃতি-ধর্ম-কর্ম-অনুরাগ-বিরাগ সমস্তই আমরা জানি এবং ভবিষ্যদবংশীয়রাও জানবে। এই সর্বাঙ্গীন সপ্রেম পরিচয়ের ফলে তাঁর রচনা আর ব্যক্তিত্বে যে সংশ্লেষ ঘটেছে তা জগতে দুর্লভ।

ইওরোপ আমেরিকায় এমন লেখক অনেক আছেন যাঁদের গ্রন্থ-

বিক্রয়-সংখ্যার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তাঁদের রচনা যে মাত্রায় জনপ্রিয় তাঁরা স্বয়ং সে মাত্রায় জনহৃদয়ে প্রতিষ্ঠা পান নি। বাইরনের অগণিত ভক্ত ছিল, তাঁর বেশভূষার অনুকরণও খুব হত, কিন্তু তাঁর ভাগ্যে প্রীতিলাভ হয় নি। বার্ণাড শ বই বেচে কোটিপতি হয়েছেন। কিন্তু তাঁর রচনাই জনপ্রিয় হয়েছে, তিনি হতে পারেন নি।

এদেশে একাধিক ধর্মনেতা ও গণনেতা যশ ও প্রীতি একসঙ্গেই অর্জন করেছেন; যেমন চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু নেতা না হয়েও যে লোকচিত্তে দেবতার আসন পাওয়া যায় তা রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্ভব হয়েছে। কেবল রচনার প্রতিভা বা কর্মসাধনার দ্বারা এই ব্যাপার সংঘটিত হয়নি, লোকোত্তর প্রতিভার সঙ্গে মহানুভবতা মিলে তাঁকে দেশবাসীর হৃদয়াসনে বসিয়েছে। এদেশে তিনি যা পেয়েছেন তা শুষ্ক সম্মান নয়, যথার্থই পূজা।

গুরু বললে আমরা সাধারণত যা বুঝি—অর্থাৎ মন্ত্রদীক্ষাদাতা—তার জন্য যে বাহ্য ও আন্তর লক্ষণ আবশ্যক তা সমস্তই তাঁর অমিত-মাত্রায় ছিল। কিন্তু যিনি লিখেছেন—'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার' তাঁর পক্ষে সামান্য গুরু হওয়া অসম্ভব। যে অগুহ্য মন্ত্র তিনি দেশবাসীকে দিয়ে গেছেন তার সাধনা আসনে বসে জপ করলে হয় না, ভক্তি বিহ্বল হলেও হয় না। তার জন্য যে জ্ঞান ও কর্ম আবশ্যক তা তিনি নিজের আচরণে দেখিয়ে গেছেন। তাই তিনি অগণিত ভক্তের প্রশস্ত অর্থে গুরুদেব। তাঁর লোকচিত্ত জয়ের ইতিহাস অলিখিত কিন্তু অজ্ঞাত নয়। কৃতী-গুণীকে তিনি উৎসাহদানে কৃতিতর করেছেন ভীরু নির্বাক অনুরাগীকে সাদরে ডেকে এনে অভয়দানে মুখর করেছেন, ভক্ত প্রাকৃতজনকে বোধগম্য সরস আলাপে কৃতার্থ করেছেন। মূঢ় অসূয়ক তাঁর সৌজন্যে পদানত হয়েছে, ক্রুর নিন্দুক তাঁর নীরব উপেক্ষায় অবলুপ্ত হয়েছে।

বুদ্ধচৈতন্যাদিতে কালক্রমে দেবত্বারোপ হয়েছে। কালিদাস শুধুই কবি, তথাপি নিস্তার পান নি। কিংবদন্তী তাঁকে বাগদেবীর সাক্ষাৎ বরপুত্র বানিয়েছে। রবীন্দ্রচরিতের এরকম পরিণাম হবে এমন

আশঙ্কা করি না। সর্ববিধ অতিকথার বিরুদ্ধে তিনি যা লিখে রেখেছেন তাই তাঁকে অমানবতা থেকে রক্ষা করবে।

রবীন্দ্র-রচনা অতি বিশাল, রবীন্দ্রবিষয়ে যে সাহিত্য লিখিত হয়েছে তাও অল্প নয়, কালক্রমে তা আরও বাড়বে। কবির সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছে তাঁদের অনেকে আরও চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর বাঁচবেন এবং তাঁদের দ্বারা রবীন্দ্রতত্ত্ব বিবর্ধিত হবে। তা ছাড়া কবির সহস্র পত্র, অসংখ্য প্রতিকৃতি, স্বরচিত অনেক চিত্র বিকীর্ণ হয়ে আছে। তাঁর গানে দেশ প্লাবিত হয়েছে, তাঁর কণ্ঠস্বরও যন্ত্রধৃত হয়ে স্থায়িত্ব পেয়েছে। এই সমস্তের সমবায়ে যে বিপুল রবীন্দ্র-পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে রবীন্দ্রাত্মার নিবিড় সংযোগ অক্ষয় করে রাখবে। তিনি মহা অজানায় প্রস্থান করলেও আমাদের কাছে চিরকাল জীবিতবৎ প্রত্যক্ষ থাকবেন!

যে মহৎ উত্তরাধিকার তিনি আমাদের জন্য রেখে গেলেন তা কি আমরা ধনীর জড়সন্তানের মত পরম আলস্যে শুধুই হাত পেতে নেব? কবির কাছে আমাদের যে ঋণ তা শাস্ত্রোক্ত ত্রি-ঋণের তুল্য গুরুভার। কেবল ভাবের উচ্ছ্বাসে তা শোধ হবে না। যে কর্ম জীবনের ব্রত ছিল, যার জন্য তাঁর ভাবনার অন্তর ছিল না, বিশ্বভারতী-রূপ তার সেই আরব্ধ কর্ম যদি অবিসংবাদে সমবেত চেষ্টায় সুসম্পন্ন হয় তবেই আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সার্থক হবে, নতুবা প্রমাণ হবে—কবি অযোগ্য দেশে জন্মেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথকে ভবিষ্যবংশীয়েরা কি চোখে দেখবে, তাঁর সম্বন্ধে কি ধারণা কল্পনায় মনে আনবে, সেকথা ভেবে দেখতে চেষ্টা করব না। তবে নিশ্চয় জানি, আমাদের যেমন তিনি ছিলেন চির বিস্ময়, তাদের মনেও তিনি জাগাবেন সেই বিস্ময়। তাঁর কাব্য-সৃষ্টিতে যে মহার্ঘ অজস্রতা, বৈচিত্র্যের যে বর্ণছত্র তা মনকে যেমন কাব্যের আনন্দে ভরে দেয়, শক্তির বিরাটত্বে বুদ্ধিকে তেমনই অভিভূত করে। এবং কবিতা তাঁর সাহিত্যের সার হ'লেও সর্বস্ব নয়। গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, সমালোচনায় ব্যাকরণ থেকে আরম্ভ ক'রে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রায় সকল ভঙ্গির যে প্রকাশ—তাকে এক মানুষের রচনা বলে বিশ্বাস করা কঠিন। এই সৃষ্টির ক্ষমতার সামান্য অংশও যার থাকে জীবন ও অনুভূতির আর সব দিক বঞ্চিত ক'রে সে সৃষ্টির আগুনকে জ্বালিয়ে রাখতে হয়। এর বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। সৃষ্টির এই বিরাট শক্তি ও আকৈশোর তার অতন্দ্রিত প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের জীবনের কোনদিক শীর্ণ করেনি; তাঁর অনুভূতির সৌকুমার্য কোথাও কর্কশ করেনি। মানুষের যা কিছু মহৎ, তাঁর পূজা পেয়েছে, যা কিছু হীন, তাঁকে বেদনা দিয়েছে। বিশ্ব-মানবের মৈত্রী তাঁর জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। সব ঘরে যে তাঁর ঠাঁই—সে কেবল তাঁর কাব্যের কল্পনা নয়। যে দেশ তাঁর জন্মভূমি, তার অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও দুর্দশা কবিকে করেছে কর্মী, তার সমস্ত দৈন্য ও হীনতা তিনি যেন নিজের বিরাট মহত্ত্ব দিয়ে লোপ করতে চেয়েছেন। প্রাচীন যেখানে বড়, কোন নবীন তাঁর মনের শ্রেষ্ঠত্ব বোধকে টলাতে পারেনি; নবীন যেখানে সত্য, কোন প্রাচীনের মোহ তা গ্রহণ করতে তাঁকে বাধা দিতে পারেনি। সমস্ত মানব-সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের ও মহত্ত্বের তিনি ছিলেন প্রতীক। একাধারে এই মহাকবি ও মহামানব বাস্তবে দেখা না দিলে কল্পনায় সম্ভব হত না।

আমরা যারা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী ও সমসাময়িক—অসম্ভব নয় যে দূর ভবিষ্যতে আমাদের একালের প্রধান পরিচয় হবে যে এটা রবীন্দ্রনাথের যুগ। আজকার দিনের তুচ্ছ ঘটনা, ক্ষুদ্র চেষ্টা, স্বল্প সাফল্য যখন সুদূরের দৃষ্টিতে অলক্ষ্য হবে, তখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দীপ্তিতেই ভাবীকাল আমাদের কালকে জানবে। আমাদের সুখ-দুঃখ, নিরাশা-আনন্দ তাদের চিত্তকে স্পর্শ করবে তাঁরই কাব্য থেকে। আমাদের সম্বন্ধে তাদের ঔৎসুক্য হবে জানতে, আমরা কিভাবে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেছিলাম, আমাদের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কতটা ব্যাপক ও গভীর ছিল, আমাদের জীবনের পারিপার্শ্বিক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে কতটা প্রভাবান্বিত করেছে। তাঁর কাব্য ও সাহিত্যে আমাদের একাল অমর হ'য়ে থাকল। সবকালের ভাগ্যে এ সৌভাগ্য ঘটে না।

ভবিষ্যৎ কালের লোক মানুষ-রবীন্দ্রনাথকে জানবে ইতিহাসের সমুজ্জ্বল পৃষ্ঠায়, কিন্তু কবি-রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম স্পর্শ তারা পাবে তাঁর কাব্যে, যেমন আমরা পেয়েছি। আজ হতে বহু শতবর্ষ পরে তাদের বসন্ত-দিনও রবীন্দ্রনাথের বসন্ত-গানে ধ্বনিত হবে, তাদের আষাঢ়ের সজল মেঘের উপর তাঁর বর্ষা-কাব্যের নীল অঞ্জন নেমে আসবে। প্রেয়সী নারীর নয়ন অধর তাঁর কাব্যের মধুতে মধুময় হবে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য তারা নিরাশায় উৎসাহ, শোকে সান্ত্বনা পাবে। সেই অনাগত কালের সমমর্মীদের অভিবাদন জানাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-পাঠে তাদের আনন্দই এর প্রত্যাভিবাদন।

কিন্তু মহাকবির কাব্য চিরকালের হলেও বিশেষ করে তাঁর সমকালিকদের। যে চিরন্তন নরনারীদের হৃদয়-স্পন্দন তাঁর কাব্যে রূপ পায়, তাঁর সম-কালের নর-নারীর হৃদয় তার উপকরণ, সেই বিশেষের মধ্যেই বিশ্ব-মানব নিজেকে প্রতিফলিত দেখে। আর কবির সমকালিকেরা তাঁর কাব্যে নিজেদেরই পায় এমন পূর্ণ ও নিবিড় ক'রে, যা ভিন্ন কালের মানুষের সম্ভব নয়। আমরা যারা আকৈশোর দিনের পর দিন রবীন্দ্রনাথের নূতন কাব্য পড়েছি, যার

অদ্ভুত বৈচিত্র্য আমাদের মনের সামনে গ'ড়ে উঠেছে ও আমাদের মনকে গড়েছে—চিরকালের রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ক'রে আমাদের। বাংলার উদার আকাশ ও অবারিত মাঠে আমাদের চিত্তের প্রসার এসেছে তাঁর কাব্য থেকে। শুভ্র বালুচরের নীচে পদ্মার কালো জল তাঁর কাব্যের কথাই আমাদের কানে কানে বলে। ভোরের প্রথম আলোতে তাঁর কাব্যের মোহ, গোধূলির রক্তরাগে তাঁরই কাব্যের রঙ। বাংলার নর-নারী আমাদের অন্তরতর তাঁর কাব্যের বন্ধনে। সকল যুগের লোকের এ সৌভাগ্য ঘটে না। মহাকবির যারা সমসাময়িক এ দুর্লভ সৌভাগ্য তাদেরই। রবীন্দ্রনাথের সমকালে জন্মে আমরা ধন্য হয়েছি।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ কবি, তিনি নাট্যকার, তিনি ঔপন্যাসিক। এ সব দিক দিয়াই তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের শীর্ষে, বিশ্ব-সাহিত্যের কিরীটের মণি-মালিকায় তাঁর স্থান।

কিন্তু তিনি আগে কবি, পরে নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক, তাঁর জীবনের প্রধান রস কাব্যরস—যাহা lyric কবিতার জীবন। নাটক ও উপন্যাস তাঁর জীবনের এই প্রধান রসকে বেষ্টন করিয়া তারই আশ্রয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কথা-সাহিত্য যেন তাঁর জীবনের এই রস-সাগরের প্রবাল দীপপুঞ্জ। সাগরের প্রবালের মত তাঁর উপন্যাসের কথাগুলি, এই রস-সাগরেই জন্মলাভ করিয়া যেন ক্রমে একটা সূক্ষ্ম-প্রবাল-বেষ্টনীর মত তাহার একটি ক্ষুদ্র খণ্ডকে শুধু ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

উপন্যাসও কাব্যের মত রস-রচনা। সেই উপন্যাসই সার্থক, যাতে রস একটা পরিপূর্ণ মূর্তি গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু গানের রসের যেমন দুটি উৎস—তার কথা ও তার সুর, তেমনি কথা-সাহিত্যের রসের দুটি উপকরণ, উপাখ্যান ও ভাব।

কাহিনীটির গঠন চাতুরী ও তাহার রচনাসৌষ্ঠব হইতেই এক প্রকার রস জন্মায়, তাহাতে আমাদের রসতৃষ্ণার পরিতৃপ্তি সম্পাদন করে। একটি সুগঠিত আদ্যপান্ত অনবদ্য কাহিনী নিরলঙ্কারভাবে বলিয়া গেলেও, তাতে রসের প্রচুর উপকরণ থাকে, সে রসকে কথারস বলা যাইতে পারে। কিন্তু তা ছাড়া, উপাখ্যানে যে জীবন চিত্রিত করা হয়, তার পর্বে পর্বে ভাবরসেরও প্রচুর অবসর থাকে—সেই রসও lyric কাব্যের মত উপন্যাসেরও উপজীব্য। কথারস ও ভাবরসের সুনিপুণ বিন্যাসে ও পরিবেশন-নৈপুণ্যে উপন্যাস রমণীয় হইয়া উঠে।

ঔপন্যাসিকের মধ্যে কেহ বা কথারস, কেহ বা ভাবরসকে বিশেষভাবে আশ্রয় করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের প্রধান রস ভাবরস। তিনি যে কয়খানি উপন্যাস লিখিয়াছেন, প্রত্যেকটিই কেবলমাত্র কাহিনী হিসাবে সুন্দর, কিন্তু তার উপাখ্যান ভাগ যাহা অতি সংক্ষেপে বলা যায়, তার ভিতর ঘটনার বৈচিত্র্য বা বিবিধ চিত্তচমকপ্রদ ঘটনার সংঘাতের বাহুল্য নাই। যে সংক্ষিপ্ত ঘটনা-বিরল কাহিনীটি লইয়া তাঁর উপন্যাস, তার পরতে পরতে ভাবরসের যে সব সূক্ষ্ম অবসর আছে, সেইগুলি আশ্রয় করিয়া তিনি তাঁর কাহিনী অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়াছেন। প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসই তাঁর এইসব সূক্ষ্মভাবের অভিব্যক্তি ও পরিণতির ইতিহাস—কোমল তুলিকায় সূক্ষ্মতম রেখা ও বিন্দুপাতে আঁকা এক-একটি বিচিত্র চিত্র।

এইটাই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়াছেন। সেগুলির ভিতর বৈচিত্র্য ও পার্থক্যের অন্ত নাই, কিন্তু তাঁর প্রথম বয়সের উপন্যাস 'রাজর্ষি' হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ বয়সের 'শেষের কবিতা' পর্যন্ত, সবগুলির মধ্যেই এই একটি লক্ষণ খুব সুস্পষ্টভাবে তাঁর সৃষ্টিকে অপরের সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্রতা দান করিয়াছে। এ লক্ষণ তাঁর চিত্তের গঠনে ভাবরসের মুখ্যতার ফল।

জীবনের যে-ইতিহাস উপন্যাসে লেখা হয়, তার ভিতর কোথায় কোনখানে lyric রসের সূক্ষ্ম অবসর আছে, তাহা তাঁর চক্ষু কখনও এড়াইয়া যায় না, আর সূক্ষ্মতম অবসরটুকুর পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া তিনি তাহা অপরূপ লাবণ্যে মণ্ডিত করিয়া তোলেন। তাঁর এই কবিদৃষ্টি ও এই বিশিষ্ট রস-প্রবণতার পরিচয় পাইয়াছিলাম একদিন তাঁর সঙ্গে আমার লিখিত একখানি উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে। অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত সে কথাটা বলিতে সাহস করিতেছি, শুধু কথাটায় তাঁর উপন্যাসের এই দিকটা বুঝিবার সহায়তা হইবে বলিয়া। আমার সে উপন্যাসে একটি বিবাহিতা পতিপ্রাণা নারী এবং তার

সহচর একটি যুবক এক সঙ্গে জেলে যায়। তাদের দীর্ঘ কারাবাসের অবসরে পত্র বিনিময়ে তাদের ভিতর যে গুপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষা ছিল তাহা ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আমি যুবক-যুবতীর এই ভাবের পরিণতি আমার শক্তি অনুসারে সংক্ষেপে মোটা তুলির দুই চারিটি আঁচড়ে ইঙ্গিত মাত্র করিয়া গিয়াছিলাম। সেই বইখানার আলোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ আমাকে দুই-চার কথায় বুঝাইয়া বলিলেন যে, এইভাবে ভাবের এই পরিণতিটি আরও অনেক বিস্তারিত করিয়া বলিবার অবসর ছিল। কারাগারের প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি হীনা-চরিত্রা নারীর সাহচর্যে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে গোপার চরিত্রের উপর সমাজের প্রচ্ছন্ন প্রভাব অপসৃত হইয়া অসংবিদ হইতে গুপ্ত কামনা ঠেলা মারিয়া উঠিল তাহার বিস্তীর্ণ ইতিহাসটা খুব চিত্তহারী করা যাইত। কাহিনীটির এইখানটায় এই lyric রসের প্রচুর অবসর ছিল; লিখিবার সময় আমার তাহা মনে পড়ে নাই, আর সে-রস অমন করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার শক্তিও আমার ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাবরসবহুল কবিচিত্ত ঠিক এই অবসরের দ্বারাই আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তার নিজের হাতে এমনি একটি কাহিনী পড়িলে এই রসটিকে নিশ্চয় তিনি অশেষ দরদের সহিত ফুটাইয়া তুলিতেন। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব।

পূর্বেই বলিয়াছি, তাঁর উপন্যাসের যে-কথাভাগ তাহা পরিকল্পনার গঠননৈপুণ্যে এবং পরিণতির স্বাভাবিকতা ও রসবাহুল্যে অনিন্দ্য। কিন্তু তবু, তাঁর উপন্যাসের যে প্রধান মাধুর্য, তাহা এই কাহিনীর সৌষ্ঠব নয়, তার পূর্বে লক্ষিত যে-ভাবরস আছে, তাহাতে।

তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের প্রথম পরিচয় দেখিতে পাই, তাঁর প্রথম উপন্যাসের উদ্ভবের ইতিহাসে। 'রাজর্ষি' উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "স্বপ্ন দেখিলাম কোন্ এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সহিত তার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—বাবা, একি! এ যে রক্ত!

বালিকার এই কাতরতায় বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভাণ করিয়া কোন মতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে। জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প।"

এই স্বপ্নে 'রাজর্ষি'র উদ্ভব। বলির রক্ত দেখিয়া শিশুর এই ভীতি ও বিক্ষোভ হইতে গোবিন্দমাণিক্যের চিত্তে যে ধাক্কা লাগিল তাহার পরিণতি-মুখে রাজর্ষির চরিত্র সৃষ্টি—ইহাই এ উপাখ্যানের বিষয়। শুধু এই ব্যাপারটুকু লইয়া একটি অপূর্ব lyric লেখা যাইত। গোবিন্দমাণিকের চিত্তের পরিণতির ইতিহাস লইয়া 'কথা ও কাহিনী' বা 'পলাতকা'র কবিতার মত অপেক্ষাকৃত বড় কবিতা লেখা যাইত। এই স্বপ্ন তাই রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্তকে বিশেষভাবে আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্যের চিত্তের পরিণতির এ ইতিহাস তাঁর কল্পনায় বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিল, এবং ইহার ভিতর এত প্রচুর রসের অবসর ক্রমে তাঁর চক্ষে ফুটিয়া উঠিল যে, তাহা খণ্ডকাব্যের সঙ্কীর্ণ পরিসরে ধরিয়া রাখা যায় না। তাই এই কাহিনীটি হইল উপন্যাস। তাঁর সৃষ্ট রস তিনি ভরিয়া দিলেন গোবিন্দমাণিক্যের ঐতিহাসিক চরিত্রের ভিতরে। সামান্য ঐতিহাসিক ঘটনা ও কাল্পনিক বহু ঘটনার বেষ্টনী দিয়া তিনি সৃজন করিলেন এক উপন্যাস।

'রাজর্ষি' কবির প্রথম উপন্যাস। ইহাতে এবং 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' তরুণ কবি সেকালের উপন্যাসের প্রচলিত আদর্শের দ্বারা অনেকটা চালিত হইয়াছিলেন। তাই এই দুখানি উপন্যাসে তাঁর প্রতিভার প্রকৃত স্বরূপ সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। তবু, এটা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই বইয়েরও উদ্ভব হইয়াছে একটা ভাবরসবহুল কল্পনায় এবং সেই ভাবটার পরিণতিই এ কাহিনীর প্রতিপাদ্য। ইহার পর কবি আর যে-সব উপন্যাস লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁর এই দিক দিয়া যে প্রকাণ্ড শক্তি আছে, তার ক্রম-পরিণতির একটা ইতিহাস আমরা দেখিতে পাই। 'নষ্টনীড়ে' তার আরম্ভ, 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি'তে তার পুষ্টি তার পরিপূর্ণ

বিকাশ 'গোরা' ও 'ঘরে-বাইরে'তে। মানুষের অন্তরের গভীরতম তলদেশে প্রবেশ করিয়া তাহার চিত্তের সবগুলি কোমল পদ্ম একটি একটি করিয়া তুলিয়া তাহার সকল মাধুরী বিকশিত করিয়া তুলিবার যে অপরূপ শক্তি রবীন্দ্রনাথের আছে, যে-শক্তির দ্বারা তিনি তাঁর lyric কবিতায় অপূর্ব সফলতার সহিত প্রতি মানবের চিত্তের অসম্বদ্ধ বা অর্ধসম্বদ্ধ ভাবরাশি উন্মীলিত করিয়া পূর্বেই দেশবাসীর চিত্ত-হরণ করিয়াছিলেন, সেই শক্তিই যে কথা-সাহিত্যেও তাঁর প্রধান শক্তি, সে-কথা রবীন্দ্রনাথ ক্রমে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 'রাজর্ষি' ও 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' উপন্যাস গঠনের প্রচলিত পদ্ধতির চাপে ইহা অনেকটা আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। 'নষ্টনীড়', 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি'তে কবি তাঁর শক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় লাভ করিয়া তাঁর প্রধান অধিকারক্ষেত্রে পা দিয়া দাঁড়াইয়াছেন। 'গোরা'তে ও 'ঘরে-বাইরে'তে তাঁর এই শক্তিতে আত্ম-প্রতিষ্ঠা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। তাঁহার হাতে যে ইন্দ্রজালের যন্ত্র আছে তাহার পূর্ণ শক্তি অনুভব করিয়া অপরিসীম পটুত্বের সহিত তিনি তাহার ব্যবহার করিয়াছেন তাঁর ওই দুইখানি উপন্যাসে। দীর্ঘকাল পরে আবার যখন তিনি উপন্যাস লিখিলেন তখন তাঁর অধিকারক্ষেত্র দখল হইয়া গেছে, সেইখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কবি তাঁর ইন্দ্রজালের অপরূপ খেলা দেখাইয়া গিয়াছেন। 'যোগাযোগ' এবং 'শেষের কবিতা'য় কবির এই শক্তিরই অপরূপ বিকাশ। গল্পের ভিতর যে-কাব্যরস তাঁর প্রধান দান, তাই পরিপূর্ণ হইয়া জমজমাট হইয়া উঠিয়াছে এই দুইখানি উপন্যাসে। 'গোরা' বা 'ঘরে-বাইরে'তে সে-রসের নবীনতার যে ফেনিল উচ্ছলতা ছিল তাহা মিলাইয়া গিয়াছে, ফুটিয়া উঠিয়াছে আরও নিবিড় হইয়া তার মাধুর্য।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে উপাখ্যানভাগ সর্বত্রই অতি-সংক্ষিপ্ত। তাঁর উপাখ্যান-চয়নের ক্ষেত্রও খুব প্রশস্ত নয়। 'রাজর্ষি' ও 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ছাড়িয়া দিলে, তাঁর আর সব কয়খানি উপন্যাসের বিষয়-বস্তু খুব সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ। সম্পন্ন ভদ্রপরিবারের সুশিক্ষিত পুরুষ ও নারী

লইয়া তাঁর উপন্যাস। প্রত্যেকটিতেই ছুটি চারটি পাত্র-পাত্রী লইয়া কথা। আর গল্পের প্রধান বিষয়—অবস্থাভেদে প্রেমের স্বরূপ ও পরিণতির বৈচিত্র্য। তাঁর চিত্রফলকের ভিতর রাশি রাশি লোক ভিড় করিয়া আসে না কোনও দিনই। তিন-চারিটি লোক লইয়া তাঁর উপন্যাস। আর তাদের জীবন এমন কিছু ভয়ানক বিস্ময়াবহ নয়। যুদ্ধ বা ডাকাতি, বা খুন-খারাপীর মত উত্তেজক বিষয় তাঁর উপন্যাসে কোথাও নাই। কাজের তাড়াও নাই। Action-এর পরিমাণ তাঁর উপন্যাসে যৎসামান্য, এবং বিবর্তন-মুখে সে পরিমাণ ক্রমশঃই কমিয়া আসিয়া 'শেষের কবিতা'য় ছুটি যুবক-যুবতীর নিরবচ্ছিন্ন প্রেমালাপে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

কিন্তু এই অপরিসর ক্ষেত্রে তিনি রসের ফসল জন্মাইয়াছেন সুপ্রচুর। ইহার তুলনা দেখিতে পাই আমরা বৈষ্ণব কবিতায়। পদাবলীর ভিতর যে অপরিচিত রস সঞ্চিত রহিয়াছে, খ্যাত ও অখ্যাত কত কবি যে কত নূতন রসের সঞ্চয় রাখিয়া গিয়াছেন, তার বিষয়-বস্তু কত ছোট। কৃষ্ণ-রাধিকার প্রেমমিলন ও বিরহের যে প্রাচীন সংক্ষিপ্ত কাহিনী, সেই একটি কাহিনী আশ্রয় করিয়াই সবাই লিখিয়াছেন। কিন্তু সেই কাহিনী লইয়াই প্রত্যেকে কত না অপরূপ রস সৃষ্টি করিয়াছেন।

কথা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের গৌরব তাঁর কথাবস্তুর প্রসারে নয়, রসসৃষ্টির গভীরতায়। রসের দীঘি তিনি কাটেন নাই, কাটিয়াছেন রসের খনি। সংক্ষিপ্ত বেষ্টনীর ভিতর আপনাকে আবদ্ধ করিয়া তিনি খুঁড়িয়া গিয়াছেন শুধু অন্তরের ভিতর। গভীর অন্তর হইতে মানবের চিত্তের ইতিহাস খুঁড়িয়া তুলিয়াছেন, আর সমগ্র পৃথিবীর সুমুখে ছড়াইয়া দিয়াছেন মানবচিত্তের গর্ভগত অপরূপ রসরাজি।

তাই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ঘটনার চমকপ্রদ বৈচিত্র্য নাই, কিন্তু অশেষ বৈচিত্র্য আছে ভাবের। ঘটনার অপূর্ব পারম্পর্যে তিনি চিত্ত চমকিত করেন না, কিন্তু ভাবের অপরূপ গতি অনুসরণ করিতে গিয়া তিনি চিত্তে যে চমক দেন, যে ব্যগ্রতা ও উৎকণ্ঠা জাগাইয়া তোলেন,

তাহা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের চমকপ্রদ ঘটনার পারম্পর্যের চেয়ে কম নয়। 'গোরা'য় গোরা ও সুচরিতার চিত্তের ক্রমবিকাশে, 'ঘরে-বাইরে'তে বিমলার চিত্তের পরিণতির ইতিহাসে যে অপূর্ব রসচিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তার প্রতি রেখাপাতে যে কি একটা উগ্র আকাঙ্ক্ষা ও উৎকণ্ঠা জন্মে তাহা তাঁর কোন্ পাঠক না অনুভব করিয়াছেন ? কিন্তু এই effect সৃষ্টি করিবার জন্য তাঁকে খুব চড়া করিয়া রং ফলাইতে হয় নাই, বর্ণের খুব তীব্র সংঘাত ঘটাইতে হয় নাই, শুধু সূক্ষ্ম রেখা ও বিন্দুপাতে পরিপূর্ণ করিয়া সমগ্র চিত্রটি আঁকিয়া পাঠকের চিত্তের এই মনোজ্ঞ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রফলকে অনেকগুলি মূর্তি তিনি আঁকেন নাই। দুই-চারটির বেশী কোনও উপন্যাসেই তাঁর নাই। কিন্তু এই দুই-চারিটি চিত্র এমন পরিপূর্ণতার সহিত এবং এমন অনবদ্য সৌষ্ঠবের সহিত আঁকিয়াছেন যে, তারা পূর্ণাঙ্গ হইয়া তাদের সকল মাধুর্য, সকল মহিমা, সকল শক্তি, সকল দুর্বলতা উন্মুক্ত করিয়া আমাদের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। তাদের চরিত্রে mystery আছে, কিন্তু অস্পষ্টতা নাই। নিখিলেশের চরিত্রে mystery আছে, বিমলার ভিতর যে দুইটা সত্তায় সংগ্রাম তাতে একটা মনোজ্ঞ mystery আছে, সন্দীপের তীব্র শক্তির সঙ্গে নীতির অভাবের সমন্বয়ে, এবং নগ্ন শক্তির এত বড় প্রচণ্ড তাণ্ডবের সঙ্গে শেষ একটা 'কিন্তু'র সমবায়ে mystery আছে ; কিন্তু এর কোনও চরিত্রই অস্পষ্ট নয়। তারা যেমনটি তেমনি পরিপূর্ণভাবে রক্তমাংসে গঠিত হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। তাদের চরিত্রের অন্তর্গত যে-সমস্যা সেটা সমাধান করিবার ভার পাঠকের।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় যেমন, উপন্যাসেও তেমনি আঁকিয়াছেন মানুষের ভাবজীবন। তাদের কর্মজীবন শুধু ভাবজীবনের আনুষঙ্গিক-ভাবে যতটুকু দরকার তার বেশী তাঁর উপন্যাসে স্থান পায় নাই। মুখ্যতঃ তিনি কবি, উপন্যাস তাঁর কবিজীবনের পরিণতিমুখে একটা গৌণ-সৃষ্টি। কবি হিসাবে তিনি ভাবদৃষ্টিতে মানুষের জীবনের দিকে

চাহিয়াছেন। সে জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোমলাতিকোমল ভাব-কণাগুলি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিবার এবং সুকুমার রেখাপাতে তাহা ফুটাইয়া তুলিবার অপূর্ব স্বাভাবিক শক্তি ও অর্জিত পটুত্বই তাঁর কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ গৌরব, এবং সেই শক্তি ও পটুত্বই উপন্যাসেও ভাবধাবার ভিতর এই অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টি ও অপরূপ বিন্যাসকৌশল দান করিয়াছে।

কাব্যে যেমন এক একটি ভাব, জীবনের এক-একটি খণ্ড বা বিশিষ্ট প্রকাশ আপনি এক-একটি স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ বস্তু হইয়া দাঁড়ায়, উপন্যাসে তেমন হয় না। উপন্যাসের বিষয় সমগ্র জীবন। জীবনের স্রোতের ভিতর এক বা একাধিক বিশিষ্ট ভাবধারা লইয়া উপন্যাস। কাজেই কাব্যে কবি যে প্রণালী অনুসবণ করিয়াছেন, উপন্যাসে ঠিক সেই প্রণালীটি হইত সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কেবল ভাবচিত্রের পর ভাবচিত্র বসাইয়া গেলেই উপন্যাস হয় না। উপন্যাসের রসেব জীবন হইল একটা পরিণতির আকাঙ্ক্ষা। ঘটনাস্রোতের গতি অনুসবণ করিয়া পাঠকের চিত্তে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা জাগ্রত হইয়া ওঠে। পরিণতির একটি আকাঙ্ক্ষা জন্মায়—সমাপ্তিতে সেই আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি সম্পাদন না করিলে উপন্যাস সার্থক হয় না। ঘটনার বা ভাবের মালা গাঁথিয়া গেলেই উপন্যাস হয না। তার তলায় থাকা চাই একটা চলনশীল জীবনস্রোত।

তাই উপন্যাসে কবি আঁকিয়াছেন এই জীবনস্রোত। স্রোতের গতিমুখে যে ফুলগুলি ভাসিয়া যাইতেছে সেগুলি তিনি অবজ্ঞা করেন নাই—তাঁর উপন্যাসের আদ্যোপান্ত এইসব খণ্ডরসে ভরিয়া রহিয়াছে, কিন্তু তবু তাঁর অখণ্ড মনোযোগ আছে এই জীবনস্রোতের উপর, আর সে জীবনস্রোত এমন করিয়াই তিনি আঁকিয়াছেন, এমন করিয়াই সে ভাবধারা বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে তার প্রতি রেখাপাতে আকাঙ্ক্ষা ও উৎকণ্ঠা তীব্র হইয়া জাগিয়া উঠিয়া সমগ্র উপন্যাসকে কথারসভূয়িষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। তার ভাব-বিশ্লেষণ সাইকলজির বিশ্লেষণ নহে, কবির বিশ্লেষণ। ইহাতে পাত্রপাত্রীর মন যেন পাঠকের সামনা-সামনি আসিয়া কথা বলিতে থাকে, আর দার্জিলিঙয়ের ক্যালকাটা

রোডের ধারে বসিয়া বদাওনের রাণী যেমন করিয়া শ্রোতার চিত্তকে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল, 'ক্ষুধিত পাষাণে'র অপূর্ব ইন্দ্রজাল যেমন তার গর্ভের ভিতর সকলকে অসহায়ভাবে টানিয়া লইয়াছিল, তেমনি করিয়া এ কাহিনী চিত্তকে আকৃষ্ট ও বন্দীকৃত করে।

ভাবের বিশ্লেষণ এই রোমান্সের রোমাঞ্চ-সত্তায় রবীন্দ্রনাথ যেমন করিয়া করিয়াছেন তেমন আর কোনও ঔপন্যাসিক করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না।

পূর্বে বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের হাতে উপাখ্যানটি শুধু একটা খাঁচা, তাঁর উপন্যাসের প্রাণ এই ভাবরস। ভাবের পুষ্টি ও পরিণতিই তাঁর উপন্যাসের প্লট। ঘটনাগুলি শুধু সেই পরিণতির সহায়ক। শুধু ঘটনা নয়, যা কিছু তিনি লিখিয়াছেন, তার ভিতর অনেক কথাই আছে—ধর্মের কথা, সমাজতত্ত্বের কথা, আরও কত কি আছে। সবগুলিই এই ভাবধারার সহায়ক মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির ভিতর যত তত্ত্বালোচনা আছে, ভারী ভারী তত্ত্বের সুগভীর আলোচনা যত আছে, এমন খুব কম বইয়ে আছে।

তত্ত্বের আলোচনা আরও অনেকে করিয়া থাকেন। এক-আধজন ঔপন্যাসিক আছেন যাঁরা তত্ত্বালোচনায় অশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন তাঁদের গ্রন্থে, যদিও উপন্যাসের রসধারার সঙ্গে সেই পাণ্ডিত্যকে মিশ খাওয়াইতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য জগতের আধুনিক উপন্যাসে তত্ত্বের অশেষ বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং এমন একটা ধারণাও অনেক স্থলে দেখা যায় যে উপন্যাস যদি কোনও একটা গভীর তত্ত্বের বাহন না হয়, তবে সেটা তুচ্ছ। এই ভাবটা সবচেয়ে বেশী প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে রুশিয়ার অতি আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্য-সমালোচনার ভিতর। আবার যাঁরা এই আধুনিক রুশ সাহিত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত, আমাদের দেশের সেই এক শ্রেণীর সমালোচকদের ভিতরও এই ভাবটার পরিচয় পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর একজন সমালোচক একবার অতি আধুনিক

কথা-সাহিত্যিকদিগকে Challenge করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি নূতন বাণী তাহারা দিয়াছে, কোন্ নূতন বার্তা দেশবাসীকে শুনাইয়াছে ? যেন কথা লিখিবার একমাত্র প্রয়োজন নূতন একটি Message বা বাণী শুনান।

আমি সাবেক আমলের লোক। আমার বিশ্বাস, সাহিত্য-সৃষ্টির সার্থকতা আর Message বা বাণীতে নয়, কোনও তত্ত্বের ব্যাখ্যানে নয়—রসের নূতন প্রকাশে। উপন্যাস উপন্যাস-হিসাবে সার্থক হইয়াছে কি-না, তার একমাত্র মানদণ্ড তার রস-সমৃদ্ধি। আর এই রস-সম্পদ তাকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিয়া রসগ্রহিতার দ্বারা বিচার করিতে হয়, প্রত্যেক উপন্যাসকে স্বতন্ত্রভাবে একটি সমগ্র রসসৃষ্টি স্বরূপে বিচার করিয়া আলোচনা করিতে হয়। অনেকগুলিকে এক সঙ্গে করিয়া তার সম্বন্ধে সমষ্টিগতভাবে একথা জিজ্ঞাসা করা চলে না যে, এই সমগ্র সমষ্টির মধ্যে নূতন রস আছে কি ? এ প্রশ্নের উত্তর হয় না, হইতে পারে না। কেন-না, রসবস্তুটির প্রকাশ হয় ব্যষ্টিরূপে, প্রত্যেক উপন্যাসে স্বতন্ত্রভাবে সে-রসের বিকাশ তাদের কোনও সাধারণ পরিচয় হয় না।

উপন্যাস কোনও তত্ত্বের বাহন হইতে পারে ; কিন্তু উপন্যাস হিসাবে তার সার্থকতা সে-তত্ত্বের গুরুত্ব বা যাথার্থ দিয়া বিচার করা চলে না। সাহিত্য হিসাবে তার দেখিবার বস্তু শুধু এই যে, ব্যস্ত ও সমস্ত ভাবে তাহার ভিতর রস ফুটিয়াছে কি-না, এবং সেই রসের গৌরব ও সমৃদ্ধিই উপন্যাসের গৌরবের পরিমাণ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনও উপন্যাসকে কোনও তত্ত্বের বাহন স্বরূপ রচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কি-না বলিতে পারি না। তত্ত্বের সাগর আছে তাঁর অনেকগুলি উপন্যাসে, তাহা হইতে তীব্র জিজ্ঞাসার উদ্ভব হইতে পারে, অশেষ শিক্ষার উপাদান পাওয়া যাইতে পারে। সেই শিক্ষা প্রচার করাই তাঁর মনোগত ইচ্ছা ছিল কি-না জানি না। কিন্তু সেরূপ ইচ্ছা থাকিলেও তাঁর রসজ্ঞানের সমৃদ্ধি বশতঃ তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁর উপন্যাস-মালার মধ্যে অকৃপণভাবে

তিনি ছড়াইয়া দিয়াছেন তত্ত্বালোচনা ; কিন্তু সেই তত্ত্ব কোনও গ্রন্থেরই প্রতিপাদ্য হইয়া দাঁড়ায় নাই ; উপাখ্যানের পরিপূর্ণ রসরূপের মধ্যে সে তত্ত্বালোচনা এমন একটা নির্দিষ্ট স্থান পাইয়াছে যেখানে রসসৃষ্টির দিক্ হইতে তার থাকিবার প্রয়োজন ছিল।

'ঘরে-বাইরে' খুব তত্ত্ববহুল উপন্যাস। ইহার পত্রে পত্রে ভাবাইবার অনেক কথা আছে। 'গোরা' তার চেয়েও তত্ত্বভূয়িষ্ঠ। ধরিতে গেলে এই গোটা বইখানার সবচেয়ে মোটা অংশ গোরার সঙ্গে আর সকলের তত্ত্বালোচনা। কিন্তু এই যে তত্ত্ব ইহা অনাবশ্যকভাবে জবরদস্তি করিয়া গ্রন্থের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় নাই এক স্থানেও। সর্বত্রই এই তত্ত্বালোচনা উপন্যাসের রসমূর্তির স্ফুরণের সহায়ক হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উপন্যাসের মত গোরাও প্রধানত পাত্র-পাত্রীদের চিত্তের পরিণতির সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ-বহুল ইতিহাস। সেই ইতিহাসের পরিণতির পথে প্রত্যেকটি তাদের তর্ক হইয়াছে অপরি-বর্জনীয় সহায়ক। প্রত্যেকটি তর্কে, প্রত্যেকটি তত্ত্বব্যাখ্যানে শুধু গোরা বা পরেশবাবু বা বিনয়ের বা সুচরিতার চরিত্র যে দীপ্তিমান হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই নয়, প্রত্যেকটি তর্কের পদে পদে এবং পরিসমাপ্তিতে পাত্র-পাত্রীদের কারও চিত্তের পরিণতি-কাহিনী কতকটা দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। 'ঘরে-বাইরে'র তত্ত্বালোচনাও এমনি মনের পরিণতিমুখে এক-একটা ধাপ মাত্র। তত্ত্বের অনবদ্য মীমাংসা বা ব্যাখ্যানের অপেক্ষায় উপাখ্যানটি কোথাও বসিয়া থাকে নাই। তত্ত্ব-ব্যাখ্যানের গতিমুখে উপাখ্যান অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তত্ত্ব-ব্যাখ্যান এইরূপে উপন্যাসের রসমূর্তির ভিতরে অপরিহার্য অংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার একটি আলোচনা বাদ দিলে তার পরের অংশের গ্রন্থিসূত্র ছিন্ন হইয়া যাইবে।

এইজন্য বহু তত্ত্ব, বহু আলোচনা, আপাত-দৃষ্টিতে বহু অবান্তর বিষয়ের প্রচুর সমাবেশ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি প্রত্যেকটি একটি পরিপূর্ণ রসবস্তু হইয়া পড়িয়াছে।

নাট্য-সাহিত্যের একটি বিশেষত্ব সম্বন্ধে সমালোচকেরা একমত। সেই বিশেষত্ব এই যে, নাটক ঠিক ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভার উপর নির্ভর করে না ; প্রতিবেশ—প্রভাব ইহার পক্ষে প্রায় তুল্যরূপেই প্রয়োজনীয়। নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সকল যুগে ও দেশে নাটকের উৎকর্ষ জাতীয় জীবনের একটি বিশেষ অবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত থাকে। পেরিক্লিসের যুগের গ্রীক নাটক, চতুর্দশ লুই-এর যুগের ফরাসী নাটক ও এলিজাবেথ যুগের ইংরাজী নাটক সকলেই জাতীয় জীবনের উন্নতি ও উন্মাদনার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। নাটক যেন উন্নতিশীল, বীরত্বমণ্ডিত, গৌরবময় জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক সাহিত্যিক অভিব্যক্তি। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, জাতির যৌবনের দৃপ্ত তেজ ও উন্মাদনা কাটিয়া গেলে, চিন্তাশীলতা ও দার্শনিক-তত্ত্বানুশীলতা জাতীয় জীবনকে অধিকার করিলে নাট্য-সাহিত্যের উৎস সেখানে শুকাইয়া যায়। ইংরাজী সাহিত্যে রোমান্টিক ও ভিক্টোরিয়া যুগের অনেক প্রতিভাবান কবি নাটক লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের অতুলনীয় কবি-প্রতিভা নাটককে ঠিক জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই, নাটকের মূল রহস্যটি তাঁহাদের নিকট ধরা দেয় নাই। সাহিত্য-রাজ্যে নাটক যেন রূপকথার ঘুমন্ত রাজকন্যা ; এবং ইহাকে জাগাইবার সোনার কাঠি জাতীয় জীবনের কোন্ গোপন স্তরে লুকান আছে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

অনেকটা এই কারণেই অতি-আধুনিক যুগে নাটকের প্রকৃতি ও আদর্শ সম্বন্ধে একটা গভীর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। অনেক চেষ্টার পরেও যখন পুরাতন নাটককে পুনর্জীবিত করা গেল না, তখন লেখক ও সমালোচক ইহার কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন। এই অনুসন্ধানের

ফলে ক্রমশঃ এই সত্য ফুটিয়া উঠিল যে, এলিজাবেথ যুগের নাটককে যে বর্তমান কালে পুনর্জীবিত করা যায় না, তাহার প্রধান কারণ, আমাদের জীবনের ধারা ও সমস্যা এখন সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে। যৌবনের স্বপ্ন ও কর্মক্ষমতা প্রৌঢ় জীবনে প্রতিফলিত করা যায় না। শেক্সপীয়ারের নিকট জীবনের যে-প্রশ্ন যে-সমস্যা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, একজন আধুনিক নাট্যকারের নিকট তাহারা গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। লিয়ারের হৃদয়ভেদী আর্তনাদ, ম্যাক্‌বেথের মূঢ় রক্ত-পিপাসা, ওথেলোর উন্মত্ত সন্দেহ, হ্যামলেটের অশান্ত আত্ম-জিজ্ঞাসা—সমস্তই যেন একটা সুদূর জগতের ক্ষীণ প্রতিধ্বনির মতো আমাদের কানে আসিয়া পৌছে। অবশ্য শেক্সপীয়ারের নাটকে মানব-হৃদয়ের যে-সমস্ত সমস্যা আলোচিত হইয়াছে তাহারা চিরন্তন, তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু উহাদের সে পুরাতন তীব্রতা, সে উদ্দাম গতিবেগ নাই। অকৃতজ্ঞ সন্ততির এখন অভাব নাই, এবং বোধ হয় কখনই অভাব থাকিবে না ; কিন্তু আত্ম-প্রতারণা ও মোহের যে উচ্চ শিখর হইতে ভূমিস্যাৎ হইয়া বৃদ্ধ রাজা লিয়ারের মর্মবেদনা এত করুণ ও অভ্রভেদী হইয়াছিল, বর্তমান জীবনের সমতলভূমিতে সেই মোহ-পর্বতের স্থান কোথায় ? সুতরাং বর্তমান যুগের লিয়ারেরা পড়ে ও কাঁদে, কিন্তু তাহাদের ক্রন্দনে সেই বিরাট, সর্বগ্রাসী সুর নাই। ম্যাক্‌বেথের উচ্চাভিলাষ বর্তমান যুগে হত্যার ছুরিকা না ধরিয়া উপায়ন্তরে নিজ উন্নতির পথ পরিষ্কার করে এবং ডাকিনীর সহিত পরামর্শের অপেক্ষা রাখে না—সুতরাং নাট্যকার তাহার মধ্যে আপনার চরম গৌরবের উপাদান খুঁজিয়া পান না। ওথেলোর ঈর্ষা আজকাল সমস্ত পাশ্চাত্য সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়া বিবাহবিচ্ছেদ বিচারালয়ের কার্য-বিবরণীর মধ্যে সুলভ সমাধান লাভ করে, এবং ডেসডেমোনা আত্মবলির পরিবর্তে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে ঈর্ষাপরায়ণ স্বামীর সহায়তাই করে। হ্যামলেটের আত্মজিজ্ঞাসা অবশ্য বিশেষভাবেই আধুনিক কালের ব্যাধি, কিন্তু যে-অবস্থার মধ্যে তাহার চিত্ত-দৌর্বল্য ট্রাজেডির সৃষ্টি করিয়াছিল এখন তাহার পুনরাবৃত্তির অবসর কোথায় ?

মোটের উপর শেক্সপীয়ারের সময়ের যে দ্বন্দ্বসংঘাত, যে উদ্দাম প্রবৃত্তির প্রবলতা, যে উচ্চ সুরে বাঁধা হৃদয়তন্ত্রী ছিল, আধুনিক কালে তাহার তীব্রতা অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে; আজকাল জীবনের দুঃখ-জ্বালা, জীবন-সমস্যার সংঘাত অপেক্ষাকৃত মৃদু সুরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। পুরাতন ট্রাজেডির বীরত্বপূর্ণ, অলঙ্কার-বহুল ভাষা আমাদের কর্ণে যেন অনেকটা অর্থহীন কোলাহলের মতই ধ্বনিত হয়—"with little meaning, though the words are strong," বর্তমান জীবনের চরম মুহূর্তগুলি (Crises) শেক্সপীয়ারের যুগের সহিত এক নয়।

সুতরাং, এই অবস্থার পরিবর্বনের সঙ্গে সমতা রাখিয়া নাটকেরও প্রকৃতি ও আদর্শ রূপান্তরিত হইতেছে। ঘটনাবহুল পঞ্চাঙ্ক নাটক বর্তমানের ক্ষুদ্র সমস্যার মধ্যে তাহার রাক্ষসী ক্ষুধার যথেষ্ট খাদ্য পাইতেছে না, সেইজন্য খুব স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই তাহার কলেবর সঙ্কুচিত হইয়া তিন-অঙ্ক বা একাঙ্ক নাটকে দাঁড়াইতেছে। ভাষার কবিত্বময় উচ্ছ্বাস ও অলঙ্কারস্ফীতি সাধারণ জীবনের সম্পর্কে আপনার আতিশয্যে আপনি লজ্জিত হইয়া প্রতিদিনের গদ্যে সঙ্কুচিত হইতেছে। আবার এই আকৃতি পরিবর্তনের সঙ্গে আধুনিক নাটকের প্রকৃতি-পরিবর্তনও ঘটিতেছে। এই অন্তর্দৃষ্টির যুগে মানুষ বাহিরের বিস্ময় হইতে দৃষ্টি সংহত করিয়া অন্তরের গভীরতর রহস্যের দিকে প্রেরণ করিতেছে। বাহিরের যুদ্ধবিগ্রহ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত বা বহিঃপ্রেরণার জন্য অন্তরের বিক্ষোভ যে-পরিমাণে শান্ত হইয়া আসিতেছে, সেই পরিমাণে অন্তরের নীরবতা এক অপূর্ব রহস্যমণ্ডিত হইয়া নূতন অর্থ-গৌরবে ভরিয়া উঠিতেছে। যাহা তুচ্ছ ও সামান্য, তাহার মধ্যেও অনন্ত রহস্যের সঙ্কেত ও ইঙ্গিত স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে। বাঁশীর মধ্যে ফুৎকারবায়ুর ন্যায় পৃথিবীর সমস্ত নীরব, নিশ্চল পদার্থের মধ্যে একটা গোপন শক্তির আনাগোনা, তাহার মৃদু পদক্ষেপ ও অস্পষ্ট গুঞ্জরণ-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। জীবনের এই অতীন্দ্রিয় রহস্য (mysticism) ও সাঙ্কেতিকতা (symbolism) সর্বপ্রথম গীতি-

কবিতার ছন্দে গাঁথা পড়ে। কিন্তু লীলাময় বিকাশ যতই সুস্পষ্ট হইতেছে, যতই ইহা ব্যক্তিগত অনুভূতির সীমা ছাড়াইয়া সাধারণ পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করিতেছে, বিশেষতঃ মানব-মন যতই ইহার আনন্দময় ঘাত-প্রতিঘাত সম্বন্ধে একটা সাগ্রহ কৌতূহল অনুভব করিতেছে, ততই ইহা গীতি-কবিতার রাজ্য অতিক্রম করিয়া নাটকের বিষয়ীভূত হইয়া উঠিতেছে। এইরূপে একটা সম্পূর্ণ নূতন রকমের নাট্যসাহিত্য আমাদের চোখের সম্মুখে সৃষ্ট হইতেছে। ইহাকে Symbolical drama বা রূপক-প্রধান নাটক নামে অভিহিত করা হইতেছে। Maeterlinck, Yeats, Synge প্রভৃতি এই নূতন নাট্য-সাহিত্যের স্রষ্টিকর্তা। এই নূতন নাটকের প্রকৃতি সম্বন্ধে Maeterlinck যাহা বলিতেছেন তাহা হইতেই বোঝা যাইবে যে, পুরাতন নাটকের সহিত ইহার কি গভীর মূলগত প্রভেদ।

"I have come to believe that an old man seated in his arm-chair, waiting quietly under the lamp-light, listening without knowing it to all the eternal laws which reign about his house......bowing his head a little, without suspecting that all the powers of the earth intervene and stand on guard in the room like attentive servants......I have come to believe that this motion-less old man liked really a more profound, human, and universal life than the lover who strangles his mistress, the captain who gains a victory, or the husband who avenges his honour."

রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ এই সাঙ্কেতিক নাট্য-সাহিত্যের মধ্য দিয়াই নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং এই নূতন নাটকের আদর্শেই তাঁহার নাটকগুলির বিচার করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে পথ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
ডাক দিয়ে সে যায়
আমার ঘরে থাকাই দায়॥
পথের হাওয়ায় কী সুর বাজে
বাজে আমার বুকের মাঝে
বাজে বেদনায়॥

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনের দিনপঞ্জী একটু নিবিষ্টচিত্তে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে বয়ঃপ্রাপ্তির পর থেকে তিনি একাদিক্রমে তিন মাসের বেশি বোধ হয় কখনো এক জায়গায় বাস করেন নি ; পেশা ও নেশা দুটোই নিরন্তর চলাফেলার কারণ। জমিদারী তদারকি ছিল পেশা, যার উপর জীবিকার আশ্রয় ; তাই প্রায় ত্রিশ বৎসর এই জীবিকার উৎসমুখটি নীরন্ধ্র রাখবার জন্য ঘুরতে হয়েছে। কিন্তু এর বাইরে আছে 'অকারণে চঞ্চল' মনের আকৃতি ; জীবনের যাত্রাপথে হৃদয়-অরণ্য মধ্যে আবিষ্ট জীবন থেকে নিষ্ক্রমণ করে লোকালয়ের মধ্যে বিশ্বকে বা সকলকে পাওয়ার সাধনা চলেছিল। গানে, নাটকে, গল্পে, প্রবন্ধের মাধ্যমে তার প্রকাশ হয়েছিল। প্রকাশ-মাত্রই নিষ্ক্রমণ। ঘরে বসেই মনে মনে কত গান পথের ও পথিকের উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন, তার তালিকা নিতান্ত অল্প হবে না।

মনোবিহারের বাইরে ছিল দেশ ও মানুষকে দেখবার ও জানবার নেশা, যা তাঁকে দেশ-দেশান্তরে ছুটিয়ে নিয়ে ফিরেছিল। বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ দেশের ভিতরে ও দেশের বাইরে কী পরিমাণ পথে পথে ঘুরেছিলেন, সে ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্র এই প্রবন্ধ নয়।

রবীন্দ্রনাথের এই পথের নেশা, এই চলার আবেগ তাঁর অধিকাংশ নাটকেই তাঁর অবচেতনে প্রকাশ পেয়েছে। যৌবনের মুখে গানে

বলেছিলেন, 'আগে চল, আগে চল ভাই'। জীবনভর সেই আগে চলবার কথাই বলেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাটাও বলতে চাই যে গতির সঙ্গে আছে স্থিতি অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। তাই কবি একদিকে আকাশ-বিহারী আদর্শবাদী, অপরদিকে নীড়বিলাসী বাস্তববাদী। 'তদ্‌দূরে, তদ্‌ অন্তিকে, তদ্‌ এজতি, তদ্‌ ন এজতি'—তাঁর কাছে সত্য। ঘর থেকে বের হবার জন্য যেমন আগ্রহ, ঘরে ফিরে আসবার জন্য তেমনি উৎকণ্ঠা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যগুলিতে এমন-কি কোনো কোনো উপন্যাসেও পাত্রপাত্রীদের গৃহকোণে আবদ্ধ থাকতে দেননি ; সবাই যেন নিষ্ক্রমণ করে বিশ্ব লোকালয়ে প্রবেশ করতে চাইছে।

বাল্মীকি প্রতিভা গীতিনাট্যে রত্নাকর ও তাঁর দস্যুদল বনপথে ঘুরছে। সরস্বতী বালিকাবেশে পথ ভুলে অরণ্যে ঘুরছেন ; লক্ষ্মীও বৈকুণ্ঠ ছেড়ে বনে এসেছেন বাল্মীকিকে তাঁর বরপুত্র করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু যে ভগ্নীটির বীণা দস্যুসর্দার উঠিয়ে নিলেন তিনি তাকে বনসম্পদ দিলেন না সত্য, তিনি দিলেন অমরতা। সেই অমরতার আশীর্বাদে শতাব্দীর পর শতাব্দী তাঁর বাণী বহন করে চলে আসছে কবি বালকের দল। লক্ষ্মীর বরপুত্ররা পৌত্রে এসেই নিখোঁজ হয়ে যান।

রবীন্দ্রনাথ আরও যে দুইটি গীতিনাট্য রচনা করেন—কালমৃগয়া ও মায়ার খেলা, সেখানে পথকেই দেখি। বনপথেই কালমৃগয়া করলেন দশরথ। পুত্রলাভ আশীর্বাদ অভিশাপ রূপে পেলেন এই বনবিহার কালে। মায়ার খেলাতে অমর পৃথিবী খুঁজে কাহারও পেল না সন্ধান। তার উদ্দেশ্যে মায়াকুমারীগণ গেয়েছিল 'কাছে আছে দেখিতে না পাও, তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও'।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যনাট্য, যা গানের সুরে লেখা নয়, তা হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিশোধ। এই নাটকের সমস্তটাই প্রায় পথের ধারে ঘটেছে। সন্ন্যাসী তাঁর অবাস্তব জীবন থেকে পথে বের হয়ে পৃথিবীকে যেন প্রথম দেখছেন। গুহাবাস থেকে নিষ্ক্রমণ হল ; যে

প্রকৃতি থেকে আপনাকে নিষ্ঠুরভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন পথের 'পরে, সেই প্রকৃতিকে তিনি পেলেন নানাভাবে।

রাজা ও রানী এবং বিসর্জন—রাজা উজীরদের ঘটনা কেন্দ্র করে পঞ্চাঙ্ক নাটক। রাজা ও রানীর মধ্যে রাজা বিক্রম পথে পথে অত্যাচার করে ঘুরছেন, সুমিত্রা ও কুমারসেন বনে বনে চলেছেন। চলার অবসানে নাটকের পরিণতি হল ট্রাজেডিতে। বিসর্জনের মধ্যে শেষ পর্যন্ত গোবিন্দ-মাণিক্যকে রাজ্য ছেড়ে পথেই বের হতে হয়। রঘুপতিকেও তাঁর মন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পথাশ্রয়ী হতে হল। পথের ভিখারী অপর্ণাই বললে মন্দির ছেড়ে চলে আসবার জন্য। সুনির্দিষ্ট পুরিবেশ কাউকে শেষ আশ্রয়ে ধরে রাখতে পারলে না।

এই দুই নাটক রচনার বহু বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় নাটক রচনায় হাত দেন, মাঝে মাঝে লেখেন প্রহসন ও নাট্যকাব্যগুলি। সেগুলির আলোচনা আমরা বাদ দেব। কবির জীবনে ১৯০৭ সালের পর আধ্যাত্মিক জাগরণের আভাস ও গভীর ভক্তিমূলক গানের উৎস উৎসারিত হতে দেখি।

এই ধর্মীয় সংগীতগুলির দুইটি রূপ, একটি প্রাকৃতিক অপরটি আত্মিক—উভয় শ্রেণীর গানের মধ্যেই আছে বিশ্বমানবিকতা। এই পর্ব থেকে শুরু হয় তাঁর এক শ্রেণীর নাটক, যাদের বলা হয় রাহস্যিক ও সিম্বলিক। শারদোৎসব, রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর ও ফাল্গুনীকে এই পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। ঠিক এই কোঠায় পড়ে না, অথচ কালানুক্রমে প্রায়শ্চিত্ত নাটক এই পর্বের গোড়ার রচনা, অর্থাৎ শারদোৎসবের পর এই নাটক লিখিত হয়।

প্রায়শ্চিত্ত ঐতিহাসিক কাহিনীর পটভূমে রচিত হলেও এরই মধ্যে তাঁর সেই ঘরছাড়া পথে বের হবার মনটিকে পাই। ধনঞ্জয় বৈরাগী কবির একটি নূতন সৃষ্টি—যদিও রাজর্ষির বিশ্বন ঠাকুরের মধ্যে তার আভাস খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। ধনঞ্জয় বৈরাগী পথে পথেই ঘুরে বেড়ায়। আজ সে মানুষের দুঃখের প্রতিবাদ করতে রাজার সম্মুখীন হয়েছে। প্রতাপাদিত্য কোনো এক দুর্বল

মুহূর্তে বলে ফেললেন '—বৈরাগী, আমার এক একবার মনে হয় তোমার এ রাস্তাই ভালো, আমার এই রাজ্যটা কিছু না।'—বৈরাগী বললেন, 'মহারাজ, রাজ্যটাও তো রাস্তা ; চলতে পারলেই হল। ওটাকে যে পথ বলে জানে সেই তো পথিক।' বৈরাগীর এই কথা চিরন্তন ভারতবর্ষের কথা। এই জগৎটা সরে সরে চলেছে বলেই তা সংসার নাম পেয়েছে। সংসারটা সাধারণ মানুষের পথ, রাজ্যটাও রাজার পথ ; গমনের স্থান, গম্যস্থান নয়। নাটকের শেষে উদয়াদিত্য বিভা বৈরাগীর খোলা পথের পথিক রূপে বের হয়েছে ; রাঙামাটির পথের ডাক বৈরাগ্যের প্রতীক।

শারদোৎসব নাটকের সবটাই পথের উপর ঘটছে ; ছেলের দল বের হয়েছে পথে উৎসব করতে, লক্ষ্মীশ্বরের মন ছুটেছে বাণিজ্য করতে, রাজা ছদ্মবেশে বের হয়েছেন পথের লোককে জানতে। সমস্তটাই যেন song of the open road—তবে এই খোলা পথের 'পরে নগর নেই, কারখানা নেই, আছে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র, শ্যামল বনভূমি কাশের বন, সরোবরের পদ্মকলির কুমুদমোদিত দৃশ্য। ঠাকুরদা ও রাজা পথে ঘুরছেন সেই অনির্বচনীয়ের আহ্বানে। পথে চলা ও খেলা চরম কথা নয়—তাকেও শমে এসে স্তব্ধ হতে হয়। তখন পাওয়া ও হওয়া, গতি ও স্থিতি অভিন্ন হয়ে যায়।

অচলায়তনে পঞ্চক পথ খুঁজছে, সে গায় 'এ পথ গেছে কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে ; তা কে জানে তা কে জানে। বাইরের সঙ্গে আয়তনের ভেদ ঘটানোই হচ্ছে পঞ্চকের কাজ। তারপর একদিন গুরু স্বয়ং এসে প্রাচীর ধ্বংস করে পথ মোচন করে দিলেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে গেল ; চলাটাই কি একমাত্র সত্য ? তা তো নয়, থামাটারও প্রয়োজন আছে ; মহাপঞ্চক এই স্থিতির প্রতীক, আর তার সহোদর পঞ্চক গতির মূর্তি। তাই গুরু বললেন, মহাপঞ্চকের প্রয়োজন আছে এই আয়তনকে পুনর্গঠনের জন্য। অনিয়ন্ত্রিত গতি সত্য নয় ; মন্ত্রমুগ্ধস্থিতিও সত্য নয় ; অতীতকাল প্রতি মুহূর্তে বর্তমানকে গ্রাস করে চলেছে, ভবিষ্যৎ দেখতে

দেখতে বর্তমানে এসে পৌঁচেছে ; তার দিকে মনঃসংযোগ করতে না করতেই দেখি সে অতীতের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

ডাকঘরেও যদি বলি এই পথের কথাই বলেছেন, তাহলে ভুল হবে না। এসময়ে কবির ভিতর একটা বড়ো রকম আত্মিক সংগ্রাম চলেছিল কোথাও বের হবার জন্য। ঘরের মধ্যে বসে অমল ডাক শুনছে দূরের—অতিদুরের, কল্পনায় সে পথ কেটে চলে যায় দূরে, অতিদূরে। ঘরে বসে জানালা দিয়ে যে দূরকেই দেখছে, পথ দিয়ে কে যায় আসে সে চোখ ভরে দেখে নেয়। পথে বের হবার জন্য অমলের মন সদাই চঞ্চল।

ওগো সুদূর বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার সেকথা যে যাই পাসরি॥

অমলের কক্ষে রুদ্ধ দুয়ার ; তাই ঠাকুরদা এসে তাকে হংসবলাকার মানসসরোবরলোকে নিয়ে চলেন, মন পথে পথে চলে, সে পথ চোখ দিয়ে দেখা যায় না ; সে পথ পদচারণাদ্বারা পরিক্রমণ করতে হয় না ; সে মানসলোক বিহার।

রাজা নাটকের বসন্ত-উৎসবে লোকে পথে বের হয়েছে রাজাকে দেখবার জন্য ; রাজারা এসেছেন দূর দূরান্তর থেকে সুদর্শনা রানীকে দেখতে। সমস্ত সংগ্রাম, যুদ্ধাদির পর সকলেই পথে বের হয়েছেন, সেই পথেই সবাই সবাইকে পেল, রানীর সঙ্গে রাজার মিলন হল পথেই। রাজা একবার বলেছিলেন এই জনতার মাঝ থেকে তাঁকে চিনে নেবার জন্য, সুদর্শন চেয়েছিলেন তাঁর অন্ধকারের রাজাকে আলোকের মধ্যে দেখবার জন্য। কিন্তু রূপ নাহি ধরা দেয় ; বৃথা এ প্রয়াস।

ডাকঘর ও রাজার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক, রাহস্যিক ও সিম্‌বলিক তত্ত্ব রয়েছে, তার আলোচনা এত হয়েছে যে তার পুনরুক্তির প্রয়োজন, জীবনতর পথ চলার তত্ত্বকথা এই নাটকগুলির মধ্যে খুব স্পষ্ট করেই পাচ্ছি।

ফাল্গুনী নাটক বলাকা কাব্যপর্বে রচিত। তাই বলাকার মধ্যে যে

চলার বেগ পাই, সেটাই নাটকে রূপ নিয়েছে নবযৌবনদলের পদযাত্রার অভিযানে। সেখানে তারা বলে 'চলি গো চলি গো যাই গো চলে'। 'বলাকা'র কবিতাটি স্মরণীয় 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।' যে আছিকালের বুড়োর সন্ধানে তারা পথে পথে ঘুরছে, তাকে পেল অন্ধ বাউলের সাহায্যে ; যে গান গেয়ে পথ দেখতে পায়।

মুক্তধারা নাটকের নামই ছিল প্রথমে 'পথ'। পথ মোচনের জন্যই যেন অভিজিতের জন্ম। সুতরাং নাটক তার মূল নামের দ্বারা সার্থক হয়েছে।

রক্তকরবীতে পথের ধারেই ঘটনা ঘটছে। নন্দিনী পথে পথে খুঁজছে রঞ্জনকে ; বিশুপাগল পথে পথে গান গেয়ে গেয়ে বেড়াচ্ছে। রাজার দ্বার রুদ্ধ, তাঁর পথে বের হবার উপায় নেই, আপনার কর্মজালে আপনি বন্দী। কিন্তু একদিন সেই জাল ছিঁড়ে রাজাকে পথেই বের হতে হল। গতির অর্থই বিপ্লব, যা আছে তা থেকে নড়তে গেলেই পরিবর্তন হবে স্থানে ও কালে। অভ্যস্ত জীবনের অবসান ঘটাতে হলে বাঁধাপথ ও বাঁধাবুলির জাল ছিঁড়ে বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে।

যুগে যুগে কেন, প্রতি মুহূর্তেই মানুষ এগিয়ে চলেছে। মানবাত্মারই কেবল এই অতৃপ্তি, সে নিরন্তর বলছে, 'আগে চল, আগে চল ভাই, পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে, বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।'

মানুষের সঙ্গে অন্য জীবের এইটেই মস্ত বিভেদ। ইতর প্রাণী পুনরাবৃত্তিদ্বারা অমর হয়ে আছে। লক্ষ বৎসর পূর্বেও পিপীলিকা যেভাবে ঘর বানাত, বানর যেভাবে বাস করত, তার পরিবর্তন হয় নি। মানুষই নিরন্তর চলেছে, এখনও চলেছে। যে থামলে, সেই মরলো। রবীন্দ্রনাথ এই চলার গান গেয়েছেন জীবনভর, বলেছেন বারে বারে 'আগে চল আগে চল ভাই।'

রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকেন খাঁটি ইউরোপীয়ান আঙ্গিকে। তাই তাঁর ছবি বুঝতে হলে প্রথম জানতে হবে আধুনিক ইওরোপীয় ছবির আসল সমস্যা ও উদ্দেশ্য কী।

একজন ইওরোপীয় প্রসিদ্ধ শিল্পী একবার তাঁর সমসাময়িক ভাস্কর্য সম্বন্ধে বলেছিলেন যে এই মূর্তিগুলি যদি পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া যায় তবে হয়ত ভেঙেচুরে কিছু প্রাণ আসে। অর্থাৎ ইওরোপের শিল্পের অবিমিশ্র সত্যের প্রকাশ হয়েছিল আদিম যুগেই। তখন শিল্পের উপর সভ্যতার আবরণ দেবার চেষ্টা হয়নি, ঝোঁক পড়েনি ফটোগ্রাফিক ফাইডেলিটির দিকে। বিষয়বস্তুর সামান্য লক্ষণ যে আবেগ জাগায় তাকে নগ্নভাবে প্রকাশ করাই ছিল উদ্দেশ্য। ফলে কোনো গুহায় প্রাগৈতিহাসিক ছবিতে যখন দেখি একটা ঘোড়া আঁকা হয়েছে, বুঝি যে ওটা ঘোড়াই, কিন্তু ঘোড়া বা ওই ঘোড়ার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার মত নিখুঁত বর্ণনা তাতে নেই। অর্থাৎ ঘোড়ার মূল কথাটা আছে শুধু। তারপর সভ্যতা যত এগুতে লাগল তত ঝোঁকটা পড়ল রিয়ালিজম-এর দিকে। মানুষ নিজের নগ্ন দেহ নিয়ে কুণ্ঠা পেল, খুঁজল আবরণ ও আভরণ, আর তাতে প্রত্যহই বাড়তে লাগল কৃত্রিমতার বোঝা। শিল্পীও ঠিক একই ভাবে নগ্ন ভাবাবেগে কুণ্ঠা বোধ করতে লাগলেন ; নিখুঁত করার চেষ্টা, পালিশ করার চেষ্টা, এদিকেই পড়ল নজর। পালিশ হল, কিন্তু প্রাণটা প্রায় চাপা পড়ল। গঠন বা গড়নটা গেল হারিয়ে। সভ্যতার বিড়ম্বনায় শিল্প হাঁপিয়ে উঠল। আজকের শিল্পীরা তাই অভিযান সুরু করেছেন এই রিয়ালিজম্‌এর বিরুদ্ধে। পালিশ ছাড়ো, প্রাণের দিকে নজর দাও, এই হল তাঁদের কথা।

প্রাগৈতিহাসিক ছবির সঙ্গে তা হলে কি আজকের শিল্পের কোনো তফাৎ নেই ? আছে নিশ্চয়ই, কারণ শিল্পের এই হলো

ইতিহাস, এর উদ্দেশ্যে ভ্রান্তি থাকলেও এটা সম্পূর্ণ অনর্থক নয়। কারণ, একদিক থেকে এর প্রকাণ্ড একটা শিক্ষামূলক মূল্য আছে। প্রাগৈতিহাসিক ছবি ছিল অবচেতনার স্তরে; তখনকার শিল্পীরা যে সত্যের আভাস পেয়েছে তা নিতান্তই আকস্মিক। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে কোনো মূর্তি যদি প্রাণের সন্ধান পায় সেটাও হবে আকস্মিক। এই অবচেতনা ও আকস্মিক-সত্যকে চেতনার স্তরে আনা হল আধুনিক শিল্পীর উদ্দেশ্য, এবং এই সচেতন করার ব্যাপারে প্রায় অনিবার্য প্রয়োজন শিল্প ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ শিল্প যতদিন রিয়ালিজম-এর ভ্রান্ত মোহে ঘুরেছে ততদিন ধরে ঘোরার ব্যাপারে অনেক অনিবার্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল, যেমন ড্রইং রং বা সামঞ্জস্যের দিক্। একমাত্র এই অভিজ্ঞতার জোরেই প্রাগৈতিহাসিক শিল্পের উদ্দেশ্যকে অবচেতনের স্তর থেকে চেতনার স্তরে আনতে পারা যায়। তাই দেখতে পাই আজ ইওরোপে যাঁরা প্রাগৈতিহাসিক ছবির দিকে ঝুঁকেছেন তাঁরা প্রায়-সকলেই প্রথমে কী পরিশ্রম করেছেন রিয়ালিস্টিক ছবির আঙ্গিককে দখল করতে; অথচ মজার কথা, উদ্দেশ্য এই রিয়ালিস্টিক ছবিকেই ভাঙা, পিকাসো, মাতিস, সকলেরই; হবেই বা না কেন? আইন অমান্য যিনি করতে চান তাঁকে ত প্রথম হতে হবে আইনের ব্যাপারেই পাকা।

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে কিন্তু ভারি একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। তাঁর শিল্প-ইতিহাসের মধ্যবর্তী স্তরগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই। এক্ষেত্রে পতন প্রায় অনিবার্যই হয়, কিন্তু সব চেয়ে বড় বিস্ময় তা হল না। তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি দেখে বোঝার উপায় নেই যে তিনি এদিকে নব আগন্তুক মাত্র। তাঁর এই অভিজ্ঞতার অভাব ঢাকা পড়ার একমাত্র ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাই তাঁর কল্পনার অসামান্য ছন্দোময় শক্তিতে। রেখার কথা, রং-এর কথা সবই তিনি আয়ত্ত করেছেন এই কল্পনার শক্তিতেই; অনভিজ্ঞতার ত্রুটি খুঁজতে যাওয়া সেখানে বিড়ম্বনা মাত্র। তাই বলে কল্পনার

প্রাবল্য সব সময় সমান সজাগ থাকে না, এবং দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কখনো কখনো হয়তো তাঁর অনভিজ্ঞতা মাথা তুলতে পেরেছে। যেমন ধরুন তাঁর "খাপছাড়া"র কয়েকটি ছবিতে সমস্তটা একভাবে আঁকার পর নাক বা চোখের বেলাও টান দিতে গিয়ে তিনি সাধারণ রিয়ালিস্টিক আঁচড় দিয়ে বসলেন। অবশ্য কোনো শিল্পীর আলোচনায় তাঁর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নিয়েই আলোচনা করা উচিত। এবং রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলিতে বলিষ্ঠ কল্পনার পাহারায় অনভিজ্ঞতা কাছ ঘেঁষতে পারে নি।

তাছাড়া রিয়ালিজম্-এর এই যে ছোঁয়াচ তা কি আধুনিক ইওরোপীয়ান্ শিল্পই সম্পূর্ণ এড়িয়ে আসতে পেরেছে? আমার ত মনে হয় আজও তা পারে নি। পিকাসোর কথাই ধরা যাক। কত ভাঙাচোরা করছেন তিনি, কত প্রাণপণে যুঝছেন ডাইমেশনের সঙ্গে। কিন্তু রিয়ালিজম্-এর ছোঁয়াচ থেকেই যাচ্ছে। দেগাস্ একবার তাঁর চেয়ে আধুনিকদের প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে বলেছিলেন "এঁদের নতুনত্ব কই দেখেছিনে কিছু। আমি না-হয় আঁকতে চেয়েছি আস্ত একটা পেয়ালা আর এঁরা সেই আস্ত পেয়ালাই আঁকবেন ভেঙেচুরে। নতুনত্ব কোথায় তা হলে।" কথাটা অনেকখানিই সত্যি। সত্যি বলতে, সেকেলে রিয়ালিস্টিক চিত্রকলায় ও অতি আধুনিক ইওরোপীয় চিত্রকলায় দৃষ্টির কোনো তফাৎ নেই। আমার মনে হয় চীন বলুন, জাপান বলুন, সারা জগতে শিল্পীর দৃষ্টি একই, ব্যতিক্রম শুধু ভারতীয় শিল্পে। রিয়ালিজম্-এর ছোঁয়া এভাবে আর কেউ কাটাতে পারে নি। পুরাণের একটা ভাবছবি ধরুন না—জটায়ুর সঙ্গে বাস্তব পাখীর কোনো সম্পর্ক নেই, এর জন্ম-ইতিহাসও অদ্ভুত, সেখানেও রিয়ালিজম্-এর ছোঁয়াচ এসে পড়ে নি। কিন্তু জটায়ু ব'লে একেবারেই চিনতে পারেন না কি? পারেন নিশ্চয়ই, কিন্তু এ হল চিন্তারাজ্যের পাখী, রিয়ালিজম্-এর ছোঁয়াচ একেবারে নেই। আমার ত মনে হয় যেদিন আধুনিক শিল্পী শিল্পসাধনার বিভিন্ন স্তরের অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগিয়ে পৌরাণিক জগতের নিশ্চয়তা ও স্বাচ্ছন্দ্যে আঁকতে

পারবেন, সেদিনই আধুনিক ইওরোপীয় শিল্পের আদর্শ পরিপূর্ণ হবে। আমার বিশ্বাস আজ শিল্প এই রকমই কোনো পৌরাণিক জগৎ সৃষ্টি করার দিকে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথের ছবিকে শ্রদ্ধা করি তার শক্তির জন্য ছন্দের জন্য, তার মধ্যে বৃহৎ রূপ-বোধের যে আভাস পাই তার জন্য। আজকাল আমাদের দেশে এ ধরনের ছবির বিরুদ্ধে ভীষণ আপত্তি শুনতে পাই, এতে নাকি অ্যানাটমির অভাব। আমার কিন্তু মনে হয় আজকালকার কোনো ছবিতে অ্যানাটমি বোধ যদি সত্যই থাকে তা হলে শুধু এই ধরনের ছবিতেই আছে। কারণ ছবির পক্ষে অ্যানাটমির তাৎপর্য কতটুকু? এ শাস্ত্র শিল্পীকে দেহের সম্বন্ধে খবর দেবে, এর বেশী আর কী? শরীরের পক্ষে হাড়ের প্রধান উদ্দেশ্য দেহটাকে নেতিয়ে পড়তে না দেওয়া, খাড়া রাখা, সতেজ আর মজবুত রাখা। আলোচ্য শিল্পেই কি এই সতেজ ভাব সবচেয়ে বেশী বর্তমান নয়? রবীন্দ্র-নাথের আঁকা মানুষ যখন দেখি তখন মনে হয়না সেটা এখনি নেতিয়ে পড়বে, মনে হয়না হাওয়ায় দুলছে যেন। স্পষ্ট দেখি মানুষটার ওজন আছে, সতেজ শিরদাঁড়া আছে। রবীন্দ্রনাথের ছবি যে শক্তিশালী তা এই হাড়ের জোরেই, ছন্দগঠনেই। আমার মতে গত দু'শ বছর ধ'রে, রাজপুত আমল থেকে আজ পর্যন্ত, আমাদের দেশের ছবিতে যে-অভাব বেড়ে চলেছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই অভাবের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করতে চান, ছবির জন্যে খোঁজেন সতেজ শিরদাঁড়া।

রবীন্দ্রনাথের ছবিতে বৃহতের প্রকাশও আমার খুব বিস্ময়কর মনে হয়। কী বলতে চাই বোঝাতে হলে দুটো ছবির তুলনা করা ভাল। ধরুন দু'জন শিল্পী একটি মেয়ের ছবি আঁকতে চান নিছক কল্পনা থেকে অর্থাৎ দুজনেই আঁকতে চান না-দেখা মানুষ। একজন এই না-দেখাকে আঁকছেন নিতান্ত ঘরোয়া করে নিয়ে, কল্পনার প্রসার সেখানে নেই। আর একজন মেয়েটিকে আঁকছেন, তাও না দেখেই কিন্তু তাকে দেখার গণ্ডীর ভিতরে টেনে আনার কোনো চেষ্টাই নেই।

কল্পনার উন্মুক্ত প্রসার স্পষ্ট ধরা পড়ে, বৃহৎ দৃষ্টির পরিচয় পাই। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি। পোর্ট্রেট দেখে দেখে আঁকা হয়, তাই বিজ্ঞানী ব'লে দিতে পারেন মডেল শিল্পীর কত ফুট দূরে কত ইঞ্চি নিচে বসেছিলেন, কোন্ দিক থেকে আলো পড়েছিলো ইত্যাদি। দেখে দেখে যখন মানুষ আঁকি তখন তার মুখ যতক্ষণ আঁকি শুধু মুখই দেখি, আর কিছু দেখি না, আবার দেহের নিম্নাংশ আঁকবার সময় মুখ দেখি না, শুধু নিম্নাংশই দেখি। একই মানুষ দশ ফুট দূরে দাঁড়ালে এক ভাবে দেখি, একশো ফুট দূরে দাঁড়ালে দেখি আর একভাবে, দুশো ফুট দূরে গেলে আবার অন্যভাবে দেখি, কিন্তু সেই মানুষই যখন দৃষ্টির বাইরে চলে যায়, তখনো কি তাকে দেখি না? তখনো তাকে দেখি। দেখি সম্পূর্ণভাবে, তার সেই চোখে না-দেখা ছবিকে আঁকাই ভারতীয় শিল্পকলার বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে সেই বিশেষত্বই ফুটেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও আজকের মানুষ, তাই বিশেষ কোনো পৌরাণিক জগতের স্থিরতা বা নিশ্চয়তা তাঁর নেই। তাঁর ছবিতে এই বিশেষত্ব সেই কারণে তাঁর ব্যক্তিগত কল্পনার লীলাতেই প্রকাশ পায়।

রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে তাঁর সঙ্গে একবার যে আলোচনা হয়েছিল, এখানে তা অবান্তর হবে না। তিনি বলেছিলেন আমার ত আর আর্টস্কুলে পড়া বিদ্যে নেই, ছবি হয়ত সম্পূর্ণই হয় না। আমি বললুম, এগার বছর স্কুলে পড়েও ত দেখি ছেলে অনেক সময় মুখ্যুই রইল। এদিকে আবার কোনোদিন স্কুলের কাছ ঘেঁষেনি এমনি ছেলের মুখেও জ্ঞানের কথা শুনি—ছবির বেলায় আপনারও হয়েছে তাই।

সাহিত্যে তখন তাঁর জগৎজোড়া সুনাম, ধর্ম-রাজনীতি-সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তাশীল বলে তিনি পরিগণিত, শিক্ষাবিষয়ে তাঁর দুঃসাহসিক নিরীক্ষা দেশবিদেশের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এবং গানে-গানে তিনি জয় করেছেন জনগণের হৃদয়। ঠিক এই সময়ে গুরুদেব সুরু করলেন ছবি আঁকতে। তাঁর চিত্রকলার অন্তরমহলে যাঁরা প্রবেশ করতে চান, তাঁদের এই কথাটি মনে রাখা দরকার।

বয়স সত্তরের সীমা ছুঁয়েছে, গুরুদেব হাতে তুলে নিলেন চিত্রকরের তুলি। সাহিত্য-সংগীতের সিদ্ধ শিল্পী তিনি, জেনেছেন সামঞ্জস্য ও নির্বাচনের আন্তরতথ্য এবং গতি ও যতির সার্থক মূল্য। শিল্পের পক্ষে এই গুণগুলি অপরিহার্য, যা (জনৈক ইংরেজ সমালোচকের ভাষায়) 'প্রত্যক্ষ ও অবিচ্ছিন্ন দৃষ্টি'-র পরিপোষক, যার সাহায্যে স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। নট ও নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের এই সাধারণী-কৃতির ক্ষমতা প্রচুর ছিল। সুতরাং তুলি হাতে নেবার আগেই শিল্পী তিনটি অপরিহার্য গুণ আয়ত্ত করেছিলেন—ছন্দের চেতনা, সামঞ্জস্যের চেতনা, আত্মলীনতার চেতনা।

স্রষ্টার মনের আকাশে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত চিন্তার দল ভেসে আসে, একটি সুবিহিত ভাবনায় গাঁথা প'ড়ে তারা আকার নেয়, সুন্দর হয়। মানস বক্তব্য যখন রূপসী হতে চায় তখন এই গ্রন্থনার ভেতর দিয়েই তাকে আসতে হয়; এর অভাবে ছন্দিত চরণ পরিণত হয় অর্থহীন সশব্দ বাক্যে। আবার, শিল্প-কর্মমাত্রেই নিরুদ্দেশ্য, তাকে প্রাণদান করে শিল্পীর প্রতিভা। গুরুদেবের চিত্রকলার রূপায়ণের পশ্চাতে সদাসক্রিয় ছিল শিল্প-হৃদয়ের ঐ মালাগাঁথা এবং প্রতিভার এই দীপ্ত স্বাক্ষর।

গুরুদেব প্রথম যৌবনে ছবি আঁকার চেষ্টা একবার করেছিলেন।

সেসব ছবি, আমার মনে হয়, খুঁজলে এখনও পাওয়া যেতে পারে। তবে পাকাপাকিভাবে ছবির হাতে ধরা দিলেন একেবারে সত্তরের সীমানায় এসে। সকলেই জানেন, কোনরকম অপরিচ্ছন্নতাই তিনি পছন্দ করতেন না, রচনার কোন অংশ কাটতে হলে পরিচ্ছন্নভাবে তার ওপর ঘন কালি লেপে দিতেন। ক্রমশঃ দেখলেন—ঐ অবগুণ্ঠিত কাটাকুটিগুলির মধ্যে ছন্দের বেশ একটা আদল ফুটে উঠেছে এবং ওদের এখানে-ওখানে একটু আধটু কলমের আঁচড় দিলেই সেগুলি আকার নিচ্ছে, ফুল পাখী কিংবা জন্তুর রূপ ধরছে। এই ভাবে ছবি আঁকার তাগিদ এল মনের মধ্যে এবং ধীরে ধীরে তা রূপ নিল রীতিমত্যো চিত্রশিল্পায়নে।

ছন্দ কবিতার সম্পদ, কিন্তু কেবলমাত্র কবিতারই সম্পত্তি নয়। সব শিল্পেরই একটি ক'রে নিজস্ব ছন্দ আছে, যা না থাকলে তারা সার্থক হ'তে পারত না। ছবির যে সৌন্দর্য তাও বিভিন্ন ছন্দের সমীকরণের ফল। প্রয়োজন অনুযায়ী ছন্দের অদলবদল হয়, শিল্পী নতুন নতুন পন্থায় সমন্বয়ের পথ খুঁজে ফেরেন। আত্মপ্রকাশের জন্যে ছন্দের একটি স্বগত শক্তি থাকা দরকার, তা তার প্রাণশক্তি। গুরুদেবের ছবিগুলিতে ছন্দের এই প্রাণশক্তি দুর্মর বলিষ্ঠতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য ক্রমস্ফূত জীবনের ঘনিষ্ঠ সহচারিতা, যে জীবন ক্লান্তিতে শীর্ণ নয়, সংগ্রামশক্তিতে উজ্জীবিত। তাঁর রেখা ও রঙের বিন্যাসে অবসাদ তাই অনুপস্থিত। এক আশ্চর্য সজীব প্রাণময়তা ছবিগুলির সহজাত গুণ। ভারতীয় শিল্পে এটি তাঁর একটি বিশিষ্ট অবদান।

রবীন্দ্রনাথ আজীবন প্রকৃতিকে ভালোবেসেছেন, তাকে দেখেছেন নানা রূপে, জেনেছেন নানা রসে। আকারের অন্তরে যে গোপন বিদেহী সত্তা, তাকে তিনি সহজেই ছুঁতে পারতেন। যখনই ছবি আঁকতে বসতেন, অবিচ্ছিন্ন ভাবনা স্বতঃ জন্ম নিত তাঁর মনে, সঙ্গে সঙ্গে 'কলম' চলত সেই অরূপ ভাবকে রেখা-রঙের রূপে অনুবাদ করতে (এখানে 'কলম' শব্দটি সচেতনভাবেই প্রয়োগ করেছি ;

গুরুদেব তুলি ব্যবহারই করতেন না, ছবিতে রঙ লাগাতেন প্রায়ই জোব্বার হাতার কোণ দিয়ে)। এইভাবে সিদ্ধ শিল্পীর প্রতিভায় রূপ আর অরূপ অভেদে মিলে গিয়ে সমন্বয়ের সৃষ্টি করেছে।

অনুতাপের প্রত্যয়ান্ত চেতনাও তাঁর ছবির একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য, যার ফলে সংস্থাপনা ক্রটীহীন হয়ে উঠেছে। শিল্পগত সামঞ্জস্যের এই আনুপাতিক বিন্যাস কখনও লৌকিক পদ্ধতি অবলম্বন করে, কখনও বা কলাসমৃদ্ধ আলংকারিক রীতিকে আশ্রয় করে। চিত্রকর যখন হাতী আর ছাগলকে যথাযথ ও পাশাপাশি এঁকে তাদের আনুপাতিক আয়তন বোঝাতে চান, তখন তিনি সাধারণ পদ্ধতিরই অনুসরণ করেন। আলংকারিক রীতিতে অনুপাত যথাযথ থাকে না; কারণ তাঁকে একটি নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে বিভিন্ন মাত্রার আকারকে রূপ দিতে হয় এবং শিল্পের প্রয়োগগত ঐতিহ্যকে মেনে চলতে হয়। আর চিত্রকর যখন 'গ্রোটেসক্' বা অদ্ভুতের রাজ্যে প্রবেশ করেন, তখন তাঁকে এক বিশেষ ধরনের রীতি গ্রহণ করতে হয় এবং আয়তনের অনুপাতকে ইচ্ছে করেই বিস্রস্ত করে দিতে হয়। কারণ তাঁর লক্ষ্য—অদ্ভুত রস সৃষ্টি। গুরুদেবের অনেক ছবি এই গ্রোটেস্ক্-এর বর্ণাঢ্য দৃষ্টান্ত। রঙে-রেখায় এগুলি যেমন অদ্ভুত রসের ব্যঞ্জনা, তেমনি শিল্পসুন্দর সৃষ্টি। বলা বাহুল্য, এখানেও তাঁর শিল্পী-মানসের বলিষ্ঠতা, জীবননিষ্ঠা এবং অনুপাত-সামঞ্জস্যের সর্বাঙ্গীন চেতনা বিদ্যমান।

গুরুদেবের চিত্রকলা, তার রীতি সবই তাঁর নিজস্ব, তবু তা ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুগত। আমাদের ধ্রুপদী সাহিত্যে ধ্বনি-ব্যঞ্জনাই মুখ্য, শব্দ ও অর্থের স্থান গৌণ; আমাদের ধ্রুপদী শিল্পেও রেখা ও রঙের স্থান দ্বিতীয়, ছন্দসুষমার রসের ব্যঞ্জনা আনাই তার মৌল লক্ষ্য। পাশ্চাত্য দেশে আর্টের সৃষ্টি হয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে, এবং অনুপাতের সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা হয় গাণিতিক নির্ভুলতায়। পাশ্চাত্যের চিত্র আলোছায়ার মায়ায় তিন মাত্রার। ভারতীয় কলার

রাজ্যে দু-মাত্রার ছবিই বেশি। গুরুদেবের অঙ্কনপদ্ধতি এই দ্বিমাত্রিক ধারার।

অন্যত্র আমি বলেছিলাম, ‘গুরুদেবের ছবি বস্তুর অনুকৃতি না হয়েও বাস্তব’। কথাটা বোধ হয় একটু পরিষ্কার করা দরকার। পশ্চাত্যের চিত্রকর আঁকার বিষয়টিকে নিখুঁতভাবে রূপ দেন। কিন্তু তথ্যের মূলে যে সত্য আছে, তাকে ধরিয়ে না দিলে তো শিল্প হয় না। ত্রুটীহীন কৌশলে, নির্ভুল হিসেবে এবং শারীর সংস্থানের যথাযথ অনুপাত বজায় রেখে একটি সিংহের ছবি আঁকা হল; কিন্তু শরীরের জন্যে সিংহ তো সিংহ নয়, তার ‘সিংহত্ব’ রাজসিকতা-শক্তি-নির্ভয়তার সমাহারে। এগুলিই যদি প্রকাশ না করা গেল, তার ছবিটি সিংহের বিশ্বস্ত প্রতিকৃতি হয়েও শিল্প হল না। প্রাচ্য শিল্পী ঐ ‘সিংহত্বের ভাব’টিকেই রূপ দিতে চান, তার অবয়ব-সংস্থানকে নয়। তাঁর আঁকা সিংহ বাস্তবের অনুকৃতি না হতে পারে, তবু তা সিংহেরই ছবি বলে মনে হবে। গুরুদেবের ছবিও এই জাতের—দেহের প্রতিকৃতিমাত্র নয়, অমূর্ত ভাবের দ্যোতক। অনেক শ্রম এবং অনুশীলন করে তবেই শিল্পী দেহের অন্তরালে এই বৈদেহী ভাবকে অনুভব ও প্রকাশ করতে পারেন। আগেই বলেছি, প্রাক্-চিত্রকলা পর্বে রবীন্দ্রনাথ ছন্দ ও বিমূর্ত ভাবকে স্বগত করেছিলেন, সেই অধিকার-নামা তাঁর ছবিতেও। এই দিক থেকেই তাঁর চিত্রকলাকে আমি বলেছিলাম বস্তুর অনুকৃতি না হয়েও একান্ত বাস্তব।

চিত্রশিল্পের পাঁচটি অঙ্গ, সব মিলে তার অখণ্ড রূপ ভাব—কারু-শৈলী—সুষম সমতা—প্রয়োগ-পদ্ধতি—জীবনময়তা। বিচারের প্রয়োজনে এদের বিশ্লিষ্ট করে নিতে হয়; ছবিতে এরা এমনভাবে পরস্পর মিলেমিশে থাকে, এদের কার যে কোথায় সুরু আর কার যে কোথায় শেষ, তা ধরা বা বলা যায় না। শিল্পীর মনে প্রথমে একটি ভাব জাগে, তারপর তিনি তাকে রূপ দিতে বসেন। সব দেশেই শিল্পায়নের এই রীতি। কিন্তু গুরুদেব প্রথমেই আরম্ভ করতেন রূপ দিয়ে, তাঁর কল্পনালোকে ভাব তখনও

অনাগত ; দেখলে মনে হত, তিনি বোধহয় স্থাপত্যের কোন আল্পনা নিয়ে খেলা করছেন, কিংবা রঙ মেলাবার পরীক্ষায় মেতেছেন ; কিন্তু যখন শেষ করলেন, দেখা গেল—সমস্ত রচনাটি একটি সুস্পষ্ট আকার নিয়েছে। প্রাণ পেয়েছে। এক আশ্চর্য শিল্প হয়ে উঠেছে। অনুশীলন তিনি কোনদিন করেন নি। প্রয়োজনীয় রীতি কৌশলের ধার দিয়েও যান নি ; অথচ যা সৃষ্টি করেছেন, তা কোনমতেই অবাস্তব খেয়ালখুশি হয় নি। একমাত্র তাঁর পক্ষেই এমনটি সম্ভব ছিল। বিষয়কে তিনি অবহেলা করেন নি, তাকে অতি প্রাধান্যও দেন নি। আবার ছবি আঁকতে-আঁকতে শিল্পীর চিত্তে যে ভাব-রসের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়, তাও তিনি সমভাবে আস্বাদন করেছেন।

গুরুদেব একবার আমাকে বলেছিলেন ঃ সত্যের অন্তরে এমন একটি আকর্ষণী শক্তি আছে, যা অমোঘ সুচিরস্থায়ী। অপ্রাকৃত তার অভিনবতার জন্যে আমাদের মনকে টানে বটে কিন্তু তার মধ্যে সত্য যদি না থাকে, তবে সেই মোহ স্বল্পায়ু হয়। গুরুদেবের অদ্ভুত-রসাত্মক ছবিগুলি যে আমাদের মনোহরণ করে এবং কালপ্রবাহেও তাদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কমে না গিয়ে বেড়েই চলেছে। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে—ওগুলির মধ্যে সত্য আছে। সে সত্য বস্তুর অনুকৃতি বা বৈজ্ঞানিক পরিমিতিবোধ নয়, সজীবতায় ও সরসতায়, যা প্রাচ্য-শিল্পীর স্বধর্ম।

আমাদের প্রাচীন চিত্রলিপির বর্ণোজ্জ্বলতা আজও অম্লান, পশ্চিমের চিত্রলেখার মতো ধূসর নয়। গুরুদেবও তরল উজ্জ্বল জার্মান রঙ পছন্দ করতেন। ইউরোপের চোখ তাঁর ছবির এই উজ্জ্বল গাঢ়তায় মুগ্ধ হয়েছিল। পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ ও সমৃদ্ধ বর্ণজ্ঞান তাঁকে দিয়েছিল সুসম বর্ণ-বিন্যাসের শিল্পচেতনা। রঙ মেলানোর ক্ষেত্রে কখনও কখনও তিনি দুঃসাহসেরও পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন বোধের দুটি গাঢ় রঙ-কে (গাঢ় নীল ও গাঢ়তর কালো) পাশাপাশি এনেছেন। এবং সেখানেও প্রয়োগ এতো নিখুত হয়েছে যে, দুয়ে মিলে এক অপরূপ সমন্বয়ের সৃষ্টি করেছে

অপ্রসাধন এবং প্রকাশের বলিষ্ঠতার জন্যে গুরুদেবের ছবিকে আদিম শিল্পের স্বজাতি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু শ্রেণীর দিক থেকে এগুলি আধুনিক ও বুদ্ধিজীবিত। তাঁর শিল্পসৃষ্টির মূলে যে জীবনায়ন সক্রিয় ছিল, তা একালীন সংস্কৃতি, রুচি ও মননে সঞ্জীবিত, আদিমতার স্পর্শ বা আভাস তাকে দিয়েছে বলিষ্ঠ শক্তিময়তা।

গুরুদেবের স্বরচিত ভাষ্য তাঁর চিত্রকলা অনুধাবনের সবচেয়ে বড়ো সহায়ক। চিত্রলিপির ভূমিকায় তিনি বলেছেন : "লোকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে, আমার ছবির অর্থ কী। আমার ছবিরা যদি এর উত্তর না দিয়ে থাকে, তবে আমিও নিরুত্তর। তাদের সার্থকতা প্রকাশে, অর্থবহনে নয়, তাদের পিছনে কোন চিন্তানীয় বক্তব্যও লুকিয়ে নেই। ওদের যেটুকু দেখা যাচ্ছে, সেইটুকুর কোন মূল্য যদি থেকে থাকে, তবেই ওরা টিঁকবে ; নইলে, ভেতরে যতোই নীতিবাগীশ বা বৈজ্ঞানিক সত্য থাক না কেন, ওরা সহজেই বাতিল হয়ে যাবে বিস্মৃতির অগম পারে

রবীন্দ্র-নাটকের অভিনেয় গুণ বিচার করতে হলে রবীন্দ্র-নাটকের ক্রম-বিকাশের ধারা অনুধাবন করতে হবে, নচেৎ তাঁর আদর্শ নাটকে কতখানি প্রভাবিত হয়েছে, তা সম্যকভাবে বুঝতে পারা যাবে না। নাটক হোক, কাব্য হোক, তাকে বুঝতে হলে তার আদর্শ কি, শ্রেণীভাগ কি, এ সম্বন্ধে জানতে হবে। এই জানার মূলেই অভিনেয় গুণ নির্ভর করে। রবীন্দ্র-নাটকের আদর্শ যুগে যুগে বিভিন্ন হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি নূতনের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা করে গেছেন।

১৮৮১ সালে বাল্মীকি-প্রতিভা প্রকাশিত হয় এবং এই সঙ্গে ও পরে কালমৃগয়া, নলিনী, প্রকৃতির প্রতিশোধ ও অনেকদিন বাদে মায়ার খেলা প্রকাশিত হয়। বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া, মায়ার খেলা গীতিনাট্যে বিদেশী মিউজিক ড্রামার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। কেননা, গানের সংলাপে আগাগোড়া এমন নাটক অন্য কারো মধ্যে নেই। সুতরাং গীতিনাট্যের আদর্শে এর অভিনয়রূপ বিচার করতে হবে, নচেৎ ভ্রান্ত হবার ধারণা বেশি। তবে দেশি কথকতার ভঙ্গি এর মধ্যে আছে, পাঁচালির রূপও আছে। মনে হয় দেশি নাট্যরূপের উপর ভিত্তি করেই এই ধরনের নাটক রচিত হয়েছে।

রুদ্রচণ্ড, নলিনী, প্রকৃতির প্রতিশোধ এই তিনটি নাটকের তিন রকমের আদর্শ। রুদ্রচণ্ড ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক ধারার নাটক। শেকস্‌পীয়রের ধারার সঙ্গে এর যোগ বেশি, নলিনী গদ্যনাটক, এই নাটকের আদর্শও রোমান্টিক, প্রকৃতির প্রতিশোধ নাট্যকাব্য বা রিডিং ড্রামা। এগুলো এখনও বিকশিত হয় নি, পরে হয়েছে।

এরপর রাজা ও রানী, বিসর্জন প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই দুই নাটকে তৎকালীন যুগে প্রচলিত শেকস্‌পীয়রীয় ধারাকেই

অনুসরণ করবার চেষ্টা করছেন। এর ফলেই নাটকের অভিনেয় গুণ সেই আদর্শে হওয়া উচিত। কাব্য ব্যতিরেকে শেকস্‌পীয়রীয় নাটক কল্পনা করা যায় না, কাব্যেই তখন সকলের প্রকাশ। সুতরাং তাঁর নাটকে মনস্তত্ত্ব, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান অনেক কিছু থাকলেও সমস্ত মিলে যে কাব্যের প্রকাশ হয়েছে, এটা মনে রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এই সত্য স্মর্তব্য।

এর পরে চিত্রাঙ্গদা, গোড়ায় গলদ, বিদায়-অভিশাপ, মালিনী, বৈকুণ্ঠের খাতা, হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গকৌতুক প্রকাশিত হয়। গোড়ায় গলদ, বৈকুণ্ঠের খাতা, হাস্যকৌতুক ব্যঙ্গকৌতুক নাটকে রবীন্দ্রনাথ কমেডির ধারা অনুসরণ করেছেন। হাস্যকৌতুক শারাড (charade) রীতি ও ব্যঙ্গকৌতুকে স্যাটায়ের রীতি প্রকাশিত। অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি, বিনি পয়সার ভোজ নাটকে সংস্কৃত-ভাণরীতি প্রকাশিত। চিত্রাঙ্গদা, বিদায়-অভিশাপ, মালিনী নাটকে নাট্যকাব্যের ধারা অব্যাহত রয়েছে। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এখানেই তৃপ্তি পেয়েছেন। রবীন্দ্র-নাটকের শ্রেণী-বৈচিত্র্য এখানেই লক্ষিতব্য।

১৯০৮ সাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের নাটকে আর এক বিস্ময়কর ধারার মিলনে অন্য এক অপূর্ব বস্তুর সৃষ্টি হয়। শারদোৎসব, রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন, ফাল্গুনী, গুরু, অরূপরতন, ঋণশোধ, মুক্তধারা, বসন্ত, গৃহপ্রবেশ এই সময়ের শ্রেষ্ঠ ফসল। মুকুল, প্রায়শ্চিত্ত, চিরকুমার-সভা, শোধবোধ নাটক ব্যতিরেকে সব নাটকই রূপক সাংকেতিক ধারার। পাশ্চাত্যের প্রতীকবাদী আন্দোলনের পুরোধা হয়ে যাঁরা কাব্য ও নাটক রচনা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই ধারাকে অনুসরণ করেই বাংলাদেশের নিজের রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই নাটকের মধ্যে ভাব ও ভাবনার চেয়ে সাংকেতচিত্র আবেগই প্রধান। এইরূপ বাংলাদেশের যাত্রাভিনয়ে অনেক পাওয়া যায়। এবং প্রত্যেক নাটকের মধ্যে যে একটি পথের কল্পনা আছে, এ একান্ত বাংলাদেশের নিজস্ব। যেন মিলন-মেলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে সকলে। রবীন্দ্রনাথ নাট্যশিল্পের চরমরূপে তৃপ্ত হতে পারেন নি বলেই তাঁর নাটককে

সংস্কৃতমার্জিত করেছেন। রূপসংকেত নাটকেও এই প্রবণতা লক্ষিত হয়। অচলায়তন ভেঙে গুরু, রাজা ভেঙে অরূপরতন, শারদোৎসব ভেঙে ঋণশোধ নাট্যরূপদান করেন।

বলতে গেলে ১৯২৬ সালই রবীন্দ্রনাথের নাটকের শ্রেষ্ঠ ফসলের যুগ। শোধবোধ, নটীর পূজা, ঋতু উৎসব, রক্তকরবী এই বছরেই প্রকাশিত হয়। ঋতুরঙ্গ, গোড়ায় গলদ ভেঙে শেষরক্ষা; প্রায়শ্চিত্ত ভেঙে পরিত্রাণ এবং রাজা ও রানী ভেঙে তপতী প্রকাশ করেন। চিরকুমার সভা, প্রজাপতির নির্বন্ধের নাট্যরূপ, শোধবোধ কর্মফল গল্পের নাট্যরূপ। চিরকুমার সভা, শোধবোধ, শেষরক্ষা, পরিত্রাণ, তপতী প্রভৃতি নাটকে শেকস্‌পীয়রীয় ও মলিয়েরের ধারাই প্রকাশ পেয়েছে। তবে পাশ্চাত্যের অনুসরণ বর্জন করে রূপান্তরের ভিতর সংস্কৃত বা দেশীয় রীতিকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এই দুই ধারার সঙ্গে মিলেছে রক্তকরবীর মতো রূপক-সাংকেতিক নাটকের ধারা, ঋতুরঙ্গের মত গীতিনাট্যের ধারা এবং ঋতু উৎসবের মতো আবেগ-নাট্যের পালা।

১৯৩১ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথের নাটকে আরেক ধারার মিলন ঘটে। বৃহত্তর ভারত জাভা বলিদ্বীপে ভ্রমণ করে সেখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে যে বাণীহীন নৃত্যনাট্য দেখেন, তাকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৃত্যনাট্যের কাঠামোয় হুবহু রেখেছেন। মঞ্চের পিছনে গাইয়ের দল, অর্কেষ্ট্রা বাদকের দল, মঞ্চের ডান বা বাঁ পাশে একজন আবৃত্তি করছে নাটকের ভাববস্তুটিকে, সেই সঙ্গেই তারই সামনে নাচের দেহভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে ঘটনার রূপ প্রকাশ পাচ্ছে। এ যুগে গীতিনাট্যের ধারাও নৃত্যনাট্যের সঙ্গে বয়ে চলেছে। চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা ও শ্যামাই তাঁর নৃত্যনাট্য। শাপমোচনে নাচ থাকলেও অভিনয় মূক।

রূপক-সংকেত বাস্তব-কমেডি ও গীতিনাট্যের ধারা এ যুগে চললেও নৃত্যনাট্যের প্রাধান্যই বেশি। সব যুগের চেয়ে এ যুগের তত্ত্বের প্রাধান্য, তত্ত্বের শুষ্কতাকে তরলায়িত করেছে রবীন্দ্রনাথের গান। এ যুগে তাই গানের ব্যবহার এত বেশি। রবীন্দ্র-নাটকে গানের প্রয়োগ যথাযথ না হলে রবীন্দ্র-নাটক ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেন না রবীন্দ্রনাথের নাটকের

রূপে প্রত্যক্ষ:জীবনের চেয়ে অপ্রত্যক্ষ ভাবরূপ আদর্শ সব চেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়েছে বলেই গানের সুরে তাকে প্রকাশ করতে হবে। কথা যেখানে শেষ হয়ে যায় সেখানে থাকে নীরবতা, না হয় সুর। রবীন্দ্রনাথ শিল্পী, তাই সুরেই নাটকের প্রকাশ সার্থক হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রথম যুগে কিছু পাশ্চাত্যের ধারা মিশলেও ভারতীয় তথা বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে নিজস্ব করে নিতে চেয়েছেন কবিগুরু। বিদেশী বা শেকস্‌পীয়রের ধারাকে বর্জন করে পরবর্তী জীবনে বাংলাদেশের নিজের রূপকে নিয়ে পরীক্ষা করেন; সঙ্গে নিলেন চীন-জাপান-জাভাবলির নাটকের আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের নাটকে গীতাভিনয় বা যাত্রার আদর্শ চমৎকার ফুটে উঠেছে। এ যাত্রা উনবিংশ শতাব্দীর নয়, অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত গানে গানে মালা গেঁথে, লঘু ত্রিপদীর চৌপদীর আবৃত্তিমূলক সংলাপে যা প্রকাশ পেত, সেই রূপই রবীন্দ্রনাথের আছে। আদি পাঁচালির মধ্যে যে রূপ পাই তার আভাস যেন রবীন্দ্র-নাটকে। কেননা অষ্টাদশ শতকে কথ্য গদ্যভাষা বা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন হয় নি, গান ও ছড়ার আবৃত্তি চলত। সংস্কৃত নাটকের মঞ্চসজ্জা ও আদর্শও তাঁর নাটকে লক্ষ্যণীয়, দৃশ্যমঞ্চের পিছনে কুতপ, সেইখানেই গায়ক, রঙ্গপীঠে অভিনয়, নৃত্য-নাট্য ঋতুনাট্যে এই ভাবরূপ দেখা যায়। চীনে পাশে বাদ্যযন্ত্র ও গায়কের দল বসত, জাভাবলিদ্বীপে নাচ অনুযায়ী গামেলানের চার দিকে বা দু'দিকে গায়ক ও বাদ্যযন্ত্র স্থাপিত হত। এবং দর্শক চতুষ্কোণ হয়ে নাট্য-আনন্দ উপভোগ করত। যাত্রায় বৃত্তাকারে বাদ্য ও বাদকদল স্থাপিত হত। এমনিভাবে প্রাচ্যের সমস্ত ধারা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন, বিস্তীর্ণ টুকরো জিনিসকে নিয়ে নিজের সামগ্রিক সৃষ্টিতে পরিণত করলেন। তিনি যদি আরো কিছুকাল বেঁচে থাকতেন তা হলে পাশ্চাত্যের ধারাকে একেবারে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের নিজের রূপে নূতন করে জাতীয় ধারায় নাট্যকে রূপ দিতে পারতেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে তা আমরা পেলাম না। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে, বাংলা জাতীয় নাট্য-আদর্শ যা নাচগান

ভাব ও আদর্শবাদে প্রকাশিত, তা রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রকাশ পেয়েছে। নৃত্যনাট্যেও সেই আদর্শ অনুসৃত, ভারতনৃত্য কথাকলি মণিপুরী জাভাবলি চীন জাপান থেকে যে নৃত্য নিলেন মনের রূপকে প্রকাশ করবার জন্য, তাকে বাংলার রূপের সঙ্গে একাত্ম করে দিলেন। মাস্ক অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ মুখোশ অভিনয় তাঁর প্রতিভা অনুযায়ী রূপ দিতে পারতেন, জাভাবলিদ্বীপের মুখোশ নৃত্যের সঙ্গে বাংলার মুখোশ নৃত্যের যোগ আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হয়তো ভালো মুখোশ-চিত্রশিল্পী তৎকালে পান নি তাই মনোযোগ দেন নি।

আজকে যে বাংলা নাটক রবীন্দ্রনাথের নাট্যধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণাত্মক ধারায় মিশেছে, তাতে আমাদের স্বরূপ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখনকার নাট্যকারদের মন যেন কাদার, পাশ্চাত্যের নাট্যশিল্পের দেওয়ালে ছুঁড়ে মারলে আটকে গিয়ে তারই ছাপ আনে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মন রবারের বল, ছুঁড়ে মারলে ছোঁয়া লাগিয়ে ফিরে আসে। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবণতার সঙ্গে নাট্যরসিক শিল্পী রাজকুমার Manglunegaran-এর মনন-সাদৃশ্য চমৎকার। তিনি অর্থশালী, হল্যাণ্ডে শিক্ষিত, পাশ্চাত্যধারায় দীক্ষিত, তবু পাশ্চাত্যধারাকে বাদ দিয়ে জাতীয় ধারার জন্য দেশীয় রূপকেই প্রাধান্য দিলেন। তিনি নিজের দেশের ঐতিহ্য অনুযায়ীই pendopo সৃষ্টি করলেন। রবীন্দ্রনাথও সেই পথেই যাচ্ছিলেন, তবে অর্থসংগতির জন্য তা পেরে ওঠেন নি। তবে তাঁর আদর্শও তদ্রূপ। জাভাযাত্রীর পত্রে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রে বলেছেন, 'এক একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক একটি বিশেষ পথ থাকে।' আটান্ন বৎসরের দীর্ঘ সাধনায় নাট্যরূপে বাংলাদেশের সেই বিশেষ পথই অন্বেষণ করেছিলেন। ফরাসী অভিনেতা ও প্রযোজক Autorin Artaud জাভাবলির নাটক সম্বন্ধে যা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের মনেও সেই ভাব এসেছিল, তাকেই বাংলাদেশের নিজস্বরূপে মূর্ত করতে চেয়েছেন। What is in fact most striking in this spectacle—so

well contrived to disconcert our occidental conception of theatre that many will deny it has any theatrical quality, whereas it is the most beautiful manifestation of pure theatre it has been our privilege to see—what is striking and disconcerting for Europeans like ourselves is the admirable intellectuality that our senses crackling everywhere in the close and web of gestures, in the infinitely varied modulations of voice, in this sonorous rain resounding as if from an immense dripping forest, and in the equally sonorous interlacing of movements. There is no transition from a gesture to a cry or a sound, all the senses interpenetrate, as if through strange channels hollowed out in the mind itself, (The Theatre and its Double. p. 57) রবীন্দ্রনাথের নাট্যশিল্পেও এই রূপই আমরা দেখি। রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয় রবীন্দ্রনাথের নির্দেশানুসারেই হবে, সেই আদর্শেই চালিত হবে। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন চিঠিপত্রে ডায়েরি-প্রবন্ধে নাটকের প্রস্তাবনায় তাঁর কল্পিত নাট্যমঞ্চরূপ দিয়ে গেছেন। এই নাট্যমঞ্চ-রূপ কল্পনায় পাশ্চাত্যের এশিয়ার বৃহত্তর ভারতের লোক-নৃত্যের ও নাট্যের এবং বাংলার যাত্রা পাঁচালির আদর্শ এসে মিশেছে। নটীর পূজা নাটকের অভিনয়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ নিজে উপালির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। প্রেক্ষাগৃহ থেকে মঞ্চে উঠে নাটকের ভাবসংযোগ অনুযায়ী নাটকে অংশ গ্রহণ করলেন। জাপানের হানামিচি বা ফ্লাওয়ারীর পথের মধ্যে এই আদর্শ আছে। দর্শকদের মাথার উপর দীর্ঘ সরু পথে চলতে চলতে ফুল ছড়াতে ছড়াতে কোনো গায়ক গায়িকার দল নাটকের দল নাটকের অভিনয়ে যোগ দিলেন অথবা কোনো অভিনেতা মূক অভিনয়ের ভাবে বিভোর হয়ে

মঞ্চে অবতরণ করলেন। এমনিভাবেই তাঁর নাটকের আদর্শ গড়ে উঠেছে।

দেশে দেশে রবীন্দ্র-নাটক অভিনয়, শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্র-প্রেক্ষাগৃহও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত নাট্যমঞ্চ কোথাও দেখি না। যে যেভাবে পারে নাটক অভিনয় করছে, ব্যাখ্যা করছে, ফলে রবীন্দ্রদর্শন, নাট্যদর্শন বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। ভারত সরকারের উচিত ছিল রবীন্দ্রনাথের কল্পিত আদর্শের নির্দেশে রবীন্দ্রনাট্যমঞ্চ স্থাপন করা। কেননা এই নাটক অন্য কোনো মঞ্চে হতে পারে না। বাধ্য হয়ে আপোষের সাহায্যে এমনি সাধারণ প্রচলিত মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটক অভিনয় করেছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রয়োগধারার মধ্যে যে নূতন রূপের ইঙ্গিত রয়েছে, সেই রকম মঞ্চ আজও প্রস্তুত হয়ে উঠল না। পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁর মনে এক অভিনব মঞ্চ কল্পনা এসেছিল, নিজে ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা অভিনয় করিয়েছেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি।

সেই দায়িত্ব কি ভবিষ্যৎ নাট্যরসিকরা নিতে পারেন না?

রবীন্দ্র-কাব্যের অপূর্ব বৈচিত্র্যের কথা বলিতে গিয়া স্বর্গীয় অজিত-কুমার চক্রবর্তী তাঁর "কাব্যপরিক্রমা"র মধ্যে একস্থলে লিখিয়াছেন—"জীবনের সকল রস, সকল অভিজ্ঞতার এমন অবাধ, এমন আশ্চর্য প্রকাশ জগতের অল্প কবির মধ্যে দেখা গিয়াছে!"—একথা খুবই সত্য, এবং আমাদের মনে হয়—অজিতবাবু যদি "জগতের অল্প কবির মধ্যেই দেখা গিয়াছে" স্থলে বলিতেন "জগতের কোন কবির মধ্যেই বোধ হয় দেখা যায় নাই" তাহা হইলেও হয়ত বাড়াইয়া বলা হইত না। বাস্তবিকই পৃথিবীর আর কোন কবির কাব্যে বোধ হয় এত অসংখ্য বিচিত্র সুরের সমাবেশ দেখা যায় নাই। অতি বড় হাল্কা প্রণয় সঙ্গীত হইতে আরম্ভ করিয়া অতি বড় সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ও ভাগবত কবিতা সমান নিপুণতা এবং সমান আন্তরিকতার সহিত পৃথিবীর আর কোন দেশে, কোন যুগে, কোন কবির দ্বারা রচিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

এমন ধারাটা কেমন করিয়া সম্ভব হইল? ইহার মূলে কবি-চিত্তের কোন্ বিশেষ বৃত্তি কাজ করিতেছে? আমার মনে হয়, রবীন্দ্র-কাব্যের মধ্যে এই যে অপূর্ব বৈচিত্র্য, ইহার মূলে রহিয়াছে কবির অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক চিন্তাশীলতা।

আমাদের মনের মধ্যে গোটাকতক বাঁধা-ধরা অনুভূতি স্বভাবতঃ আপনা হইতেই জাগিয়া উঠে। এই সকল স্বাভাবিক অনুভূতির মূলে কবিচিত্তের গভীর আন্তরিকতা থাকিলে এই সকল অনুভূতিজাত কবিতায় অনায়াসে প্রথম শ্রেণীর রসসৃষ্টি হইয়া উঠিতে পারে।—সেদিক থেকে কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সকল স্বাভাবিক গোনাগুন্তি অনুভূতিকে সম্বল করিয়া কোন কবি তাঁর কাব্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মত এত

বিচিত্র, এত বিভিন্ন প্রকৃতির অসংখ্য সুরের আমদানি করিতে পারেন নাই।

অনুভূতি জিনিসটা স্বভাবতঃ পরিবর্তন সহিষ্ণু নয়। একটি বিশেষ অনুভূতি মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিলে তাহা সহজে ছাড়িয়া যাইতে চায় না। তাই অনুভূতি জিনিসটি যে-সকল কবির একমাত্র সম্বল তাঁহাদের কবিতায় গভীরতা বা আন্তরিকতা অনায়াসেই থাকিতে পারে, কিন্তু বৈচিত্র্য থাকা সম্ভব নয়। অনুভূতি জিনিসটি আগাইয়া যাইতে জানে না—জানে নিজের চতুর্দিকে আবর্ত সৃষ্টি করিতে।

এমনি করিয়া এক একটি অনুভূতি নিজের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভিন্ন ভিন্ন আবর্ত সৃষ্টি করিতে থাকে। সুতবাং কেহ কাহারও সহিত মিলিতে পারে না। এই যে এক-একটি ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি নিজের নিজের এলাকার মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবর্ত সৃষ্টি করিতেছে—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কি এমন কোন গোপন পথ নাই যাহাকে অবলম্বন করিয়া এক অনুভূতি হইতে অন্য অনুভূতিতে, নির্দিষ্ট একটি অনুভূতি হইতে অসংখ্য বিচিত্র সূক্ষ্ম অনুভূতিতে গিয়া পৌঁছতে পারা যায়? এরূপ কোন উপায় নিশ্চয়ই আছে। এই উপায়টি আর কিছুই নয় কবির চিন্তাসূত্র। এই যে এক অনুভূতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির অসংখ্য বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়া, ইহার মূলে কবির মনের সূক্ষ্ম চিন্তাধারা অলক্ষ্যে কাজ করিয়া চলিতে থাকে। এক অনুভূতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির আর একটি বিচিত্র অনুভূতিতে পৌঁছিবার মাঝখানে যে-পথ—তাহা চিন্তার পথ। এই পথ যাঁহার কাছে রুদ্ধ, তাঁহার কবিতায় খুব বেশী বৈচিত্র্য আশা করা যাইতে পারে না।

অনেকে হয়ত বলিবেন—একই অনুভূতির মধ্যেই যথেষ্ট বৈচিত্র্য থাকিতে পারে। শুধু নর-নারীর প্রেমের কবিতার মধ্যেই বৈচিত্র্য সৃষ্টি যথেষ্ট করা যাইতে পারে—এবং সেদিক হইতে জগতের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতার মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব কোথায়? একথার উত্তরে আমি বলিতে চাই—এ শ্রেণীর বৈচিত্র্যের কথা আমি বলিতেছি না।

আমি যে-অর্থে "বৈচিত্র্য" কথাটি এখানে ব্যবহার করিতে চাই—সেদিক হইতে নর-নারীর প্রেমানুভূতিতে তাহার অন্তর্গত বিভিন্ন বিচিত্র সুর সমেত একটি মাত্র অনুভূতি হিসাবে ধরিতে হইবে। এবং ইহা হইতে অন্য শ্রেণীর অনুভূতিতে যাইতে হইলে বিরহ, মিলন, মান, অভিমান প্রভৃতি সমশ্রেণীভুক্ত অবস্থাভেদের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবর্ত সৃষ্টি করিলে চলিবে না—যাইতে হইবে সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর অনুভূতিতে। এই দিক হইতে বৈচিত্র্য খুঁজিলে পৃথিবীর খুব অল্প কবির মধ্যেই রীতিমত বৈচিত্র্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

এখন পর্যন্ত আমরা তাহা হইলে দেখিলাম—অন্তর্নিহিত চিন্তাশীলতা না থাকিলে কোন কবির অনুভূতি বিচিত্র সুরে বাজিয়া উঠিতে পারে না। অনেকে হয়ত বলিবেন—রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনও কবির মধ্যে কি চিন্তাশীলতা ছিল না? তাহার উত্তরে আমি বলিতে চাই—নিশ্চয়ই ছিল। প্রশ্ন উঠিতে পারে—তবে এই সকল চিন্তাশীল কবিদের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের মত অত বৈচিত্র্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে—পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর চিন্তাশীল কবি দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর চিন্তাশীল কবি আছেন যাঁহারা চিন্তা এবং বিচারের দ্বারা জীবনের অনেক প্রশ্নের এবং সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিয়া একটা নির্দিষ্ট সত্যে আসিয়া পৌঁছিয়া, তাহার পর সেই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া কবিতা লিখিতে বসেন। এই শ্রেণীর চিন্তাশীল কবিরা কবিতা লিখিবার পূর্বে যত দিক দিয়া যত বিচিত্র ভাবেই চিন্তা করুন না কেন, কবিতা লিখিবার সময় ইহারা যে অনুভূতিকে আশ্রয় করেন তাহা একাধিক বিভিন্ন চিন্তাপ্রসূত একই সত্য। সুতরাং এই সত্য যখন কবির মনের অনুভূতি হইয়া জাগিয়া উঠে তখন তাহা একটি অখণ্ড নির্দিষ্ট অনুভূতি। কাজেই এই সকল চিন্তাশীল কবি যখন অনুভূতিতে আসিয়া পৌঁছান তখন তাহার মধ্যে বিচিত্র সুরের সন্ধান পাওয়া যায় না। চিন্তা যত বিচিত্র হউক না কেন—এই সকল

বিচিত্র বিভিন্ন চিন্তাপদ্ধতি পরস্পরের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা যে-অনুভূতিটিকে সৃষ্টি করে, তাহা একটিমাত্র অখণ্ড অনুভূতি। কিন্তু বৈচিত্র্য ত অনুভূতিতে নয়—বৈচিত্র্য এক অনুভূতি হইতে অপর অনুভূতিতে যাতায়াতের পথের মধ্যে। এই যে এক অনুভূতি হইতে বিভিন্ন অনুভূতিতে যাতায়াতের পথ, ইহা চিন্তার পথ। সুতরাং অনুভূতির সহিত যাঁহাদের চিন্তা জড়িত হইয়া না যায় তাঁহাদের অনুভূতির মধ্যে বৈচিত্র্য খুব বেশি পাওয়া যায় না, চিন্তাশীলতা এবং অনুভূতি পৃথক হইয়া থাকিলে চলে না—একটির সহিত অপটির ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া থাকা চাই।

যে-শ্রেণীর চিন্তাশীল কবিদের কথা এতক্ষণ বলিতেছিলাম, তাঁহাদের চিন্তা যেখানে শেষ হয় সেইখানে অনুভূতির আরম্ভ এবং এই অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়াই ইঁহাদের কবিতা গড়িয়া উঠে—চিন্তার সহিত এই অনুভূতির কোন সম্পর্ক থাকে না। ফলে ইঁহাদের কবিতার মধ্যে অনুভূতি বা আন্তরিকতা যথেষ্ট থাকিতে পারে; কিন্তু বৈচিত্র্য খুব বেশী থাকিতে পারে না।

কিন্তু এ ছাড়া আর-এক শ্রেণীর চিন্তাশীল কবি আছেন যাঁহাদের চিন্তার পালা কবিতা লেখার বাহিরেই চুকিয়া যায় না—কবিতার ভিতর হইতেও নূতন করিয়া উদ্ভূত হইয়া উঠে। প্রথমোক্ত চিন্তাশীল কবিদের চিন্তাধারা আসে কবিতার বাহির হইতে,—তাই ইঁহাদের কবিতার মধ্যে চিন্তার গতিবেগ নাই। শেষোক্ত কবিদের চিন্তা উদ্ভূত হয় কবিতার বুকের ভিতর হইতে। তাই চিন্তার গতিবেগ এই শ্রেণীর কবিতের কবিতাকে কোনদিন একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেয় না—ক্রমাগত সুমুখের পানে আগাইয়া লইয়া চলে। রবীন্দ্রনাথ এই শেষোক্ত শ্রেণীর কবি। তাঁহার কবিতার মধ্যে চিন্তা এবং অনুভূতি একই সঙ্গে কাজ করিতে থাকে। আমরা দেখিতে পাই, যে সকল কবির মধ্যে চিন্তাশীলতা খুব বেশী, তাঁহাদের মধ্যে এই ধারণাটা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, চিন্তাশীলতা কবিত্বের পরিপন্থী। কথাটা আদবেই সত্য নয়। চিন্তাশীলতা কবিত্বের

পরিপন্থী তখনই চিন্তা যখন একাকার হইয়া গিয়া একটি অখণ্ড সুরে বাজিয়া উঠে, তখন একটি অপরটিকে বাধা দেয় না—বরং একটি অপরটিকে হাত ধরিয়া চালাইয়া লইয়া যায়। কবিত্ব বা অনুভূতি সৃষ্টি করে গভীরতা, চিন্তা তাহাতে যোগ করিয়া দেয় সচলতা। গভীরতার মধ্যে মহিমা আছে, কিন্তু বৈচিত্র্য নাই। সচলতা তাহাতে বৈচিত্র্য বলিয়া জিনিসটি যোগ করিয়া দেয়। একস্থানে দাঁড়াইয়া একটি জিনিস গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে পারে না। কূপ যত ইচ্ছা গভীর হইতে পারে, কিন্তু নদীর মত বৈচিত্র্য সৃষ্টি তাহার দ্বারা অসম্ভব। বৈচিত্র্যের মূলে আছে পরিবর্তন এবং পরিবর্তনের মূলে আছে সচলতা। তাই যেখানে সচলতা নাই, সেখানে বৈচিত্র্য থাকিতে পারে না এই হিসাবে, যে-কবির কবিতা যত সচল সেই কবির কবিতার বৈচিত্র্য তত বেশী।

আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সচলতা যতটা পাওয়া যায়—এতটা বোধহয় পৃথিবীর আর কোনও কবির কবিতায় পাওয়া যায় না। রবীন্দ্র-কাব্যের অন্তর্নিহিত এই সচলতাই তাঁহার কবিতা-বল্লীকে এত বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে। "সন্ধ্যা সঙ্গীত" হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত যত কিছু কবিতা রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন তাহাদের মধ্যে যে একটি ক্রমপরিণতির অশ্রান্তধারা নিরন্তর বহিয়া চলিয়াছে, ইহার মূলে অলক্ষ্যে কাজ করিতেছে চিন্তার একটি অদৃশ্য গতিবেগ। অনুভূতি জিনিসটি নিজে হইতে চলিতে জানে না—তাহা কেবল একস্থানে দাঁড়াইয়া আবর্ত সৃষ্টি করিতে পারে। তাহাকে চালাইয়া লইবার জন্য চিন্তার গতিবেগের প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক রসানুভূতির অন্তরালে একটি অন্তর্নিহিত গতিবেগ চিরদিনই কাজ করিয়া আসিয়াছে, এবং চিন্তার এই প্রচ্ছন্ন গতিবেগই তাঁর শাশ্বত অনুভূতিকে চিরদিনই বিচিত্র ভাবে নানান দিকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছে,—একস্থানে দাঁড়াইয়া আবর্ত সৃষ্টি করিতে দেয় নাই।

তাই রবীন্দ্রনাথের খণ্ড খণ্ড অসংখ্য কবিতা আলাদা আলাদা করিয়া পড়িলে তাহাদের বিচিত্র সুর যেমন একদিকে আমাদিগকে মুগ্ধ করে, তেমনি আবার তাঁহার কবিতাবলী শ্রেণী অনুযায়ী পর পর সাজাইয়া পড়িয়া গেলে একটি অখণ্ড ক্রমবিকাশের মহিমা আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা যদি বাহির হইতে আসিত, তাহা হইলে বিভিন্ন-চিন্তাপ্রসূত অসংখ্য বিচ্ছিন্ন অনুভূতির মূর্তি আমরা তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে পাইতাম। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, তাঁহার চিন্তা কবিতার বাহির হইতে আসে নাই— কবিতার ভিতর হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। এক কথায়, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ মনোবৃত্তি হইতেই তাঁর চিন্তাশীলতার জন্ম। তাই সহোদর ভাইয়ের মত একটি অপরটির হাত ধরিয়া ঠিক পথেই চালাইয়া লইয়া গিয়াছে।—তাই চিন্তা এবং অনুভূতির এমন অপূর্ব সমাবেশ বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। তাই এত বৈচিত্র্য পৃথিবীর আর কোন কবির কাব্যে আছে কি-না সন্দেহ।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার খবর আসতে না আসতেই সত্যেন দত্ত কবিতা বানিয়ে প্রবাসীতে ছাপালেন :

জগৎ-কবির সভায় মোরা তোমার করি গর্ব,
বাঙালি আজি গানের রাজা বাঙালি নহে খর্ব।

এই জন্যই বোধ হয় বিপিনচন্দ্র পাল মশাই একসময় মন্তব্য করেছিলেন ইংরাজি এক প্রবন্ধে যে, রবীন্দ্রনাথ যতদিন Hall mark of European approbation পাননি ততদিন দেশের লোক পুরোপুরি তাঁকে গ্রহণ করে নি। এর পরে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে হল হুড়োহুড়ি ও হুজুগ ও জগৎ-কবির সভায় গানের রাজাকে 'বিশ্বকবি' খেতাব উপহার। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে না হলেও তাঁর দেশবাসীর পক্ষে খেতাব যে বিশেষ স্বাস্থ্যকর হয় নি তা এই শতবার্ষিকী উৎসবের গণ্ডগোলে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেননা, বিশ্বকবি কথাটি উচ্চারণ করে আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি সম্বন্ধে এতটা গৌরবান্বিত হয়ে উঠি যে, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আর কিছু যে বোঝবার আছে তা আর মনে করি না। এই বিশ্বকবি খেতাবই আসল রবীন্দ্রনাথকে আমাদের কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছে। কারণ, এটা একটা ভুয়ো খেতাব। বোধ হয় কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন।

যে কোনো যথার্থ কবিকেই অবশ্য বিশ্বকবি বলা যায়, তিনি খুব বড়ো কবি হোন বা না হোন। কেননা কবিতার প্রকৃতিই হল এই যে তা শুধু কাছের নয়, দূরের মানুষেরও মন স্পর্শ করে, যদি ভাষার গণ্ডিটাই বড়ো বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। তা না হলে, বিদেশী কবিতা শিক্ষিত ভারতবাসীর মন এত গভীরভাবে স্পর্শ করত না। রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন যে বিদেশী সাহিত্যের সোনার কাঠির ছোঁয়াচে আমাদের

দেশে সাহিত্যের জন্ম। এই সোনার কাঠির যাদুর প্রভাবেই বাঙালি একদিন উচ্ছ্বসিত হয়ে শেক্সপীয়রের উদ্দেশ্যে লিখেছিল:

ভারতের কালিদাস জগতের তুমি

এবং শেক্সপীয়রকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে রবীন্দ্রনাথও লিখেছিলেন:

দিয়েছ আসন তব সকল দিকের কেন্দ্রদেশে
বিশ্ব চিত্ত উদ্ভাসিয়া।

আর কোন্ দেশের কোন্ কবি আছেন জানি না যাঁর দীপ্ত জ্যোতি তিন শতাব্দী ধরে বিশ্বচিত্ত উদ্‌ভাসিত করেছে। সুতরাং বিশ্বকবি কথাটা যদি নিতান্তই প্রয়োগ করতে হয়, তাহলে তা একমাত্র শেক্সপীয়র সম্বন্ধেই ঘটে। কিন্তু শেক্সপীয়রের সমতুল্য যাঁরা নন, বিশ্বচিত্তে তাঁদেরও স্থান অগ্রাহ্য নয়, যেমন রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু আমাদের দেশ ছাড়া আর কোন্ দেশের লোক নিজেদের অতি প্রিয় কবিদের কথা বলতে গেলেই বিশ্বকবি বলে নেচে ওঠে তা আমি জানি না।

নোবেল প্রাইজ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে
এ যে পরতে গেলে লাগে...

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লাগলেও দেশের লোকের ভালোই লেগেছিল। আর এই ভালো লাগার উত্তেজনায় এমন কথাও বাঙালির মুখে শোনা গিয়েছিল যে, বাংলা গীতাঞ্জলির চেয়েও ইংরাজি গীতাঞ্জলি অনেক উঁচুদরের জিনিস।

ভালো লাগা না-লাগা অনেকটাই রুচির ব্যাপার। আর রুচি নিয়ে তর্ক করাটা বোধ হয় খুব রুচিসম্মত নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে, অর্থাৎ ইংরাজি গীতাঞ্জলি ভালো কি বাংলা গীতাঞ্জলি ভালো এই বিচারের বেলায়, বুদ্ধি বিবেচনারও সামান্য একটু ভূমিকা আছে। অবশ্য, ইংরাজি গীতাঞ্জলি পুরোপুরি বাংলা গীতাঞ্জলির অনুবাদ নয়, 'খেয়া', 'নৈবেদ্য' ও 'গীতাঞ্জলি'র কতকগুলি বাছাই-করা কবিতা নিয়েই ইংরাজি গীতাঞ্জলি গ্রথিত হয়েছিল। এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়।

আসল কথা, এই অনুবাদগুলির বেশির ভাগই বাংলা গানের। অতএব, ইংরাজি অনুবাদে, তার শুধু ভাবান্তর নয়, একেবারে রূপান্তর ঘটেছে। তার জাত আলাদা, রস আলাদা। সুতরাং তুলনা চলে না। আর যদি তুলনা করতেই হয়, তাহলে বলব, আমি ঐ বাংলা গানগুলির মধ্যে যে রস পাই, ইংরাজি অনুবাদে তার ছিটেফোঁটাও পাই না, কবিতা হিসাবেও নয়। ইংরাজরা ওর মধ্যে কি রস পেয়েছিল তারাই জানে। কিছু একটা পেয়েছিল, নইলে এত হৈ চৈ করে কেন। কিন্তু যাই থাক, যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা বাংলা গীতাঞ্জলির গানের মধ্যে পাই, তাঁর সম্বন্ধে ইংরাজি পাঠকসমাজের যে কিছু মাত্র ধারণা করা সম্ভব নয়, এ বিষয়ে আমার তিলমাত্র সন্দেহ নেই। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় যে, বিদেশে রবীন্দ্রনাথ যে সম্মান পেয়েছেন তা একটা অলীক ব্যাপার। কেননা বিদেশিরা এই সম্মান দিয়েছে আমাদের রবীন্দ্রনাথকে নয়, তাদের মনগড়া রবীন্দ্রনাথকে। হয়তো সেই রবীন্দ্রনাথ সামগ্রিক রবীন্দ্রনাথেরই একটা অংশ। এমন কি মূল্যবান অংশ। কিন্তু অত্যন্ত আংশিক বলেই তা সম্পূর্ণ সত্য নয়।

কবিতার, অন্তত লিরিক কবিতার ভাষান্তর অসম্ভব। এই আপ্ত বচন আমাদের বার বার স্মরণীয়। কবিতার বেলায় যদি এই কথা খাটে, তাহলে গানের বেলায় খাটে আরো অনেক বেশি। সুর জিনিসটা নিতান্তই দেশজ সৃষ্টি। সুতরাং গীতাঞ্জলির রচয়িতাকে যাঁরা বুঝতে চান, তাঁদের আসতে হবে রবীন্দ্রনাথের কাছে। তাঁর সৃষ্টি দেশজ পরিবেশের মধ্যে। বিদেশীর পক্ষে তা কি করে সম্ভব হ'তে পারে!

রবীন্দ্রনাথ বলতেন (পরের মুখে নয় আমার নিজের কানে শোনা) আমার গান আমার ছোটো গল্প আর ছবি এ তিনের মধ্যেই আমি বেঁচে থাকব। আমাদের আশ্চর্য লাগতে পারে, তিনি কবিতার কথা কেন বলতেন না! বোধ হয় নিজের কবিতা সম্বন্ধে তাঁর আস্থা ছিল এত দৃঢ় যে কবিতার কথা জোর দিয়ে বলার প্রয়োজন বোধ করেন নি। আরো একটা কথা আছে। গানকেও তিনি ধরতেন কাব্য

হিসেবে। কেননা, এ-কথা তিনি বার বার বলতেন যে, আমার গান তোমাদের পড়বার জন্যেও লিখেছি, শুধু শুনবার জন্যে নয়। আরও বলতেন এই জন্যে যে নূতন সংস্করণের গীতবিতানের গানগুলিকে সাজিয়েছিলেন পূজা প্রেম ইত্যাদি শ্রেণী অনুসারে। যাতে পাঠকেরা বিভিন্ন গানের মধ্যে একটি ঐক্যসূত্রের সন্ধান পায়। এই গীতবিতানই এখন প্রচলিত। আর শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমার তীব্র আপত্তি আছে। কেননা, এর ফলে পূজা ও প্রেমের গানগুলো প্রায় একাকার হয়ে 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা' রবীন্দ্র-নাথেরই এই বিখ্যাত পংক্তিটির অর্থ একটু বেশি সুলভ হয়ে গেছে।

শ্রেণীবিভাগের কথা না হয় ধরলাম এমন কিছু ব্যাপার নয়, কিন্তু গান কবিতার মতো পড়লে নিশ্চয়ই তার পুরো রস পাওয়া যায় না। তা যদি হত, তাহলে গীতাঞ্জলি তো পুরোপুরি কাব্যই হত। তা মানতে আমি অন্তত নারাজ। রবীন্দ্রনাথও একাধিকবার বলেছেন যে গানের সুর কথারস ছাড়িয়ে সীমানা পেরিয়ে পৌঁছায় অন্য এক লোকে। সেইজন্যে গান অনির্বচনীয়। এই অনির্বচনীয় কথাটি রবীন্দ্রনাথের, এবং এর একটি বিশেষ আৎপর্য আছে। কিন্তু তবু এ-কথা না মেনে কি উপায় আছে যে রবীন্দ্র-সংগীতের অনির্বচনীয়তা একান্তভাবে নির্ভর করে বচনের উপর। শুধু বচন নয় যাকে বলা হয় বাচনভঙ্গি। অতএব উচ্চারণ, এবং অবশ্যই নানা ধ্বনির ঘাতপ্রতিঘাত। মোট কথা, রবীন্দ্রনাথ উঁচুস্তরের কবি না হলে রবীন্দ্র-সংগীতের জন্ম হত না।

কিন্তু রবীন্দ্র-সংগীতের ও রবীন্দ্র-কাব্যের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন, রবীন্দ্র-সংগীতের পরিণতি ঘটেছিল রবীন্দ্র-কাব্যের বেশ কিছু আগে। এর কারণ আমার মনে হয় যে, আমাদের দেশে সংগীতে যে ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্য ছিল, কাব্যে তা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের শৈশবে জোড়াসাঁকোর আসর মুখর হয়েছিল একাধিক বিখ্যাত গায়কের কণ্ঠে। কিন্তু তখনকার দিনে এমন কে কবি ছিলেন, যিনি রবীন্দ্রনাথের প্রাণমন

হরণ করতে পেরেছিলেন। বিহারীলালের কথা নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁর প্রভাব নগণ্য। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণ। আশ্চর্য এর কবিত্ব ও মৌলিকত্ব। বাঙালি পাঠক এখনো এর পুরোপুরি সমাদর করতে পারে নি। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর পথ তৈরী করে নিতে হয়েছে তাঁর চেষ্টায়। এবং এই পথ তৈরি হতে না হতেই তা ভেসে গিয়েছে গানের জোয়ারে। কোটালের বানের মতো গানের জোয়ার। এইজন্যেই একেবারে প্রথম বয়সের গানগুলিতেও আমরা বিস্ময়কর সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। যার তুলনায় নিছক কবিতা হিসাবে এই গানগুলি তেমন কিছু নয়।

এইখানে একটি কথা আমি পাঠকদের কাছে নিবেদন করতে চাই। একাধিক বিদ্বান ও বিদগ্ধ ব্যক্তির কাছে এ-কথা শোনা গেছে যে, আদিপর্বের রবীন্দ্র-সংগীত ধ্রুপদী প্রভাবে আচ্ছন্ন। এ-কথা মানা যায় কিনা জানি না। রবীন্দ্র-সংগীতে ধ্রুপদী প্রভাব তো জানা কথা, তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ-কথা উল্লেখ করে গেছেন, কিন্তু এই প্রভাব রবীন্দ্র-সংগীতে কতটা বিস্তৃত হয়েছে, তা বিচার্য। প্রথম বয়সের গানগুলির মধ্যে বিশেষ করে ব্রহ্মসংগীতগুলি ধ্রুপদী ঢংএর। কিন্তু অন্য গানগুলির মধ্যে যাদের সংখ্যা কম নয়, ধ্রুপদী প্রভাব কি খুব বেশী আছে। ঠাকুর-বাড়ির গানের আসর একদিন নিশ্চয়ই সরগরম হয়েছিল সেরা ধ্রুপদীয়াদের গানে। আর এই গানের গাম্ভীর্য অতি সহজে সঞ্চারিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের অগ্রজদের রচিত ব্রহ্মসংগীতে। মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মসংগীত রচনায় অন্তত তাঁদেরই অনুসরণ করেছিলেন।

কিন্তু এ হল বিরাট ও বিচিত্র ঠাকুরবাড়ির একটি মাত্র দৃশ্য। বাংলার যুগ বিবর্তনের ইতিহাসে এই ঠাকুরবাড়ি ছিল তখন প্রধান মঞ্চ আর এই মঞ্চের অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিরাজ করতেন মহর্ষিদেব। বাংলাদেশে ধ্রুপদী গানের প্রবর্তনে রামমোহনের দান

স্মরণীয়। রামমোহন-শিষ্য মহর্ষি যে ধ্রুপদী রীতির ধারক হবেন তা তো স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশের নূতন যুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতি শুধু কি ধ্রুপদী মার্গেই অগ্রসর হয়েছিল। সেদিন উন্মুক্ত বাঙালি মনের দরজা খুলে গিয়েছিল। আর এই খোলা দরজা দিয়ে ঢুকেছিল ভারতীয় বিদেশী সংস্কৃতির বিচিত্র প্রবাহ। আর একটি দৃশ্যের কথা মনে করা যাক, ঐ ঠাকুরবাড়িতেই অগ্রজেরা দিচ্ছেন নাটকের অভিনয় মহড়া, বালক রবীন্দ্রনাথের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। দূর থেকে তার কানে আসছে দু'চারটে গানের পদ, যেমন—

ওকথা আর বোল না, আর বোল না
বলছ বঁধু কিসের ঝোঁকে। ইত্যাদি

এ হল ঐ মঞ্চেরই আরেকটি দৃশ্য। এখানে মহর্ষি নেই, ধ্রুপদও নেই। তরুণ রবীন্দ্রনাথের উন্মুখ মনে এই অন্য প্রভাবও নিশ্চয়ই অস্বীকার করবার মতো নয়। আর যদি ফল দিয়ে বিচার করতে হয় দেখব যে গানের ক্ষেত্রে, টপ্পায় ঠুংরীতে বাউলে কীর্তনে তা নানাভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

ব্রহ্মসংগীতের কথা যখন উঠেছে, তখন আমার ক্ষীণকণ্ঠে একটু প্রতিবাদ জানিয়ে রাখতে চাই শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসুর একটি অভিমত সম্বন্ধে। তিনি একবার লিখেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত সবচেয়ে অরাবীন্দ্রিক। যেমন সব চাইতে রাবীন্দ্রিক তাঁর ঋতু-সংগীত। আমি যদিও মানি না যে রবীন্দ্র-সংগীতের একমাত্র বৈশিষ্ট্য ধ্রুপদী রীতি কিংবা প্রথম যুগের রবীন্দ্র-সংগীতের প্রধান অবলম্বন ছিল ধ্রুপদী রীতি। তবে এ-কথা যদি কেউ অস্বীকার করেন যে রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ব্রহ্মসংগীতে পাওয়া যায় না কিংবা যথেষ্ট পাওয়া যায় না, তা হলে বুঝব তাঁর সঙ্গে আমার রুচির একেবারে ধাতুগত বিরোধ আছে। এই প্রসঙ্গে আমি পাঠকদের এই কথাটাও মনে করিয়ে দিতে চাই যে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীতও সবগুলি ধ্রুপদী রীতিতে রচিত নয়। রবীন্দ্রনাথ যদি ব্রহ্মসংগীত ছাড়া অন্য গান একটিও না লিখতেন তা হলেও তাঁর সাংগীতিক

খ্যাতি শুধু গানগুলির ওপরেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। কেননা, ওই গানগুলির মধ্যে তাঁর সাংগীতিক প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য এই দুইই পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে। পাছে পাঠকেরা আমাকে ভুল বোঝেন, সেইজন্যে বলে রাখা ভালো, আমি ঈশ্বরভক্ত নই, ঈশ্বরে বিশ্বাসীও নই।

রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক প্রতিভার পরিণতি যে কবি প্রতিভার পরিণতির আগেই ঘটেছে, এ-কথা ইতিপূর্বে লিখেছি। এর জ্বলজ্বলে প্রমাণ আমরা পাই 'মায়ার খেলা'য়, যা 'মানসী'রও বছর ছয়েক আগে রচিত। এটি একটি আশ্চর্য সৃষ্টি এবং অবশ্য এর একটি গানও ঋতু-সংগীত নয়। যদি রবীন্দ্রনাথের অন্য সব গান হারিয়ে গিয়ে শুধু 'মায়ার খেলা' থেকে যায়, তাহলেও তাঁর সাংগীতিক খ্যাতি অক্ষুণ্ণ থাকবে। অবশ্য, এ-কথা মনে রাখা ভালো যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সংগীত বলতে যে জাতীয় গানগুলিকে বোঝায়, অর্থাৎ যে গানগুলিতে কথা ও সুরের সার্থক সংগম ঘটেছে, তার আভাস 'মায়ার খেলা'র মধ্যে থাকলেও তার চরম বিকাশ ঘটেছে পরে। কিন্তু এ হল সূক্ষ্ম বিচারের কথা কেননা রবীন্দ্র-সংগীত মানেই কাব্যসংগীত। এই প্রসংগে আমার আরেকটি দুঃসাহসিক প্রতিবাদ আমি নিবেদন করতে চাই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ; গানকে তিনি বলেছেন অনির্বচনীয়। তা হলে কবিতাকে যদি বলি আমি সম্পূর্ণ সুরনিরপেক্ষ ;—তা হলে কি অন্যায় হবে, আদিম যুগে গান কথা সুর ও নাচকে নিয়ে হত অখণ্ড শিল্পসৃষ্টি, যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি যোগ ছিল (প্রায় আক্ষরিক অর্থে) মানুষের কাজের অর্থাৎ অঙ্গ চালনার, এই ভাবেই নাটকের উৎপত্তি ও তার ভিতর দিয়ে কাব্য ও সংগীতের। কিন্তু এর পর কবিতা যখন গান থেকে স্বতন্ত্র হল, তখন কি তা কোন স্বকীয় গৌরব অর্জন করে নি। না করলে মানুষের সংস্কৃতিতে কবিতার প্রভাব এত ব্যাপক হত না। তাই সেরা কবিতাকে গানের আসরে টেনে নামানো গান কবিতা উভয়ের প্রতি অবিচার ছাড়া আর কিছু নয়। যে রবীন্দ্রনাথ একদিকে জয়দেবের গীতগোবিন্দ

সুর সংযোগকে বাহুল্য বলে প্রচার করেছিলেন, তিনি পরে নিজের একাধিক শ্রেষ্ঠ কবিতাকে গানে পরিণত করবার চেষ্টা করেছিলেন তাতে অন্তত আমার মন কিছুতেই সায় দিতে পারে না। আমার আপত্তি শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি সম্পর্কে।। 'আমি চঞ্চল হে' বা 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে' প্রভৃতি কবিতায় সুর বসিয়ে বোধ হয় ভালোই হয়েছে, কেননা এগুলি উচ্চাঙ্গের কবিতা নয়, তবে গান হিসেবে উৎরালেও এগুলি কখনোই তাঁর শ্রেষ্ঠ গান বলে মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু ক্ষণিকার 'হে নিরুপমা' বা 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' একেবারে নিছক কবিতা, ইংরাজিতে যাকে বলে absolute poetry। কি প্রয়োজন ছিল এগুলিকে কাব্য-সংগীতে পরিণত করার চেষ্টার ?

ছবির কথা বুঝি না, আর ছোটো গল্প উপস্থিত আলোচনার বাইরে, কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্য আর রবীন্দ্র-সংগীত কখনো দোসর কখনো অঙ্গাঙ্গি জড়িত। কিন্তু যেখানে তিনি নিছক কবি, সেখানে তিনি একান্তই কবি। আর যেখানে তিনি গান রচয়িতা, সেখানেও তিনি নিশ্চয়ই কবি। কিন্তু এখানে কবিতা হল সুরের বাহন। কিন্তু এই কবি বিশেষভাবে বাঙালি কবি ও বাংলাদেশের কবি। এই তাঁর মহত্তম পরিচয়। এই পরিচয় যেদিন বিশ্বের লোক বুঝতে পারবে সেদিনই তিনি যথার্থ বিশ্বকবি হতে পারবেন।

বিশ্বের মহাকবি রত্নাকর রবীন্দ্রনাথের নৃত্যে রূপ পরিকল্পনা সম্বন্ধে লিখিতে বসিয়া প্রথমেই মনে পড়িতেছে যে, তাঁহার বাণী দারুণ দুঃখেও আমাদের প্রপীড়িত অন্তরকে সুন্দর সংস্পর্শে আনিয়া শান্ত করে, আনন্দ দেয়। তাঁহার বিভিন্ন সৃষ্টিধারার মধ্যে বিশেষভাবে বাণীরূপেই আমি ভক্ত। সেই বিরাট রসস্রষ্টার ভিন্নমুখী প্রতিভা-স্ফুরণ আমাকে একইভাবে আকর্ষণ করে এমন কথা নিশ্চিন্তমনে বলিতে পারি না; কিন্তু তবু আমি তাঁহার সর্বপ্রকার সৃষ্টিরই রসগ্রাহী।

আমার বক্তব্য নৃত্যের রসগ্রহণ। নৃত্য কেন, যাবতীয় ললিত-কলার গুণগ্রহণ নির্ভর করে ব্যক্তিগত রুচি কিভাবে গ্রহণশক্তির উপর। সুতরাং প্রথমেই রসগ্রহণ ও ব্যক্তিগত রুচি কিভাবে সাধারণের মনে আধিপত্য বিস্তার করে, তাহার বিশ্লেষণের প্রয়োজন। অনেকের ধারণা অধিকাংশ মানুষেরই রুচি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নাই। অর্থাৎ ভালমন্দ যাহা সে বিচার করে তাহা সাময়িক ফ্যাশানের বশ্যতা স্বীকার অথবা সংস্কারবদ্ধ আবাল্য শিক্ষার ফল, যাহা পারি-পার্শ্বিক আবেষ্টনী ও সামাজিক তাগিদে অনুপ্রেরিত।

সহজ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মানুষ, সহজসম্মত রুচির বিরুদ্ধাচরণ করিলে হাস্যকর অথবা একঘরে হইবার সম্ভাবনা থাকে। অপরদিকে যাহারা রসগ্রহণ বিচারাধীন করিতে পারেন এবং রুচি সম্বন্ধে চিন্তাশীল অথবা নতুনের সন্ধানী কিংবা স্রষ্টা, তাঁহারা মনোজতের লোক। বাস্তবের অনেক বীভৎসকে এড়াইয়া তাঁহারা ঊর্ধ্বলোকে চলিয়া যান। বাঁচার উদ্দেশ্য তাঁহাদের নিকট ভিন্ন। তাঁহাদের মনোবৃত্তি চলতি রুচির সম্পূর্ণ বিরোধী না হইলেও, বাস্তবকে অস্বীকার না করিলেও, গতানুগতিকতার সহিত জড়তার সম্বন্ধে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, যাহা প্রাণবানের সম্বল হইতে পারে।

এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সব কিছু সাধারণ হইতে পৃথক। তিনি মহামানব, পুঞ্জীভূত মহাশক্তির প্রতীক। এই শক্তির গতি বহুমুখী। বেগবান মহানদের খরস্রোতের মত। স্রোতের পথে আপনার শক্তি আপনি ধরিয়া রাখিতে পারে না। শাখা প্রশাখা বিস্তারিত হইয়া পড়ে, দূর দূরান্তে চলিয়া যায়। অনাদিকাল হইতে মানুষ আনন্দের আশায় দিশাহারা হইয়া জীবনসংগ্রামের দ্বন্দ্ব চালাইয়া আসিতেছে, সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াও অজানার সন্ধানে ঘুরিতেছে। এই আনন্দের জন্য মানুষের চিন্তার শেষ নাই, খোঁজার শেষ নাই, আনন্দের স্তরেরও অন্ত নাই। আমরাও সুন্দরের আশ্রয় লইয়াছি ঐ আনন্দের জন্য। সুতরাং সুন্দরকে চিনিবার নিমিত্ত নিরপেক্ষ রসগ্রাহীর দ্বারস্থ না হইয়া উপায় নাই। হীরককে জহুরী যেমন মূল্যবান রত্ন বলিয়া ধার্য করে, সেইরূপ সুন্দরকে বুঝিতে হইলে, আপনার বলিতে হইলে রসগ্রাহীর শরণাপন্ন হইতে হইবে, নিজেকে রসগ্রাহী করিয়া তুলিতে হইবে। নিজে রসগ্রাহী না হইলে হীরক অনুমানে কাচের স্তূপ বাড়িয়া যাইবে, জহুরীও বাছাই করাকে বিড়ম্বনা ভাবিতে থাকিবে।

এইবার নৃত্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিরবণ দিয়া লই। চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, সুর ও সাহিত্যের মত নৃত্যের ভাব প্রকাশের একটি বিশিষ্ট ভাষা আছে, তবে নৃত্য প্রথমোক্ত চতুঃকলার ন্যায় স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। সুর ও তালের অভাব ঘটিলে নৃত্য নিতান্ত অসহায়।

যে কয়টি ললিতকলার নাম উল্লেখ করিয়াছি তাহাদের যেমন নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী আছে সেইরূপ পৃথকভাবে প্রত্যেক কলার বিস্তারও আবার সীমাবদ্ধ; কাব্যে যাহা নিরবচ্ছিন্ন Abstract কল্পনার বিষয় তাহা Three dimensional concrete formএ ধরিবার উপায় নাই, কারণ abstract কল্পনা ও concrete formএ মিল অপেক্ষা অমিল ঘটিবার সম্ভাবনা বেশী। সুতরাং সীমা অলঙ্ঘনীয়। সীমাকে মানিতে হইলে নৃত্যের রূপ কল্পনা ও তাহার প্রকাশ কতটা বিস্তারিত হইতে পারে তাহা নির্ধারিত হওয়া দরকার। সাহিত্যে রূপ প্রকাশ যেমন শব্দের অন্তর্গত, সুরের আত্মপ্রকাশ যেমন সংযত ও রসাল ধ্বনির

উপর নির্ভর করে, ভাস্কর্যের প্রকাশ যেমন Three dimensional form-এর অন্তর্ভুক্ত ছবিতে যেমন রং রেখা ও রূপের সামঞ্জস্যই রসোদ্‌ঘাটনের চরম সার্থকতা, সেইরূপ নৃত্যেও সুর ও তালকে অনুসরণ করিয়া দেহের লীলায়িত ভঙ্গীর দ্বারা ভাবপ্রকাশের প্রধান অবলম্বন। নৃত্যের রূপও Three dimensional, সেই কারণে ভাস্কর্যের সহিত ঐক্য আছে মনে করি। ভাস্কর্য অচল, নৃত্য সচল। ভাস্কর পাথর কুঁদিয়া রূপকে নিশ্চলভাবে ধরিয়া রাখে, নৃত্যেরও নট ও নটী নিজেদের সুসামঞ্জস্য দেহকে সচল ভাস্কর্যে রূপান্তরিত করিয়া গঠনের লীলায়িত ভঙ্গীর দ্বারা ভাব প্রকাশ করে। ইহা বিরাট সাধনাসাপেক্ষ। নট ও নটীর গঠনসুষমা ও কলানৈপুণ্য স্বল্পায়াসে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

নারীর নৃত্যে দেহচালনার সহজ লীলায়িত ভঙ্গী তখনই আসে যখন নটীর গঠন তন্বীর আকার ধারণ করে। আমি তন্বী বলিতে বুঝি ক্ষীণকটি, শ্রোণীভারমন্থরা, পীনোন্নতপয়োধরা, নিটোল নধর অনতি-কৃশাঙ্গী নারী। প্রারম্ভেই বলিয়াছি সৌষ্ঠবপূর্ণ গঠন ও তাহার ব্যঞ্জনাময় সঞ্চালনই নৃত্যের প্রকাশভঙ্গীর প্রধান উপকরণ। নৃত্যের Rythm-এ দেহাবরণ সামান্য সহায়তা করিলেও পরিচ্ছেদের প্রভাব গৌণ।

তন্বীর রূপ বর্ণনায় আমি যাহা বলিয়াছি তাহাতে অনেক নীতি-বাগীশদের শ্লীলতাবোধে আঘাত লাগিতে পারে। কিন্তু প্রাচীন যুগে নৃত্যে, ছবিতে, ভাস্কর্যে নারীর রূপ কল্পনায় বিরাট রূপদক্ষরা ভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করেন নাই। অধিকন্তু এদিক দিয়া যাহা ভাবিয়াছেন তাহা অকুতোভয়ে সাহিত্যে, ছবিতে, মূর্তিতে প্রকাশ করিয়া নিজেদের সৃষ্টিকে দীর্ঘায়ু করিয়া গিয়াছেন। মহাকালের ধ্বংসশক্তিকেও অগ্রাহ্য করিয়া সৃষ্টিগুলি সাহিত্যে, চিত্রে ও ভাস্কর্যে নিজেদের অস্তিত্ব মাথা খাড়া করিয়া প্রচার করিতেছে। সাময়িক তথাকথিত মার্জিতরুচির দাসত্ব মানিতে গিয়া আজ আমরা যে রূপকে বীভৎস বলিতেছি, অশ্লীল ভাবিতেছি, সেই রুচি কালের স্রোতে অদূর ভবিষ্যতে

পরিবর্তিত হইয়া যাইবে না এমন মত দৃঢ়ভাবে কেহ প্রচার করিতে পারে না, কারণ evolution-এর ধর্মই পরিবর্তন, সুতরাং চল্‌তি রুচিরও পরিবর্তন ঘটা বিচিত্র নয়।

নৃত্যে রেখার Rythm-ই সর্বস্ব, যাহার প্রকাশ পরিচ্ছদ অপেক্ষা দেহগঠনের উপর অধিক নির্ভর করে। এই সূত্রে বলা ভাল, আমাদের দেশের নৃত্যকে রূপদক্ষরা কিভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত বাঘ, অজন্তা, ইলোরা, elephanta ইত্যাদি শিল্পীর তীর্থপীঠে, চিত্রে ও ভাস্কর্যে এখনও পাওয়া যায়। নটরাজ সর্বপরিচিত। নৃত্য-কলাবিৎ ভৈরব ধাতুতে রূপগ্রহণ করিলেও তাঁহার গঠনে ব্রোঞ্জের অসাড় কাঠিন্য নাই। ভাস্করের অলৌকিক সৃষ্টিপ্রতিভা তাঁহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। নটরাজ যেন জীবন্ত দেহ লইয়া রসগ্রাহীর সামনে বিদ্যমান। শব্দ নাই, কিন্তু নৃত্যের দোলা এমনই সামঞ্জস্য-পূর্ণ যে, মনে হয় দূর অদৃশ্য ও অজ্ঞাতলোকে মালকোস অথবা মেঘ-মল্লার সুর চলিয়াছে, মৃদঙ্গের ধামার তাল মৃদুরব হইতে মেঘগর্জনের গম্ভীরনাদে গুরু গুরু করিয়া উঠিতেছে, ধ্বংসের দেবতার পদক্ষেপের তালধ্বনি শুধু মৃদঙ্গ নয়, পাতাল হইতে ভূমি কম্পিত করিয়া ঊর্ধ্বে উঠিয়া আসিতেছে, নৃত্য, সুর, তাল এবং ভৈরবের ধ্বংসকারী রূপের মিল ঘটিয়াছে—অপূর্ব সম্মেলন। ইহা কখনই সম্ভব হইত না—যদি না শিল্পীও নির্ভীকের মত নটরাজকে প্রায়দিগম্বর করিয়া ফেলিতেন। পরিচ্ছদের আড়ম্বরসহ ভৈরব প্রলয় নাচন নাচিবার চেষ্টা করিলে ভূমিকম্প হইত না, বেচারা দেবতা প্রতি পদে হোঁচট খাইতেন। নটী সম্বন্ধেও ঐ একই ধরনের যুক্তি খাটে। নৃত্যের নিমিত্ত মঞ্চে উঠিলে নটীকে অনেক প্রচলিত সঙ্কোচ ত্যাগ করিতে হইবে।

এইবার নৃত্যে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট দানের কথা আসে। বিশিষ্টের প্রশ্ন যখন উঠিয়াছে তখন ভিন্ন প্রকারের নৃত্যপদ্ধতির সহিত তুলনা বাঞ্ছনীয় মনে করি। নৃত্যকে মধ্যস্থ করিয়া মানুষ অনাদিকাল হইতে ভিন্ন দেশে ভিন্ন প্রথায় আনন্দ সংগ্রহ করিয়া আসিতেছে। এইখানে জাত অথবা আনন্দের স্তরের কথা উঠে। গ্রাম্য আবেষ্টনীতে

যেসব নৃত্যের প্রচলন আছে, তাহা গ্রামেই নিজ আবেষ্টনীর ভিতর শোভনীয় এবং তাহা গ্রাম্য রসজ্ঞদেরই আনন্দ দান করিতে পারে তাহাদের স্বকীয় রসবোধশক্তির মাপকাঠিতে। কিন্তু ভিন্নতর আবেষ্টনীতে এবং ভিন্নতর দর্শকের নিকট আবার সেই গ্রাম্য নৃত্যের অন্তর্নিহিত যথার্থ সৌন্দর্যটুকুও ম্লান বা একেবারেই অন্তর্নিহিত হইয়া যাইবে।

এখন দেখা যাউক, বাঙলা ও বিভিন্ন প্রদেশে নৃত্যের অনুষ্ঠানগুলি কিভাবে চলিতেছে। উত্তর ভারতের বাঈজীর' নৃত্য সর্বজনবিদিত, যাহার প্রচার বাঙলাতেও দীর্ঘকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বাঈজী ছাড়া বারোয়ারীতলায় খেমটা নাচ এখনও কোথাও কোথাও চলে। বাঈজীর নাচে মুসলমান প্রভাবই বেশী। উক্ত নটীদের অভ্যর্থনা সাধারণতঃ রইসেব জলসাঘরের মজলিসে হইয়া থাকে। আনুষঙ্গিক সুরও উচ্চাঙ্গের। হিন্দুস্থানী খেয়াল ঠুঙরীর চালে বাঈজীরা সঙ্গীতচর্চা করিয়া থাকেন। ভাবোচ্ছ্বাসকালীন নাটকীয় প্রভাবকেও (ভাঁও বাতলান) বাঈজী অস্বীকার করেন না, যাহা সঙ্গীত অথবা নাচের সঙ্গে ইঙ্গিত এবং অঙ্গচালনার দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভাবপ্রকাশের ভিতর অধিকাংশ মহলেই কামোচ্ছ্বাস অথবা প্রেমের ব্যর্থতাই বেশী থাকে। বাঈজীরা অধিকাংশ সময়েই পেশাদার, সেই কারণে আসরে নিমন্ত্রিত দর্শকদের ফরমাস অনুসারে গাহিতে এবং নাচিতে হয়। গৃহকর্তা সৌজন্যবোধে এই অনুরোধ সমর্থন করিয়া থাকেন। প্রমোদ করিতে আসিয়া কেহ গম্ভীর রাগরাগিণী পছন্দ করেন না, তাছাড়া বিলম্বিত বড় তালের সহিত লালসাপূর্ণ নৃত্যের পদক্ষেপও তেমন জমে না। উক্ত কারণে ধীরে ধীরে ধ্রুপদ চালের সঙ্গীত আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে ; ইহা বাঙলার দুর্ভাগ্য। কৃষ্টির হিসাব নিকাশের সময় যদি কখনও আসে তো বুঝা যাইবে, রসগ্রহীতার অভাবে দেশ হইতে কত বড় সম্পদ বিতাড়িত হইয়াছে। বাঈজীর নাচে সুদক্ষ অঙ্গচালনার তেমন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না ; খেমটা নাচেও উল্লেখযোগ্য কিছু

নাই। নিতম্বের সামান্য দোলার কিছু থাকলেও তাহা সুরুচিপূর্ণ বলিতে পারি না। পঙ্কোদ্ধার হওয়াতে রায়বেঁশে ব্রতচারী নাচ দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। ইহা নাচ কিংবা কলহের প্রারম্ভে তালঠোকা, সে সম্বন্ধে এখনও আমি কোন সিদ্ধান্তে আসিতে পারি নাই। যতদিন এই নাচের উদ্দেশ্য না বুঝিতে পারিতেছি, ততদিন উহা ড্রিল একসারসাইজ ভাবিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব। ড্রিলে একটা disciplined সাময়িকভাব লক্ষ্য করা যায়, ইহাতে তাহাও পাই না।

দক্ষিণ ভারতের কথাকলি এবং ভারত-নাট্যে নৃত্যের উদ্দেশ্যে সার্থকতা আনিয়াছে। অনেক সময় নাটকীয় উপাদান অধিকমাত্রায় থাকিলেও নৃত্যের স্বকীয় রূপ উপেক্ষিত হয় নাই। উক্ত নৃত্যপ্রথার ভাবোচ্ছ্বাসের নিমিত্ত নানারূপ জটিল ও কষ্টসাধ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নৃত্য-ভঙ্গী থাকা সত্ত্বেও মুদ্রার সহায়তাকেও কলাবিদেরা বাদ দেন নাই। মুদ্রার বিশেষ রূপে নির্দিষ্ট বক্তব্য প্রকাশিত হয়, যাহা অনভিজ্ঞের নিকট অর্থহীন। এইখানেই শিল্পকলার জাতিগত ভাষার কথা উঠে, যাহা জানিলে রসগ্রহীতার সুবিধা বাড়ে বই কমে না। তুলনাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করিয়াছি। এইবার রবীন্দ্রনাথের রূপ-পরিকল্পনায় যে নূতনের সাড়া পড়িয়াছে তাহারই কথা বলিব। তিনি দলছাড়া, কারণ গতানুগতিকতার জড়তা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। প্রচলিত বিচারের মানদণ্ডে তাঁহার পরিকল্পিত ও প্রবর্তিত নৃত্যপদ্ধতির বিচার করা চলে না। নৃত্যে তিনি যে Group Composition-এর পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা পুরাতন ধারার প্রভাব কাটাইয়া ঊর্ধ্বস্তরে উঠিয়াছে। পুরাতন ধারায় নৃত্যের পদবিক্ষেপ বাঁধা নিয়মে নির্দিষ্ট প্রথায় পরিচালিত হওয়ায় অনেক সময় আড়ষ্টভাব আসিয়া পড়ে, নৃত্যবিদকে যন্ত্রচালিত করিয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ এই যান্ত্রিক প্রভাব হইতে নট ও নটীদের মুক্তি দিয়াছেন, তাহাদের প্রাণবান করিয়া তুলিয়াছেন। তিনিই বাঙলার ভদ্রসমাজে নৃত্যের আধুনিক প্রবর্তক। উদয়শঙ্করের আবির্ভাবের বহু পূর্বে নৃত্যকে উচ্চাঙ্গের রসকলা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত তিনি যে সামাজিক প্রতিকূলতা সহ্য করিয়াছেন তাহা

অপ্রিয় হইলেও সত্য। রবীন্দ্রনাথ নৃত্যেকে প্রমোদগৃহের পঙ্কিলতা হইতে রক্ষা না করিলে আজ উদয়শঙ্কর নট হিসাবে খ্যাত এবং শ্রদ্ধেয় হইতেন কি না তাহা সন্দেহজনক, রবীন্দ্রনাথের দুর্দান্ত সাহস এবং আন্তরিকতা না থাকিলে আজ বাঙলা-কৃষ্টির একটি বিশিষ্ট সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইত। বালী, মণিপুরী, কথাকলি এবং ভারতনাট্যের সংমিশ্রণে তিনি নৃত্যে এমন কতকগুলি রূপের পরিকল্পনা করিয়াছেন যাহা তিনি ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা সম্ভবপর ছিল না। এই রূপকে অধিকতর বর্ধিত করিয়াছে মঞ্চপটের অতুলনীয় Severe simplicity, যাহাতে রসরাজ ও বিরাট শিল্পী শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসুর প্রভাব অনুভূত হয়। শুধু পশ্চাৎপট নয়—নট ও নটীর পরিচ্ছদেও তাঁহার রং-এর আভাস সুস্পষ্ট, যাহা রসিককে নেশাগ্রস্ত করিয়া ছাড়ে, ধীরে ধীরে বাস্তব জগৎ হইতে উর্ধ্বলোকে লইয়া যায়, নাট্যমঞ্চে যাহা দৃশ্য তাহা জীবন্ত রঙীন ছবি হইয়া উঠে এবং নটীকে সেই বৃহৎ ছবির একটি Balancing asset বলিয়া ভ্রম হয়। আবেষ্টনীর অপূর্ব স্নিগ্ধতায় রসরাজ্য ভরিয়া উঠে, মৃদুমন্দ সমীরণে সুগন্ধ পুষ্পের গন্ধ বহিয়া আসিতে থাকে, দর্শক স্বপ্নের মায়াজালে বিভোর হইয়া রং রেখা ও রূপের প্রভাবে সম্মোহিত হইয়া পড়ে, রবীন্দ্রনাথকে বিরাট স্রষ্টা বলিয়া মানে।

রবীন্দ্রনাথের আকাশস্পর্শী সৃজন-প্রতিভা সত্যই এক অদ্বিতীয় বিস্ময়। বেগবান গঙ্গার মতো তাঁর প্রতিভা কাব্য, সংগীত, নাটক, শিল্পকলা, শিক্ষা, দর্শন—বহু ধারায় প্রবাহিত হয়েছে এবং সমগ্র যাত্রাপথ তাঁর ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে জীবন্ত হয়েছে। এই বহুধা কৃতিত্ব ছাপিয়ে ওঠে তাঁর অপূর্ব গানগুলির সংগীত। কুড়ি বছর বয়স থেকে, যখন তিনি তাঁর প্রথম গীতিনাট্য বাল্মীকিপ্রতিভা রচনা করেছিলেন, গুণ ও সংখ্যায় অতুলনীয় গানের বন্যায় তিনি পৃথিবীকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম গীতিনাট্য রচনা সম্পর্কে কবি জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন: 'সংগীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাতে নিঃসঙ্কোচে সকল প্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল। বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। বাল্মীকিপ্রতিভা, কালমৃগয়া যে-উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে-উৎসাহে আর কিছু করি নাই।'

নাটক তাঁর কাছে 'অনুভূতির খেলা, ঘটনার নয়' এবং বোধ হয় তিনি সব নাটকেই আজীবন এই নীতি অনুসরণ করেছেন। সেই জন্যই তিনি সমস্ত নাটকীয় ঘটনাকেই একটা কাব্যিক রূপ দিয়েছেন—কবিতা, সংগীত, গান—একটা সামগ্রিক ছন্দোবদ্ধ ধারা যা অন্তরের সত্তাকে প্রকাশ করবে।

কবিকে গল্পের চেয়ে ভাব, ঘটনার চেয়ে সংগীতই যেন অনুপ্রাণিত করে। একটা অস্পষ্ট অস্বস্তি, অকারণে বিষাদের অনুভূতি, আনন্দের একটা হঠাৎ ঢেউ—এই সূক্ষ্ম অনুভূতির যথার্থ অভিব্যক্তি কি মামুলি শব্দের পক্ষে সম্ভব? একমাত্র কবিতার মধ্যেই এর প্রকাশ হতে পারে। এবং কবিতার সঙ্গে যখন সংগীত সংযোজিত হচ্ছে তখন আর কিছুই অব্যক্ত না থেকে স্ফটিক-স্বচ্ছ হয়। ফাল্গুনী নাটকে কবির এই

প্রত্যয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। আলোচনা প্রসঙ্গে পাহারাদার চন্দ্রহাসকে গানের মধ্যে উত্তর দেওয়াই তার রীতি কি না, জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দেয়ঃ 'হ্যাঁ, কারণ তা ছাড়া. উত্তর দুর্বোধ হবে।' পাহারাদারঃ 'তাহলে তোমাদের গানকে সহজবোধ্য মনে কর?' চন্দ্রহাসঃ 'হ্যাঁ নিশ্চয়, এগুলি ছংগীতময় যে।' অবশ্য আবেগের বহিঃপ্রকাশই শেষ কথা নয়। কবির কাছে আবেগ শুধু যোগ্য পরিস্থিতি সরবরাহ করে, যার ফলে সৃজন সম্ভব হয়।

রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র নাটক লেখেন নি; তিনি অভিনয়ও করেছেন। সব ক'টি নাটকেই তিনিই নাট্যকার, গায়ক, অভিনেতা ও প্রযোজক। শৈশবাবস্থাতেই কবি অভিনয় ভালোবাসতেন এবং স্বীয় স্বাভাবিক অভিনয় ক্ষমতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসও ছিল। যে-সব ভাগ্যবানরা তাঁকে মঞ্চে দেখেছেন তাঁরাই জানেন কি আশ্চর্য অভিনেতা তিনি ছিলেন। তাঁর বেশির ভাগ মূল চরিত্রগুলিই—অন্ধ সন্ন্যাসী, দাদু, রাজা বিক্রম, ধনঞ্জয় বৈরাগী, রঘুপতি—তাঁর কবি সত্তার প্রতিচ্ছবি, তাঁর জীবনদর্শনের প্রতীক।

প্রাচীন নাটকের মতো রবীন্দ্র-নাটকগুলিও আঙ্গিকের দিক থেকে মূলত 'অপেরাটিক'—সংগীত ও নৃত্যপ্রধান ধনঞ্জয় কোহল প্রভৃতি নাট্যশাস্ত্রের প্রধান ব্যক্তিত্বেরা সংগীত, নৃত্য বা অঙ্গভঙ্গির প্রাধান্য অনুযায়ী নাটকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নানাভাবে বিভক্ত করেছেন। বাল্মীকিপ্রতিভা প্রথম মঞ্চস্থ হবার সময় অধুনা পরিচিত নৃত্যনাট্য সম্বন্ধে দর্শকের খুব সামান্যই ধারণা ছিল। আঙ্গিক নির্ধারণের সময় প্রাচীন ভারতের প্রাজ্ঞজনেরা সংগীতের ক্ষমতা, এবং শারীরিক অভিব্যক্তি ও নৃত্যের মাধ্যমে দর্শনেন্দ্রিয়জাত তৃপ্তির গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন।

এবং রবীন্দ্রনাথ আরও বেশি ছিলেন। ১৮৮১-তে বাল্মীকি-প্রতিভার পর তিনি কাল-মৃগয়া এবং মায়ার খেলা লিখলেন।

প্রথম দুটি গীতি-নাট্য সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'বাল্মীকিপ্রতিভা ও কাল-মৃগয়ার মতো এত উৎসাহে আমি আর

কিছু লিখিনি।' সংগীতের তদানীন্তন উচ্ছ্বাস বই ছুটিতে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংগীত সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নাটক রচনা, প্রযোজনা ও মঞ্চস্থ পর্যন্ত। প্রতীচ্য সংগীতের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে সম্ভাবনার দিগন্ত তাঁদের কাছে অবারিত হয়েছিল।

বাল্মীকিপ্রতিভার সংগীত মূলত ভারতীয় রাগরাগিণী অবলম্বনে হলেও ইউরোপীয় সুরাশ্রিত গানও আছে, এখানে তাঁব একমাত্র লক্ষ্য ছিল বিশেষ রসানুযায়ী সুর সৃষ্টি করা। বাল্মীকিপ্রতিভা এবং কাল-মৃগয়ায় সংগীতের চেয়ে নাটকীয় অভিব্যক্তির প্রাধান্য বেশি কিন্তু মায়ার খেলার সংগীতই প্রধান। নৃত্যনাট্যেব আলোচনায় গীতিনাট্য সম্পর্কে এই বিশদ আলোচনায় হয়তো পাঠক বিস্মিত হচ্ছেন। কিন্তু এ-কথা অবশ্য স্মর্তব্য যে তাঁর প্রায় সব ক'টি গীতিনাট্যই—না, এমন-কি তাঁর কয়েকটি কবিতা ও গদ্য-কবিতাও—নৃত্যের মাধ্যমে সুচারুভাবে অভিনীত হয়েছে।

তারপর কিছুদিন কবি শান্তিনিকেতনের আশ্রম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অন্তবর্তী সময়ে তিনি অনেক নাটকই রচনা ও মঞ্চস্থ করেন। যেমন বাজা ও রানী, বিসর্জন, শারদোৎসব, রাজা, ফাল্গুনী—এবং সব ক'টিতে সংগীতের অখণ্ড প্রাধান্য। বিশ্বভারতী স্থাপিত হওয়ার পবই তিনি বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন উৎসবকে রচনার উপজীব্য হিসাবে ব্যবহার করেন। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন এই ধরনেব অনুষ্ঠান শান্তি-নিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রয়োজনীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্গ।

১৯২১ থেকে ১৯৩১ অবধি, তিনি বর্ষামঙ্গল, বসন্তোৎসব, শেষ বর্ষণ, ঋতুরঙ্গ এবং অন্যান্য গীতিনাট্য রচনা ও মঞ্চস্থ করেন। এগুলি প্রথমে শান্তিনিকেতনে এবং পরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। মূলত ঋতুর উপযোগী গান হলেও নৃত্যের সুযোগ ছিল। এই ঋতুউৎসবের কয়েকটির, যেমন বর্ষামঙ্গল বা শেষ বর্ষণ, নাটকীয় বিন্যাস থাকলেও জোড়া দেবার জন্য বহু যায়গায় গদ্য ব্যবহৃত হয়েছে।

সর্বশেষে, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা ও চণ্ডালিকার প্রসঙ্গে আসা যাক। কবি এগুলি নৃত্যের জন্যই বিশেষভাবে রচনা এবং নৃত্যনাট্য হিসাবেই অভিহিত করেছিলেন। পূর্বসূরীদের সঙ্গে এই নাটকগুলির মৌল পার্থক্য হচ্ছে নৃত্যের প্রাচুর্যে। এমন কি নৃত্যাপযোগী করার জন্য সংলাপের সুরারোপও সেইভাবে করা হইয়াছে। প্রথম তিনটি গীতিনাট্য,—বল্মীকিপ্রতিভা, কালমৃগয়া এবং মায়ার খেলা—সংগীত ও অভিনয়েরই নাটক। নৃত্য সংযোজিত হলে মৌল সৌন্দর্যকে সমৃদ্ধশালী করতে পারে। কিন্তু তাঁর শেষোক্ত তিনটি নৃত্যনাট্য সংগীত এবং নৃত্যেরই নাটক। এই নৃত্যনাট্যগুলি খুবই জনপ্রিয়। ওর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করে আমি সময় নষ্ট করব না। তবে এই প্রসঙ্গে কবির মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; তিনি বলেছেন : 'বাল্মীকিপ্রতিভা এবং কালমৃগয়া গানের সূতো দিয়ে গাঁথা নাটকীয় ঘটনার মালা।' আবার মায়ার খেলার ব্যাপারে ঠিক কিন্তু বিপরীত। এবং এখানে আমরা বলতে পারি যে চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা ও চণ্ডালিকা—শেষের এই তিনটি নৃত্যনাট্য গানের সূতো দিয়ে নৃত্যের মালা। সে গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্য, যাই হোক, বিষয়বস্তু প্রেম বা সামাজিক হোক, চরিত্রের দিক থেকে রোমান্টিক বা প্রতীকিই হোক, রবীন্দ্রনাথের নাটক সাধারণ মানদণ্ড দিয়ে বিচার করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ নিজে নৃত্যশিল্পী ছিলেন না। কিন্তু দেহের স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দোময় অভিব্যক্তি তিনি অন্তরত অনুভব করেছিলেন। সুতরাং এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, অভিব্যক্তির বাহন হিসাবে নৃত্য তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। এমন কি শান্তিনিকেতনে নৃত্যশিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হবার আগেই কবি গুজরাটের লোকনৃত্য এবং মণিপুরী রাস-লীলায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে, গানের তালে তালে নাচতে ছাত্রীদের অনুপ্রেরণা দিতেন।

তারপর ১৯২৫-২৬এ মণিপুরী শিক্ষক নবকুমার সিং এলেন। এমনি করে নৃত্যের আসর জমে উঠল, নাচের দিকে রবীন্দ্রনাথের মন ঝুঁকল।

পাশ্চাত্যের মতো ভারতবর্ষে ব্যালে প্রচলিত ছিল না। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাটক সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে নাচ গান অভিনয় এই তিন মিলে নাটক সৃষ্টি এবং ভরত শুদ্ধ নাটক বলতে রূপককেই বুঝেছেন যার বিশিষ্ট গুণ হল বাক্যার্থাভিনয়। নৃত্য ও গানে যে ভাবার্থ অভিনয় হত তা হল উপরূপক। ভরত বাচিকা বলে যে নাটকের একটি শ্রেণীভাগ করেছেন তার মূল কথাই হল কথ্য ভাষাকে কাব্যে প্রকাশ করা। সুতরাং ভরতের নাট্যশাস্ত্রে পাশ্চাত্যের নৃত্যনাট্যের অথবা ব্যালের রূপ মেলে না। কিন্তু নাচ ও গান বাদ দিয়ে নাটকের কল্পনা ভারতবর্ষে ছিল না। এই কারণেই সংস্কৃত নাটক কাব্য লক্ষণাক্রান্ত যা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

কথাকলি, চোকিয়ার কুথু—মালাবরের এ সমস্ত নাট্যের মধ্যে ব্যালের রূপ দেখতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যে অষ্টাদশ শতকেই ব্যালের স্বর্ণযুগ। মিলান অ্যাকাদেমী এই ব্যালে প্রচারে বিশেষ সহায়তা করেছে। কার্লো ব্লাসিস পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যালে নৃত্যকার, এবং তখন থেকেই ব্যালের ধারা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথই বাংলা দেশে প্রথম নৃত্যনাট্য রচনা করেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৃত্যনাট্যগুলি রচনা করার পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের রূপগুলি দেখেছিলেন। সেই নৃত্যনাট্যগুলি রবীন্দ্রনাথের উপর কতখানি প্রভাবপাত করেছে তা সঠিক বলা যায় না। কেননা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির রূপ আমাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের মনে নৃত্যের রূপ-কল্পনা নৃত্যনাট্য রচনা করার পূর্বেই এসেছিল, নটীর পূজায় নৃত্যই তার প্রমাণ। কিন্তু জাভা, বলি, চীন-জাপান প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে রবীন্দ্রনাথ সেখানকার নৃত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। এর পূর্বে ইউরোপের ব্যালেও তাঁর মনের গোপনে অদৃশ্য প্রেরণারূপে কাজ করছিল, এ সকলকে মিলিয়ে নিয়েই তিনি নৃত্যনাট্য রচনা করেন। নৃত্যনাট্যের গল্পাংশগুলি নূতনভাবে উদ্ভাবন করেন নি। আগেকার রূপগুলিই ঈষৎ

পরিবর্তিত করে নৃত্য অনুযায়ী নাট্যরূপ দিয়েছেন। যদিও কাব্যই এর প্রধান অংশ, কাব্যকে অবলম্বন করে নাচ ও সুরের মিলন। এইখানেই পাশ্চাত্যের ব্যালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের মূলগত পার্থক্য।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের বৈশিষ্ট্যই হল নৃত্যকে প্রধানভাবে অবলম্বন না করে কাব্য-সংগীতকে প্রধানত অবলম্বন করেছেন। কাব্যের রস আর নাট্যের রস সমগোত্রীয় নয়। নাটকের অবলম্বন ঘটনা, কাব্যের ভাব। নাটকে দ্বন্দ্বই প্রধান এবং বাস্তব জীবনের ছবি তাতে ফুটে ওঠে এবং বলতে গেলে সামাজিক জীবনই নাটকের উপাদান। নাটকে ক্রিয়া জমে ওঠে সামাজিক জীবনের দ্বন্দ্বে, মানসিক জীবনের ও অন্তর্লোকের দ্বন্দ্বে। ঘাত প্রতিঘাতটাই এখানে প্রধান কথা। অথচ রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিগত জীবনের ভাবরাশি প্রকাশ পেয়েছে। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে নিবিড়তা অনুপস্থিত। সুতরাং নাটকীয় ঘটনার মুহূর্ত নেই বলেই একে নাটক বলা যায় না। এই কারণেই এগুলিকে নৃত্যনাট্য বলতে আমার বাধে।

অথচ এর কাব্যভাব আমাদের মনকে দেহমনের পরপারে নিয়ে যায়, এবং এই সূক্ষ্মানুভূতির তীক্ষ্ণতা নাচের মধ্যেও প্রকাশ করা শক্ত। তাই রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে নৃত্য প্রয়োগ সর্বাঙ্গসুন্দর নয়, নিম্নোক্ত গানটির ভাবের আদর্শ, সুরের মোহজাল, কল্পনার মায়াবিস্তার, অননুভূত বেদনার অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ পাঠকচিত্তে যে সংবেদনার সৃষ্টি করে নৃত্যের পক্ষে তা সম্ভব নয়ঃ

আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি
আনন্দে বিষাদে মন উদাসী
পুষ্পবিকাশের সুরে
দেহ মন ওঠে পুরে,
কী মাধুরী সুগন্ধ
বাতাসে যায় ভাসি।

'গানের গান'

অমিয় চক্রবর্তী

'গানের গান' বলতে আমরা রবীন্দ্র-গীত-সৌধের বিশেষ একটি আশ্চর্য নির্দিষ্ট মহলকে বুঝি ; দ্রুত উল্লেখ করতে হলে কবি নিজেও তাঁর গান সম্বন্ধীয় গানকে ঐ নাম দিতেন।

হঠাৎ মনে না হতে পারে ঐ বিশেষ পরিচয়ের গান সংখ্যায় এবং বৈচিত্র্যে কত ব্যাপক, সৃজনীধারার কত বাঁকে বাঁকে তার ইতিহাস কবির জীবনের সঙ্গে জড়িত। একদিকে ধ্যানোজ্জ্বল আদি হিমাদ্রি, অন্যদিকে মহাচিত্তের অতল প্রকাশ, দুয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর গানের প্রবাহিনী বৃহৎ মানবসংসারের নানা ফসলের সন্ধান নিয়ে বয়ে চলেছে। তাই, গানকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত সৃষ্টিশীল জীবনের রূপকতায় বারম্বার বর্ণনা করেছেন ; কৈশোর হতে প্রাণের সন্ধ্যা ও রাত্রি পর্যন্ত দীর্ঘ পথ-চলার কাহিনী তাঁর গানের বাঁশিতে বেজেছে, আলোয় জ্বলেছে ; অন্তরের নীরবতায় ধ্বনিত হয়েছে এই গান, গান তাঁর বাণীর প্রতীক, তাঁর প্রেরণা, প্রাণের সঙ্গে পৃথিবীর সেতু। গান শোনাতে তাঁর আশা, গানের তার বাঁধতে হবে প্রাণের যন্ত্রে, গীত-সাধনার মধ্য দিয়ে কবির চিরমানবিক তপস্যা। গানের চোখে ভুবনকে দেখলে তাকে চেনা যায় ; এই দেখবার চোখ তৈরি হোলো মর্ত্যলোকের কোন আদি কাল থেকে ; গান দিয়ে জানবার যাত্রা চলেছে জন্ম-মৃত্যুকে পার হয়ে ; চিরন্তন প্রকাশ-রূপী তাঁর এই গান। নিজের কণ্ঠকে, বাঁশিকে, বীণার তন্ত্রকে তিনি গান শোনাবার কাজে লাগালেন ; যাবার কালে যন্ত্র রইল পড়ে, গান রেখে গেলেন পিছনে। কখনো বলেছেন গান তাঁর শেষ পারানীর কড়ি ; সমস্ত জীবনের সুখ-দুঃখকে একটি গানের সুরে গেঁথে নেবো ; এই এক বর চেয়েছেন যেন মৃত্যু হতে জেগে ওঠেন গানের নূতন সুরলোকে। পৃথিবীতে রেখে গেলেন যে-গান তার জন্য মায়া না জাগুক, ভেসে যাক তারা, বিদায়ের হাওয়ায়, থাকুক জড়িয়ে হৃদয়ের রঙ্গে, বর্ষার মেঘে ; গানে গানেই

প্রাণের বন্ধন কাটিয়ে মুক্তি দেখা দিক। কত বিচিত্র নূতন প্রসঙ্গে গানের কথা রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন তা গীতবিতানের পথিক মাত্রেই জানেন। অনুশীলন করলে বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর এই বিশেষ গানগুলিকে সাজানো চলে। পরিবেশের পার্থক্যে এক একটি গান নূতনতর উজ্জ্বলতায় দেখা দেয়, গানের মালায় তার রং বদলায়। সাজাবার সময় গ্রন্থনকারের মনে রাগ-রাগিণীর অনন্য স্বরূপও কথার সঙ্গে গুঞ্জরিত হবে, কিন্তু সে আরেকটি বড়ো দিক। রবীন্দ্রনাথের গানে কোনখানে কথা ও সঙ্গীতে মাধুরীর ছেদ নেই, সমগ্র গানের স্বকীয়তা দুয়ের যুগাত্মক ; কিন্তু বিশ্লেষণের কালে কাব্যের দিক থেকেও গানের বিচার সম্ভবপর। শুধুমাত্র কথার ভাব অনুসারে গানের গানগুলিকে ভাগ করলে সৃজনলোকের বহু সন্ধান পাওয়া যায়। তিনটি পর্যায়ে গানগুলিকে সাজানো চলে। যিনি গান শুনছেন, গান শোনাবার তাগিদ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠালেন কবিকে তিনি স্বয়ং সুর স্রষ্টা। সমস্ত রূপলোকই তাঁর সঙ্গীত, তিনি বেঁধে দিয়েছেন ধ্রুবপদ, সেই বিশ্বতানে জীবনকে মেলাতে হবে। গগনের নীলের সঙ্গে হোক্ মনের মিল, জীবনের উদয়াস্ত ভরে উঠুক নিত্যের সঙ্গীতে। এই গান শোনান যিনি তাঁর সুরের ধারা পাষাণ ভেঙে বয়ে যায়, ভুবনের কোটি আলোয় ছেয়ে থাকে, সুরের মহাবায়ু আকাশে আকাশে সঞ্চারিত। কবি বাসা বাঁধতে চান উৎসধারার পাশে, যেখানে অনন্তের বিশ্বগীত নির্ঝরিত হয়ে প্রাণের অন্তরে ভরে ওঠে, ধ্বনির তরঙ্গে ফোটায় গানের তারা, ফুলের কেন্দ্রে মধুর মতো পূর্ণ হয় হৃদয়ের সুর। কখনো বলছেন, মাটির কলসি তাঁর ছাপিয়ে গেল, ঝরনাতলার নির্জনে এসে তিনি সকল দানের অতিরিক্ত পেলেন অসীমের তটে : করুণধারার ফল সঙ্গীত শুনতে এসেছেন কবি দিনান্তের একাকী মুহূর্তে। উপমা বদলে যায় ; শান্তিবারির স্থলে দেখি সুরের আগুন, মরা ডালে নৃত্য করে তারি মন্ত্রশিখা, রাতের আকাশে ফোটে সেই অনলের স্বর্ণকমল। অগ্নিবীণা বাজিয়ে তিনি নূতন সৃষ্টির বেদনা জাগালেন। যিনি সুর-বিধাতা তাঁর বাণী জ্বলে' ওঠে বিশ্বের

দীপালিকায়, কবির চিত্ত-প্রদীপে তারি আগুন জ্বলুক ; নির্বাণহীন তাঁর আলোকিত ইচ্ছায় ব্যক্ত হোক্ এই রূপের সাধনা। একই গানে অরূপের সুরকে বলা হয়েছে বসন্তের গীত লেখা, প্রাণের কেন্দ্রে সে সঙ্গীতের নিঃশ্বাস ভরে দেয়, পুষ্পে পর্ণে অন্তরে অন্তরে তাই রঙের উৎসব। যিনি বাঁশি বাজান তিনি সুরের রাখাল, মহাগগনতলে তাঁর আলোক-ধেনুগুলি চরছে, সূর্য তারা দলে দলে যাতায়াত করে সেই বেণুর সঙ্কেতে। কখনো এই বেণু বাজে বনের পাতায়, পাখির গানে: পাষাণ দিয়ে বাঁধা জীবনের বাইরে গিয়ে কবি শুনতে চান সেই সৃষ্টির বাঁশি, সহজ প্রাণের সুর। বীণাপানি বাজান তাঁর অদৃশ্য বীণা। কখনো শুনি, কখনো ভুলি, কিন্তু সুরের গোপন কথা আকাশে ধরণীতে প্রকাশ পায়, মধুকরের ত্বরিত পাখা চলে সেই সুরের পথ খুঁজে। এমনি করে কত শ্রাবণের ধারার মতো, কত গন্ধে বরণে গানে, বিশ্বজুড়ে উদার সুরে সৃষ্টির আনন্দ বেজে উঠল ; সীমার মধ্যে অসীমের এই সুর, এই সুরে তিনি আমাদের ঘুম ভাঙান, যখন শুনি না তখনো আমাদেরি জন্য নিত্যবীণা বাজতে থাকে। শুভ্র নবশঙ্খে বাজে তাঁর সুর, পিণাকে লাগে তাঁর টংকার, বজ্রে বাঁশি বাজিয়ে সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্তকে তিনি সৃষ্টির নৃত্যে মাতান ; আঘাতে আঘাতে ঝঙ্কৃত হয় তাঁরই স্পর্শ জীবনের তারে, নিঠুর মূর্ছনায় গানের মূর্তি-সঞ্চার করান তিনি। তিনিই আসেন নীরব মহামন্ত্রে, গভীর রজনীতে কবির হৃদয়-বাঁশি কেড়ে নিয়ে আপনি বাজান গ্রহ শশি যে-তান শুনে অবাক, সেই জীবন-মরণ পারের সুর তিমিরে শুনতে থাকেন কবি।

পৃথিবীর কবির কণ্ঠে জাগল উত্তর। কখনো গান শোনার আনন্দই তাঁর গান, সুর সুরধ্বনির স্রোতে আপন গীতসমর্পণে তিনি ধন্য। গীতময় প্রত্যুত্তর দেবার পালা এই দ্বিতীয় পর্যায়ের 'গানের গানে' বিচিত্র হয়ে দেখা দিয়েছে। এইখানে মর্ত্য-কবির বিশিষ্ট অধিকার। গীত সৃষ্টির তপস্যায় আগুন জ্বালিয়ে আলোয় উত্তরণ, ব্যক্তিগত এই সাধনার বিরাম নেই। ঝড়ে আলো নিভে যায়, মেঘে আচ্ছন্ন করে ; যন্ত্রকে বারে বারে নূতনভাবে বাঁধতে হবে, ছেঁড়া-তার বদলানো চাই।

নিজের শক্তিতে যখন কুলোয় না, সুরের গুরুর কাছে ফিরে ফিরে কবি সুরের দীক্ষা নিতে বসেন। দুঃখে পুড়িয়ে, সংসারের শোকে সংগ্রামে আজীবন প্রতিষ্ঠিত করে তারই মধ্যে মুক্তির সুখ দিয়ে কবির কণ্ঠে গান জাগালেন সৃষ্টিকার। সমস্ত সংসারটাই কবির কণ্ঠে গান জাগানোর আয়োজন, সুরের পরীক্ষা প্রতি মুহূর্তে; মাটির জীবনে কত বিচিত্র কত আশ্চর্য প্রাণের সঙ্গীত কবির অনুরাগে ধ্বনিত হোলো। যাকে বলা যায় পরিবেশ ধরণী, জল-মাটি হাওয়ার সংসার, তাকে নিয়ে গানের গানে নিত্য নূতন উৎসব। সবুজ ঘাস, বর্ষার মেঘ, ঝরা পাতার রং, বসন্তের ফুল আসে আরম্ভ এবং অবসানের সুর নিয়ে, রেখে যায় নিরবসান মাধুর্য। কোনো একটি পুষ্পিত পর্ব নেই যাকে রবীন্দ্রনাথের গানে বাঁধা হয়নি; ফল ফসলের গান, শূন্য মাঠের গান, জল ঝরানো দিনের মর্মরতা তাঁর গানের ঋতুচক্রে আবর্তিত। হৃদয়-মনের সূক্ষ্মতম বোধ মাটির ভূমিকায় ধরা দিল। আবার মানবজীবনের একটি আকাশিকা আছে, যেখানে অদৃশ্য হাওয়া বদল হয় রঙের দিগন্তে মেঘ বিদ্যুতের খেলা, সৌরভের উৎসব; যেখানে পূর্ণিমার চাঁদ এবং কালো রাত্রির তারা দেখা দেয়, সূর্যদিন নেমে আসে পৃথিবীতে। মাটিও আকাশের সমাবর্ত, তাপ ও আলোর অনুষ্ঠান, ঋতুলগ্নগুলির সঙ্গমসমারোহ কবির গানে ভাষা পেয়েছে। প্রকৃতির নিত্য-সৌন্দর্য বিভিন্নতা তাঁর অজস্র নূতন গানকে সঙ্গে নিয়ে এল। এই তাঁর গীতময় প্রত্যুত্তর। বর্ষামুখর রাত্রে, ফাল্গুনী হাওয়ায়, গ্রীষ্মশীতের কঠোর মাধুর্যে তিনি তাঁর গান শোনালেন সৃষ্টির কবিকে, যিনি মর্ত্য-কবিকে গান শুনিয়ে নিজেও শুনছেন। এতই স্পষ্ট স্বতন্ত্র হয়ে এই প্রাকৃত ধরণীর গানগুলি শিল্পরূপ নিয়েছে যে মনে হয় বাংলার বিশ্ব প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথেরই আবিষ্কার; আমরা তাঁরই গানের ভিতর দিয়ে আমাদের ভুবনকে সত্য করে দেখলাম, জানলাম, গ্রহণ করলাম। এরই পাশাপাশি মিশিয়ে রয়েছে মানুষের সংসার; আকাশ ও মাটির সঙ্গে অনবচ্ছিন্ন এই আমাদের জীবন পর্যায়। সেখানে কান্না হাসির পৌষ ফাগুনের মধ্য দিয়ে যাত্রা। কখনো

মিলনে, কখনো বিরহে গানের ডালা নিয়ে চলেন কবি। বিরাম নেই তাঁর সৃষ্টি-কাজে ; ফুল ফুটিয়ে, ফল ধরিয়ে অর্ঘ্য নিয়ে যেতে হবে। গানে গানে তিনি জানিয়ে গেছেন কত বড়ো দুঃসহ সৌভাগ্য তাঁকে বহন করতে হয়েছিল। যখন সবাই ফিরেছে দীপ-জ্বালা ঘরে, তাঁকে ডেকেছে বাইরেব রাস্তায় ; ঘুম ভাঙানিয়া এসেছেন নিবিড় দুঃখের রাত্রে তাঁরই গান শুনতে। পথের কাঁটা মাড়িয়ে দগ্ধ দুপুরে তিনি দিগন্তের গান বাঁধলেন ; দীর্ঘ দিনের তপ তাঁর সন্ধ্যার গীতাগ্নিতে আবার জ্বলে উঠল। অনাদরে, অবহেলায় তাঁকে গান গাইতে হয়েছে, দিনের পথিক সবাই তা জানে না ; ভয় তাঁর পাছে সুরভ্রষ্ট হন, ছিন্ন তারের জয় হলে তাঁরই ব্যর্থতা। রজনীগন্ধার রাত্রে হয়তো কে আসবেন. যদি আজই হয় লগ্ন ; স্তিমিত দীপ প্রহবে প্রহরে কবি জেগে আছেন গান নিয়ে। নক্ষত্রেব গান. ভোবেব গান, প্রভাত রৌদ্রের গান শোনাবার ভার তাঁর উপর ; গানেব পব গান শোনাবেন, অবসব তিনি চান নি। কখনো মনে হয়েছে সাধনা সম্পূর্ণ হে লো , অশোক অদৃশ্যচারিণী ছায়াকে গীতছন্দে ধরবেন বলে পণ কবেছিলেন. এতদিনে তাঁব গানেব বন্ধন মেনে নিল। গান তাঁব ছুঁয়েছে মুক্তিকে পেয়েছে শ্রেষ্ঠতমেব চরণ, নিজে তিনি পড়ে রইলেন এ-পারে। কখনো বিশ্ব-স্রষ্টার সমাসনে বসেন মর্ত্যের কবি, যিনি বিধাতা তাঁকে পান বন্ধুরূপে, গীত সৃষ্টির তন্ময় সহযোগিতায় জেগে ওঠে গান। গান গাইতে তাঁব আসা, গানের অনন্ত পথে দূবে যাওয়া, আসা-যাওয়াব পথের ধারে বসে তিনি গান শুনিয়ে গেছেন। তবু মনে হয়েছে, যে গান গাইতে এসেছিলেন তা আজও গাওয়া হয়নি ; সমস্ত জীবন কেটেছে সুরেব সাধনায়, সুরের চরম মূর্তিকে মূর্তি দেওয়া যায় না। আবার কোনো গানে বলেছেন যা চেয়েছিলেন তা এই বিরাজে, গানে উদ্ভাসিত বিতান সহজরূপে তিনি এই তো পেয়েছেন, তিনি জেনেছেন। যারা কথা দিয়ে কথা বলে তারা জানে না, যারা অন্তবের সুর বাজায় তারাই জানে এই গান-শোনা, গান-শোনানো, গানের দেওয়া-নেওয়ার কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ গীতবিতানের "পূজা ও প্রেম"

এই দুই ভাগে সাজিয়েছিলেন। "পূজা" অংশে প্রধানত সুরস্রষ্টার কথা আছে, বিশ্বলোকে যার রাগিণী, বিশেষভাবে "পূজা"র প্রথম কয়েকটি গানে। গান যেখানে ভক্তিরসে বিধৃত, কবির নিজের সঙ্গীতও সেখানে পূজার পর্যায়ে স্থান পেয়েছে। "প্রেম" অংশে দেওয়া নেওয়া সম্বন্ধ, বিরহ মিলনের মধ্য গীতলীলা : বিশেষভাবে কবির আনন্দময় আসন সুখ-দুঃখের সুরে শিল্পিত এই গান। কিন্তু পূজা ও প্রেমের মধ্যে তো ছেদ নেই, কবির সংকল্পিত গীতবিতানে তাই লীরিকের মালা গাঁথা হয়েছে বিশেষ উপভোগের জন্য; ভাবের বিভিন্নতা কিন্তু রক্ষা হয়নি। গীতবিতানের প্রথম খণ্ডের প্রায় সমস্তখানি "পূজা", তার অন্তর্গত ৬২৯টি গানকে একুশটি স্বতন্ত্র নামে ভাগ করা হয়েছে, যেমন "গান, বন্ধু, প্রর্থনা, বিরহ, দুঃখ, অত্মবোধন" ইত্যাদি ; এর মধ্যে বহু গানকেই অন্যভাবেও দেখা চলে। সব জড়িয়ে পাঠক একটি ঐক্যধারা অনুভব করবেন। শেষ অংশের "পরিণয়"-এর গানগুলিতেও পূজার সঙ্গীত শোনা যায় সন্দেহ নেই ; কিন্তু পরিণয়ের গান তো প্রেমেরও, সুতরাং গীতবিতানের দ্বিতীয় খণ্ডে "প্রেম" শীর্ষক বিভাগে তা যুক্ত হলেও ক্ষতি হত না। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীপত্রে গানের প্রথম লাইনগুলি পড়েও 'গানের গান'গুলি বেছে নেওয়া যায় কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে এরকম সঞ্চয়নের কাজ প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে। কেননা শুধু গান, অথবা সুর-ব্যঞ্জক বিশেষ শব্দ, যন্ত্র বা অলক্ষ্য অনাহত সঙ্গীতের উল্লেখ অনুসারে গান সংগ্রহ করলে চলবে না। তাতে যে গানগুলি পাওয়া যাবে তা সংখ্যায় অনেক হলেও বহু 'গানের গান' তার থেকে বাদ পড়বে। অপর পক্ষে সঙ্গীতের বিশেষ নামোল্লেখ নেই, অথচ গানের মধ্য দিয়ে কবি যেখানে তাঁর উত্তর দিয়েছেন এমন গান খুঁজতে গেলে প্রায় বেশির ভাগ গানকেই ধরতে হয়। তবু বলা চলে গীতবিতানের মালঞ্চে যে-কোনোখান থেকে কতকগুলি গান তুলে নিলে তার মধ্যে বিশ্বগীত স্রষ্টার গান এবং কবির আপন গান, এই দুই পর্যায়ের রচনা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা কঠিন নয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কিছু

উদাহরণ উপরে আছে। গীত রচয়িতা কবির আপন গানের বাণী স্বরূপে দ্বিতীয় পর্যায়ের আরো কিছু গানের প্রথম লাইন এইখানে উদ্ধৃত করি :

(১) কুল থেকে মোর গানের তরী (২) আপন গানের টানে (৩) আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান (৪) গানের সুরের আসনখানি (৫) খেলার ছলে সাজিয়ে আমার গানের বাণী (৬) আমার যে-গান তোমার (৭) আমার ঢালা গানের ধারা (৮) আমার মনের মাঝে যে-গান বাজে (৯) কাহার গলায় পরাবি গানের রতনহার (১০) গানের ডালি ভরে দেগো (১১) নিদ্রাহারা রাতের এ গান (১২) সময় কারো যে নাই (১৩) আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে (১৪) গানের ভেলায় বেলা অবেলায় (১৫) অনেক দিনের আমার যে-গান (১৬) আমার আপন গান আমার আগোচরে (১৭) উতল হাওয়া লাগল আমার গানের তরণীতে (১৮) অমি যে গান গাই জানিনে কার উদ্দেশে (১৯) দিন পরে যায় দিন (২০) আমি কী গান গাব (২১) আকাশ ভরা সূর্যতারা (২২) আকাশ আমার ভরল আ্যালোয় (২৩) তোমার নয়ন আমায় বারে বারে (২৪) আনন্দ গান উঠুক তবে বাজি (২৫) কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে।—এই রকম আরো অনেক গুচ্ছ গান একত্র করে স্বকীয় গান কবির গীত রচনাকে হারে গাঁথা চলে। আশ্চর্য এই যে একটি মাত্র লাইনের সোনার কাঠিতে মন মাধুর্যে ভরে যায়; যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে একাত্ম তাঁরা একটু ইসারার মধ্য দিয়েও মায়া-রাজ্যের নানা পথে সঞ্চরণ করে থাকেন। এক একটি পদের অন্তরালে সমস্ত গানের রূপ মনে আবির্ভূত হয়। সুরের স্মৃতি এবং কবিতা-পড়ার আনন্দ একত্র মিলিয়ে যাঁরা গান পড়েন তাঁরা ভাগ্যবান; কিন্তু সুর না জানা থাকলেও সূচীপত্র থেকে ভিতরের পৃষ্ঠা এবং নানা প্রসঙ্গে সংযোজিত গানের কথায় যাতায়াত করতেও বিশেষ একটি তৃপ্তি আছে, যা কেবল মাত্র কবিতার বইয়ে মেলে না। ছোটো ছোটো লীরিকের

ভিতর দিয়ে যে-কাব্যরস মনে সঞ্চারিত হয় তারই পরিবেশন করা রবীন্দ্রনাথের সাজানো গীতবিতানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ; সব গান খুব ছোটোও নয়। বিশুদ্ধ গীতি-কবিতার বিশ্বসাহিত্যে এই রচনাগুলির তুলনা আছে বলে জানি না 'গানের গান' বলতে সব চেয়ে নির্দিষ্টভাবে তৃতীয় একটি পরিধি নির্ণয় করা যায়। উৎসবে অনুষ্ঠানে গান বাঁধতে তাঁর ভালো লাগত ; নূতন নূতন গান রচনা করে কবি কত আনন্দ পেয়েছেন তা আমরা জানি ; এই ব্যক্তিগত কথাটুকু তাঁর নানা গানে ছড়িয়ে আছে।

নিজের মনে গান গেয়েছেন, অন্যকে শুনিয়েছেন ; সুখে-দুঃখে তাঁর গান সংসারে শান্তি এনেছে, ভালোবাসা ভরে দিয়েছে, এরই প্রসঙ্গ দেখি তাঁর গানে, গানের বন্যা অভাবিত নামত তাঁর মনে, শৈবালের জলের মতো চঞ্চল লীলাস্রোতে দুলত আলোয়, তার কথা সহজ, কত আশ্চর্য করে গেয়েছেন। "বাঁশি আমি বাজাইনি কি পথের ধারে" এই কথা তিনি কখনো দুঃখ, কখনো ব্যাকুলতার অভিমানে, কখনো আনন্দে, প্রশ্নোত্তর বা প্রশ্নের আকারে সাজিয়ে গেছেন। যেমন দেখি বহু কবিতায় এবং গদ্যরচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান রেখে যাওয়ার গূঢ়তম তাৎপর্য প্রকাশ করেছেন, বলেছেন গীতচিত্রিত এই হোলো তাঁর প্রত্যুপহার পৃথিবীকে, মানুষকে, জীবনকে ; তেমনি তাঁর কয়েকটি গানে এই তাঁর আপন একান্ত সৃষ্টি তাঁর গানগুলিকে পিছনে রেখে যাবার প্রসঙ্গে তাঁর গভীরতম সৃষ্টি চেতনা ব্যক্ত হয়েছে। কত অল্পে, কত সহজে ছিল তাঁর গানের দুর্লভ আয়োজন। সামান্য একটু আলো স্পর্শ ; হাওয়ায় সৌরভের ছোঁওয়া ; কিছু পলাশ, কিছু চাঁপার মোহাবিষ্ট মুহূর্ত ; এরই রঙে রসে জড়িয়ে মাটির ফাগুনী পাত্র তাঁর স্বরচিত ফাগুনীর গান দিয়ে ভরে দিয়েছেন। বসন্তে বসন্তে যে কবিকে ডাক পড়ত, তিনি তাঁর স্বরচিত বসন্তের গানখানি রচনা করেছিলেন ;—সমস্ত জীবনটাই প্রাণ-বসন্তের রাগিণীতে এসে সমাহিত হোলো। যে গান তিনি এই পৃথিবীর অধীশ্বর পরম-পার্থিব শোনালেন তা ফিরে ফিরে দেখা

দেবে, বর্ষামুখর রাত্রে দক্ষিণ হাওয়ায়, সেই গানগুলি একটি মর্ত্য-কবির স্মরণিকা হয়ে রইল। কিন্তু ঐ একই গানে দেখি মোহের অবসান, নিজের সৃষ্টির উপর কবির চরম নির্ভর নেই। তাঁর গানও ভুলে হারিয়ে যাক, সমস্ত সৃষ্টিলোকের সঙ্গীত শুনে তিনি গানের যে প্রেরণা পেয়েছিলেন তা তো হারাবে না। স্মরণ-বিস্মরণের বন্ধনে কবির গান বাঁধা থাকবে না, তিনিও না; যাক ভেসে তাঁর গান দিনের পসরাটুকু নিয়ে, প্রসন্ন মনে বিদায়ের বেলা কাটুক। কালের স্রোতে নৌকো অদৃশ্য হয়ে যায়, ভুলে যাওয়া সম্ভারকে চায় ফিরে নিতে। কিন্তু আপন গান সম্বন্ধে এই মুক্তির আনন্দ কত গভীর বেদনার মধ্য দিয়ে কবিকে অর্জন করতে হয়েছিল তা গানের সুরে, কথার আবেগে প্রকাশ পেয়েছে। 'গানের গান'গুলিতে আপন বাঁশিকে প্রতীক করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আপন গান সম্বন্ধে মর্মতম অনুভূতি জানিয়ে গেছেন। সমস্ত জীবনের সঙ্গে এক এবং অভিন্ন যে-চরম অজানা কথা তারই সুর কেবল লাগল তাঁর বাঁশিতে "বাঁশিটিকে জাগিয়ে গেলেম গানে গানে"। সেই গানের বাঁশিকেও রেখে যেতে হবে। আগোচরে সে-ই চুরি করে নিয়েছিল প্রাণের কথা, কবির জীবনের সকালে সন্ধ্যায় বিদায় আগমনীর কত সুর কত ছন্দ বাজল তাঁর বাঁশিতে। রাত্রি ভোর হোলো। শুভ্র শরৎপ্রাতে একই সঙ্গে অবসান এবং নূতন জাগরণ। শিউলি ফুলের মতো গানগুলি পড়ে থাক, সুন্দর অবসান হোক তাদেরও। শিশিরাশ্রুতে পড়েছে আশ্চর্য প্রভাতের আলো;

গানের গানে এই আলোর জাগরণ
আলোর বেদনা দেখতে পাই।

বাংলাদেশ যে গানের দেশ এ-সত্য আজ প্রমাণিত হয় নি, হয়েছে বাংলা সাহিত্যের প্রত্যূষ-লগ্নে কেন্দুবিল্বের জয়দেব থেকে স্থরু ক'রে শান্তি-নিকেতনের রবীন্দ্রনাথ অবধি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস একটানা স্বরের ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। মাঝে মাঝে তাল-যতি হিন্দোল-বেহাগের সামান্য যা' একটু রকম-ফের! দেখতে পাই, গীতি-কথার পাকে-চক্করে চণ্ডী, মনসা, কালী আর রাধাকৃষ্ণের আবির্ভাব, তিরোভাব। তা' ছাড়া বাউল-ভাটিয়ালী আর মহুয়া-মলুয়ার কাহিনী তো চিরত্বের গৌরবই অর্জন ক'রে ব'সে আছে। তা-ও বাংলার সমাজে-ই শুধু নয়, বিদেশের সন্দিগ্ধ বিচার-ক্ষেত্রে-ও।

ভৌগোলিকের দৃষ্টি জরিপে ও বাংলার এ গানের রূপটিই বেশি করে ধরা পড়ে। ফসলের ক্ষেত থেকে শহরের ইট পাথর অবধি স্থরের ছোঁওয়ায় স্বপ্নময়। ধান কাটার গান আর ছন্দ-পেটানোর পাঁচালি আর কোন্ দেশে আছে আমরা জানি না। এমন কি, যে খেতে পায় না সে গান গেয়েই ভিক্ষে করে। এমন দেশে গীত-গোবিন্দের কবি আর গীতাঞ্জলির কবি আবির্ভূত হবেন না তো হবেন আর কোথায়?

এজন্যই বলতে বাধা নেই, গানের রাজা রবীন্দ্রনাথ একটি আকস্মিক উদ্ভাবন ন'ন, ঐতিহাসিক সম্ভাবনার পরমতম দান। তাই ব'লে বিশ্ববিজয়ী প্রতিভার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করবার কোন কারণ থাকতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ সে-ক্ষেত্রে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত।

স্থবিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্যের সবশ্রেষ্ঠ দিক না হলেও সঙ্গীত যে একটি বৈদগ্ধ্যময় অবদান, সে বিষয়ে রসিকজন একমত; এবং আজকের দিনে সত্যিকারের আনন্দলাভ করি যখন দেখি রবীন্দ্র-সঙ্গীত আর শুধু শ্বেত সৌধমালার অর্গ্যান পিয়ানোতেই আবদ্ধ নেই, পর্ণ কুটিরেও তার স্থর মূর্ছনার অপূর্ব ঝঙ্কার। মুষ্টিমেয় অধিকারীর গণ্ডীবাঁধের

অশোভন উৎপাতে অপরূপ এই গীতিগঙ্গার ধারা কৃশভানু হয়ে অতি কষ্টে দিন যাপন করেছিল তা যেন—জানি না, কেমন করে হঠাৎ প্রবল বন্যার আবির্ভাব হলো। যে ছিল ব্যষ্টির সে হলো সমষ্টির। এবং সমষ্টির হলো বলেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রবীন্দ্র-সঙ্গীত ঘরোয়া ব্যাপার নয়, পথচারীর অন্তরে-ও। এইখানেই সৃষ্টির সার্থকতা। সমাজের প্রতি স্তরে তার রসধারা যদি অবাধ অধিকারে প্রবেশ-ই না করতে পারলো তা হলে বলবো এ-সৃষ্টির অপসৃষ্টি। তাতে করে না হয় শিল্পের অগ্রগতি, না বা সমাজের পরিপুষ্টি।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বেলায় এইখানে-ই বিতর্কের সুরু। অধিকার-ভেদ নিয়ে পীড়াদায়ক ভেদাভেদের শেষ আজো হয় নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও বহুবার এই পঙ্কিল দুর্ঘটনায় টেনে আনা হয়েছে। কিন্তু অবস্থা ঃ ন যযৌ ন তস্থৌ! কিছুদিন আগে এমনিধারা আর একটা তর্ক উঠেছিলো গানের কথা-ই বড়, না সুর বড় ? কথার তরফে ওকালতি করতে গিয়ে অকথ্য কথার অবতারণা করলেন অনেকে। সুরের প্রাধান্য প্রমাণ করতে গিয়ে অনেকে গাইলেন বেসুরো। চিরদিন যা হয়, শেষটায় হলো-ও তাই। অনেক কুয়াশার সৃষ্টি হলো বটে, কিন্তু লাভ হলো না কিছুই। সত্যিকারের গানের সূর্য উজ্জ্বলই রয়ে গেল আগেও যেমন, আজো তেমন। কারণ, আসল জিনিসটি হচ্ছে গান, কথা-ও নয় সুর-ও নয়। আবার দুটিই একযোগে। কথা তখনই গানের পর্যায়ে গিয়ে পড়বে যখন উপযুক্ত সুরের সংযোগ হবে তাতে। উপযুক্ত সুর বলছি এইজন্য যে, যে কোন কথার সঙ্গে যে কোন সুরের মিশ্রণকে গান বলে মেনে মিতে আমি রাজি নই।

একবার ভারত বিখ্যাত এক গুণীর মুখে দরবারী কানেড়ার একটি খেয়াল গান শোনবার সুযোগ ঘটেছিল আমার। অপূর্ব কণ্ঠস্বব, অপরূপ সুর বিস্তৃতি। ঘরের আবহাওয়াটি মূর্ছনায় ভরে উঠলো এক মুহূর্তে। কিন্তু গানের বাণী জড়িয়ে-জড়িয়ে এমনিভাবে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন যে, একবর্ণ-ও বুঝতে পারিনি।

পরে জিজ্ঞাসা করলুম—কথাগুলো অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলেন কেন?

শিল্পী উত্তর দিলেন—কাউকে বুঝতে দেবো না বলে।

—কেন?

—গানের মানেটা খুব খারাপ।

মনে মনে ভাবলুম, হায় রে দরবারী-কানেড়া! এরচেয়ে শিল্পী যদি বাণীহীন কণ্ঠালাপ করতেন তাতেও এ সুমধুর রাগিণীর বিন্দুমাত্র অঙ্গহানি ঘটতো না। তবু সেটা শুধু কণ্ঠালাপ-ই হতো। গানের পর্যায়ে তাকে ফেলতে কুণ্ঠাবোধ করতুম। কেউ যদি বলেন, রাগিণীর মাধুর্য প্রকাশ করাই এক্ষেত্রে প্রধান উদ্দেশ্য, তবে আমাদের বলবার রইলো—তার জন্য তো অসংখ্য শাস্ত্রীয় যন্ত্রই রয়েছে, বাণীর অপেক্ষা যারা রাখে না। কণ্ঠকে সেক্ষেত্রে রেহাই দিলেই ভাল হয় না কি?

আর একদল হয়তো প্রশ্ন করবেন—তবে কি আমরা ঐ-সব বড় বড় খেয়াল গানকে বিসর্জন দেবো?

আমাদের উত্তর হবে,—কথাগুলোকে-ই শুধু বেমালুম বর্জন করবো। রাগিণীর মর্মধ্বনি যাতে প্রতিরণিত হয় এমনধারা নূতন বাণী রচনা করিয়ে নেব একই ছন্দে, তিলমাত্র যতিচ্ছেদ না করে, এ পরিবর্তন না হলে আমাদের ধ্রুব পদ্ধতির সঙ্গীত-যাদুঘরে রক্ষিত নিশ্চল 'মমি'র মত নিষ্প্রাণ গৌরব নিয়ে শুধু ব'সেই থাকবে, গতিশীল জীবনের সঙ্গে কোন সম্পর্কই থাকবে না।

কথা ও সুরের এই যে সুষ্ঠু সংমিশ্রণ তাকেই বলবো পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীত। এ সঙ্গীতের সার্থক উদাহরণ প্রাচীন ভারতের ভজন, গজল, কীর্তন, বাউল আর রামপ্রসাদী। কালের আবর্ত পার হয়ে আজো যে তাদের আবেদন অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে তার একমাত্র কারণ, কাব্যময় কথার সঙ্গে উপযুক্ত সুরের মধুর সমন্বয়। আজকের দিনে রবীন্দ্র-সঙ্গীত-ও সে-সার্থকতায় মহীয়ান। "এমন দিনে তারে বলা যায়"—বলে কবি যা' যা' বলেছেন তা'তে গহন-গভীর বর্ষার মেঘ-মেদুরতা শুধু যে শব্দায়িত-ই হয়েছে তা নয়, সুস্পষ্ট একটা চিত্র নিয়ে ফুটে

উঠেছে, দেখতে পাই কথার এই ধ্রুবতাকে রহস্যময় করে তুলেছে সুরের ইন্দ্রজাল। শুনতে-শুনতে মনে এ প্রশ্ন কখনো জাগে না, এর কথাই বড় না, সুর বড়। মনে হয় শুধু এ একটি গান—পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীত। এখানে একটি কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, কথা ও সুরকে সঙ্গীতের সম্মান দান করবেন যিনি তাঁর দায়িত্ব কম নয়। বরঞ্চ এ কথাই বলা ঠিক হবে যে সঙ্গীত সত্যিকারের সঙ্গীত হয়ে উঠবার পথে সব চাইতে বেশী নির্ভর করে সুর শিল্পীর উপর, চলতি ভাষায় যাকে বলি 'গায়ক'। শুধু কণ্ঠস্বরের মাধুর্য থাকলেই চলবে না, তার সঙ্গে চাই নিবিড়তম অনুভূতি। গানের ভাষায় যে ভাবময় দ্যোতনা সুরের সোনার কাঠির অপেক্ষায় ঘুমন্ত হয়ে আছে, শিল্পীকে তা অনুভব করতে হবে সমস্ত হৃদয় দিয়ে। তবেই না তার কণ্ঠের সপ্তস্বরে লীলায়িত হয়ে উঠবে সমৃদ্ধ একটি সঙ্গীত। হৃদয়ের এ সম্পদ যাঁর আজো হয়নি তিনি আর যাই করুন, সঙ্গীতের কোমল-অঙ্গে বলপ্রয়োগ যেন না করেন এইটুকুই আমাদের অনুরোধ থাকবে তাঁর কাছে। অন্যান্য সঙ্গীত-শাখা সম্বন্ধে নীরব থাকলেও রবীন্দ্রনাথের গানের বেলায় একথাটি জোরের সঙ্গে প্রচার করবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

রবীন্দ্রনাথের গানের কথা মুদ্রিত পুস্তকে নির্ধারিত। স্বরলিপিতে সুরের রূপটিও সুনিশ্চিতভাবে স্থিরীকৃত। সে সুর উদ্ধার করে গাইতে হবে শিল্পীকে। এক্ষেত্রে রসানুভূতি না থাকলে গান না হয়ে উৎপাত হবার আশঙ্কাই বেশী। কিন্তু সত্যিকারের রসবেত্তাগুণী যিনি, তাঁর কণ্ঠে প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে গানের কথা ও সুর।

এইখানেই একটা উৎকট রকমের বির্তকের সুরু হয়েছে আজকাল। এবং আমরা যারা হচ্ছি নিতান্ত জনসাধারণ, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, বির্তকের মাত্রা চড়ে গিয়ে ক্রমে অশোভন বিবাদ-বিসংবাদে এসে দাঁড়িয়েছে। কথা উঠেছে অধিকার-অনধিকার নিয়ে।

একদল বলছেন স্বরলিপি দেখে গান শিখলে সুরের পূর্ণ মর্যাদা থাকা দূরের কথা বরঞ্চ অসম্মানই হবে।

বিরুদ্ধদল বলছেন, তা কেন? স্বরলিপি প্রকাশিতই হয়েছে গান শেখবার জন্য।

প্রথমদল প্রতিবাদ করলেন, তাতে করে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে গায়কের নিজস্বতা প্রবেশ করবে। পবিত্রতা নষ্ট হবে। দ্বিতীয় দল বিবাদ করলেন, কোন গায়কই তাঁর নিজস্বতা পরিত্যাগ করতে পারে না। এবং তা পারে না বলেই একই গান সুরে বিভিন্ন কণ্ঠে বিভিন্ন আকার নিয়ে ফুটে ওঠে।

প্রথম দল বলবেন, এটা ভুল।

দ্বিতীয় দল বলবেন, এটাই ঠিক।

এ বিসংবাদে আর কোন ক্ষতি হোক বা না হোক রবীন্দ্র-সঙ্গীত যে বিপর্যস্ত হতে বসেছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সাহিত্যে দেখতে পাই প্রত্যেকটি শতাব্দী এসেছে নূতন পরিবর্তনের সম্পদ নিয়ে। গানের কথাকে বাঁধবার জন্যে মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাব তখনো ঘটেনি। স্বরলিপির রেখাজালে সুরকে বন্দী করবার উপায়ও উদ্ভাবিত হয় নি। গায়কদলের শ্রুতি আর স্মৃতির উপরই নির্ভর করতে হয়েছে অনেকখানি। কাজেই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। বহু উদাহরণের মধ্যে একটি মাত্র উল্লেখ করলেই কথাটা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে। কবি চণ্ডীদাসের স্বহস্ত লিখিত পুঁথিতে পাওয়া গেছে ঃ—কে না বাহী বাত্র বড়াই কালন্দী নঈক'লে। এ ছিল তখনকার দিনের ভাষা। এ পদটি গায়কের মুখে মুখে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান দাঁড়িয়েছে—

—"কে না বাঁশি বাজায় বড়াই কালিন্দী নদী কূলে।"

এবং একথা-ও ঠিক যে আজকাল যে সুরে এ কীর্তনটি আমরা শুনি, হুবহু সে সুর চণ্ডীদাসের যুগে ছিল না। আবার বিভিন্ন কীর্তনিয়ার মুখে বিভিন্ন সুর শুনতে-ও আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। অথচ রসানুভূতির পথে কোথাও ব্যাঘাত জন্মে না। কথা ও সুরের আবেগময় মিশ্রণে হৃদয় আপ্লুত হয়ে ওঠে। প্রশ্নই ওঠে না কোথায় কিসের বিকৃতি ঘটলো। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বেলায়ও এ বৈজ্ঞানিক সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টাকে আমরা অপচেষ্টাই বলবো।

রবীন্দ্রনাথের গীতিকথা বদলে যাবার কোন কারণ নেই, যেমন চণ্ডীদাসের গিয়েছে, যেহেতু মুদ্রিত পুস্তক রয়েছে অবিকৃত "রূপ" বহন করবার জন্য। কিন্তু মানুষের কণ্ঠকে আশ্রয় করে যে সুরের বিকাশ তার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। স্বরলিপির নির্বাক অক্ষর কিছুতেই তাকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। কিংবা রবীন্দ্র-সঙ্গীতে একমাত্র অধিকারী ব'লে যাঁরা নিজেদেরকে চিরকালই মনে করে আসছেন তাঁদের সীমাবদ্ধ চেষ্টা-ও এ-প্রগতির পথে সীমারেখা টানতে পারে না।

বৃহত্তর সমাজের আদরের সামগ্রী রবীন্দ্র-সঙ্গীত। এ-সৃষ্টি কারুর নিজস্ব বিত্ত নয়। ঘরে ঘরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে ঋষি-কবির অপূর্ব গীতিকথা তাঁরই রচিত একমাত্র সুরে। কিন্তু সে-সুরে আসবে বিভিন্ন বৈচিত্র্য শিল্পীর কণ্ঠ-বৈশিষ্ট্য গুণে। এ ক্ষেত্রে ইংরাজীতে যাকে বলে "AUTHORITY" তার অস্তিত্ব মেনে নিতে আমরা রাজী নই। এমন কি কেউ যদি স্বয়ং গুরুদেবের নামাঙ্কিত পাঞ্জা হাতে করে বলেন, আমি যে সুরে গাইবো সে-সুরই একমাত্র প্রামাণ্য সুর, তাহলেও আমাদের বলবার থাকবে যে আপনার এই সুর শ্রেষ্ঠ-তর শিল্পীর কণ্ঠচাতুর্যে যদি মধুরতর এবং বিচিত্রতর হয়ে ওঠে তাতে আপত্তি করবার কি আছে, যে আপত্তি চিরকালই আপনারা করে আসছেন? শিল্পীর নিজস্ব গায়ক ও আপনারা স্বীকার করবেন না? কণ্ঠশিল্পী তো আর মাছিমারা কেরানী নন্ যে যদৃষ্টং তল্লিখিতম্, বা এক্ষেত্রে যৎ শ্রুতং তদগীতম্।

যাঁরা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ঈশ্বর-চিহ্নিত বাহক বলে নিজেদেরকে মনে করেন, তাঁদের স্বপক্ষে নাকি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন, "আমার গানের উপর যেন STEAM ROLLER কেউ না টানে।" অতি সত্য কথা। কিন্তু কথাটি সত্য তাদের সম্বন্ধে যারা STEAM ROLLER-এর কারবারী হয়ে গায়ক সেজে বসেছেন। এবং সে সম্প্রদায় যে শুধু পাণ্ডববর্জিত দেশেই লক্ষিত হয় তা নয়, খাস হস্তিনাপুরেও তাদের প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট। নিষ্প্রাণ কণ্ঠ আর

নিবেদ্য অন্তর নিয়ে যাঁরা সঙ্গীত-সাধনায় প্রবৃত্ত হন তাঁদের অপচেষ্টাকে STEAM ROLLER চালানো ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এ দলের কৃচ্ছ্রসাধকদের বজ্রমুষ্টি থেকে কোমল দেহ-গীতিকলাকে বাঁচাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ওরকম উক্তি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর রচিত সঙ্গীতসুধা গণ্ডীবদ্ধ হয়ে থাক্ এ-কামনা তিনি কোনদিনই করেন নি। বরঞ্চ বিশ্বকবির উদার মনের অপার দাক্ষিণ্যের পরিচয় পাই যখন দেখি স্বরচিত দু'একটি গীতিকাব্য সুর সংযোগের অনুমতি বাইরের দু-একজন শিল্পীকে তিনি আনন্দের সঙ্গেই দান করে গেছেন।

এজন্যই বলবো, অধিকারচ্যুত হবার আশঙ্কায় যাঁরা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রচার-পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন জনসাধারণের বিচারে তাঁরা ক্ষমার্হ নন কোন ক্রমেই। তাছাড়া গাঙ্গোত্রীর প্রবল ধারার সম্মুখে তৃণখণ্ডের মত ভেসে গিয়ে তাঁরা নিজেদেরকে হাস্যাস্পদ করে তোলবার আয়োজনই করছেন শুধু। কারণ সমাজ-বিজ্ঞানের নিয়মই হচ্ছে এই যে-বস্তু সমাজের প্রাপ্য, সমাজ তা নিজস্ব ক'রে নেবেই।

যাঁরা যন্ত্রসঙ্গীত ভিন্ন অন্য সব সঙ্গীত অশুদ্ধ, অতএব হেয় বিবেচনা করেন, তাঁদের জন্য এই প্রবন্ধ লিখ্‌ছি না, যাঁরা মনে করেন যে হিন্দু-সঙ্গীতের ইতিহাস অবনতির ইতিহাস তাঁরা আমার প্রচেষ্টাকে কৃপার চক্ষেই দেখবেন, অতএব প্রতিদানে তাঁদেরকে কোন অনুরোধ পর্যন্ত করতে সাহস হয় না। যাঁরা বলেন, দেশে বাঙ্‌লা গানেরই ভবিষ্যৎ আছে, হিন্দুস্থানী ঢঙ্‌ কিংবা হিন্দুস্থানী গানই চলবে, বাঙ্‌লা গানের আয়ু দু-দিনেই শেষ হবে,—তাঁদের কোনো প্রবন্ধই আদ্যোপান্ত পড়ার প্রয়োজন হয় না। তাঁদের দিব্যচক্ষুতে সমগ্র ভবিষ্যতের আভাস সুস্পষ্ট।

আমি লিখছি তাঁদের জন্য যাঁদের ইতিহাসের যুক্তির ওপর বিশ্বাস আছে, সঙ্গীতে কথাকে সাপের বিষের মত নেই নেই করে উড়িয়ে দিতে চান না, এবং হিন্দুস্থানী সুরপদ্ধতিটাই বাঙ্‌লা অঞ্চলের ধ্রুবপদ্ধতির ভূমিকা মানেন, এবং তুলনামূলক বিচারে বুদ্ধি এবং ঘটনাকেই প্রধান করেন। মূল্যদান সম্বন্ধে আমি পাঠকবর্গকে শ্রীবৎস চিন্তার গল্পটি স্মরণ করাতে চাই। মূল্যদানের মিল গরমিল দু'ধারেই সমান নজর রাখতে হবে। তুলনার ক্ষেত্রটি যদি সমান না হয়, তবে তুলনাটি হবে সংস্কার। টাকাকে আনা দিয়ে ভাগ দেবার পূর্বে তাকে আনাতে পরিণত করে পঞ্চম শ্রেণীর বালক, কিন্তু হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ভাল না বাঙ্‌লা গান ভাল আলোচনা করার সময় এই বালকসুলভ ফন্দীটি বয়স্থরাও ভুলে যান। তাঁদের দোষ নেই, কারণ পথ ছোট, আগেপিছে, জয় পরাজয় ইত্যাদির বিচারকেই শিক্ষা বলা হয়। প্রকৃতিগত পার্থক্য, পরিপ্রেক্ষিতের ভেদ, পরিণতির হারের বৈষম্য বোঝবার পক্ষে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি একটি প্রধান অন্তরায়। কিন্তু প্রকৃত তুলনা ও মূল্যবিচার আমাদের করতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সমালোচনার জন্য তাঁর পূর্ববর্তী সময়কার বাঙ্‌লাদেশে উচ্চ সঙ্গীতের ইতিহাস জানা চাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে ইতিহাস কেউ লেখেন নি। আমরা কেবল জানি যে বাঙ্‌লাদেশে ধ্রুপদের ও টপ্পার যতটা প্রচলন হয়েছিল খেয়াল ঠুংরীর ততটা হয়নি। কৃষ্ণধনবাবু যন্ত্রকেই সেজন্য দায়ী করেছেন। তাঁর মত আংশিকভাবে সত্য। কারণ তারের যন্ত্রের প্রভাব সুবিস্তৃত থাকলে কণ্ঠসঙ্গীতে শ্রুতির প্রাধান্য ধরা পড়ত; এবং বাঙালী গায়কের কণ্ঠ শ্রুতিশুদ্ধ ছিল কেউ বলেন নি, অন্ততঃ থাকলে অত সহজে হারমনিয়মের কৃপায় কণ্ঠের সর্বনাশ হত না। কিন্তু উপযুক্ত সঙ্গতের জন্যই ধ্রুপদকে আমরা সহজে গ্রহণ করতে সমর্থ নই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে গোলাম আব্বাস নামে একজন বিখ্যাত পাখোয়াজী বাঙ্‌লাদেশে এসে বসবাস আরম্ভ করেন, তাঁর দুজন বিখ্যাত শিষ্যের নাম নিতাই ও নিমাই চক্রবর্তী। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের ভাই কেশব মিত্র এবং ঝামাপুকুরের মুরারী গুপ্ত মহাশয় তাঁদেরই ঘরোয়ানা। বিংশ শতাব্দীর প্রায় সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী পাখোয়াজীই কেশববাবু ও মুরারীবাবুর শিষ্য। নগেনবাবু, দুর্লভবাবু, দীন হাজরা প্রভৃতি বাদক সেদিন পর্যন্ত বাঙ্‌লাদেশে ধ্রুপদের মর্যাদাদানে সহায়তা করেছেন।

এ দেশের ধ্রুপদের প্রচলনের অন্য কারণ বোধ হয় লোকসঙ্গীতের উন্নতি। অন্যান্য প্রদেশে লোকসঙ্গীত বরাবরই ছিল—কিন্তু আমাদের কীর্তনের মত উৎকর্ষ লাভ করেনি, কীর্তনের সুর ও তালের বৈচিত্র্য হয়তো হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সংঘাতেই সৃষ্ট। তবু ভজনের গায়কী অপেক্ষাকৃত একঘেঁয়ে লাগতে পারে, এ কথা প্রাদেশিক হিংসার যুগে ধ্রুবপদ্ধতির জন্মভূমিতে অ-বাঙালীরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। লোক-সঙ্গীতের প্রভাবের সঙ্গে ধ্রুপদ প্রচলনের যোগ আছে। সে যোগ আন্তরিক। লোক-সঙ্গীতে তানের অভাব, ধ্রুপদে তান নেই; লোক-সঙ্গীত অর্থমূলক, অর্থও আবার সাধারণতঃ আধ্যাত্মিক, রূপ তার কবিতার রস তার অনুভূতির; অন্য ধারে পুরাতন ধ্রুপদের অর্থ তখনও

উচ্চারণ বিভ্রাটে অস্পষ্ট হয়নি, রচনাগুলি ছিল সাধারণতঃ ধর্মভাবাপন্ন, কাব্যাংশও তার হেয় ছিল না। তা ছাড়া, কথার গায়কী উচ্চারণ পদ্ধতিতে খেয়ালিয়ার অপেক্ষা ধ্রুপদিয়ার সঙ্গে বাউল কীর্তনিয়ার মিল নিবিড়তর। লোক-সঙ্গীতে অন্তের স্বরবর্ণ টেনে এবং দম ছেড়ে গাওয়া হয়, তাই গানের পক্ষে বাঙ্‌লা ভাষার স্বাভাবিক অনুপযোগিতা শ্রোতা ততটা অনুভব করতে পারে না। খেয়ালে কথার যেখানে ফাঁক, সেইখানেই তান চলে এবং তানের জন্য স্বরবর্ণের প্রয়োজন। উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ ব্রজভাষায় রচিত হত, সে ভাষার সঙ্গে ব্রজবুলি কিংবা পূর্ববঙ্গের ভাষার গরমিল যথেষ্ট থাকলেও অন্ততঃ দুটি একটি বিষয়ে, যেমন যুক্তবর্ণের ও স্বরবর্ণের ব্যবহারে কিছু মিল পাওয়া যায়। এই মিলনই গায়কের অবলম্বন। পরে এই বিষয়ে আলোচনা করবো। ভাষা বাদ দিলেও লোক-সঙ্গীতের ঋজুতা, গাম্ভীর্য, ঐশ্বর্যহীনতা, সরলগতি সংযম, অন্তর্মুখিনতা ধ্রুপদকে যতটা স্মরণ করায় খেয়াল ততটা করায় না। এই প্রকার মিলের জন্য বাঙ্‌লাদেশে ধ্রুপদের প্রচলন খেয়াল অপেক্ষা সহজ হয়। বলা বাহুল্য, সব অঞ্চলের কীর্তন সমানভাবে সহজ নয়। এমন কীর্তনও শুনেছি যার ঐশ্বর্যের সঙ্গে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এর স্থাপত্যেরই তুলনা চলে।

যাঁরা সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় আস্থা রাখেন না, তাঁরা নামের ভক্ত। অবশ্য নামগুলি ইতিহাসের রাস্তায় স্তম্ভের মতন। বিষ্ণুপুরে অনেক দিন পূর্বেই হিন্দুস্থানী পদ্ধতি এসেছিল। কারণ ছিল ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক। বিষ্ণুপুরের স্বাধীন রাজ্য বৈষ্ণব হবার পরেই সেখানে সুকুমার শিল্পের একটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে। কিন্তু বেহার অঞ্চল থেকে উড়িষ্যা যাবার পথে বিষ্ণুপুর পড়ে সেজন্য বিষ্ণুপুর কেবল কীর্তনের হল না, উত্তর প্রদেশের মুসলমানোচিত প্রকর্ষের প্রভাব সেখানে স্বীকৃত হল। কীর্তন ছড়িয়ে পড়ল বাঁকুড়ায়, এবং বাহাদুর খাঁ বিষ্ণুপুরে ধ্রুবপদ্ধতি শেখাতে আরম্ভ করলেন। তানসেনের বংশধর জ্ঞান খাঁ, প্যার খাঁ ও জাফর খাঁর মত বিখ্যাত গায়কের ঘরোয়ানা বেহার অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। বেথিয়া তখন বাঙ্‌লার অন্তর্গত ছিল বলা যায়।

মহারাজ নওয়লকিশোর ও আনন্দকিশোর উৎকৃষ্ট রচয়িতা ছিলেন। রাধিকাবাবুর গুরু প্রসাদ মিশ্র এবং তাঁর ভাইএরা কাশীর লোক হলেও বেথিয়া থেকে কলকাতায় আসেন। পূর্ববঙ্গের অনেক জমিদারবর্গ ধ্রপদিয়া পালন করতেন। গোবরডাঙার গঙ্গানারায়ণবাবুই সর্বপ্রথম পশ্চিমাঞ্চল থেকে মুসলমান ওস্তাদের ধ্রুপদ ও খেয়াল শিক্ষা করে দেশে ফেরেন। এই সময় রানাঘাট, শ্রীরামপুর ও পানিহাটি প্রভৃতি গঙ্গার উপকূলস্থ গণ্ডগ্রামে ধ্রুপদ গানের মর্যাদা ছিল। মৌলাবক্সও এই সময় কলকাতায় আসেন এবং বাঙ্‌লাদেশে পর্যটন করেন। পূর্বোক্ত কারণে বাঙ্‌লাদেশে ধ্রুপদের প্রচলন হয়। রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে নিকটস্থ যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরদের যেসব বিখ্যাত ধ্রুপদিয়ার সমাগম হত, তাঁদের মধ্যে মৌলাবক্স, যদুভট্ট, বিষ্ণু ভট্টই সর্বপ্রধান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উচ্চ-সঙ্গীতে একজন মনোযোগী ছাত্র ছিলেন। তিনি রাগ-রাগিণী পিয়ানোতে বাজাতেন এবং সুরের মিশ্রণ ও বিস্তার নিয়ে নানারকমের পরীক্ষা করতেন। পিয়ানোতে তান বিস্তার কিংবা আলাপ সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথকে বাল্যকাল থেকেই সেই সব পরীক্ষায় সহায়তা করতে হত উপযুক্ত কথা যোগান দিয়ে। বলা বাহুল্য, বাড়ির আবহাওয়ায় ছিল সংযত স্বাধীনতা এবং সুগম্ভীর ধর্মভাব, যেটি ধ্রুপদের অনুকূল। অতএব বলা চলে উচ্চ-সঙ্গীতের মধ্যে ধ্রুপদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।

ধ্রুপদের চিহ্ন কি? প্রায় প্রত্যেক ধ্রুপদ গানেই চারটি তুক কিংবা পদ থাকে। অলঙ্কারেব মধ্যে মীড়, গমক ও আশ ব্যবহৃত হয়। ধ্রুপদের রূপ নির্দিষ্ট। আলাপের পর অস্থায়ী গেয়ে অন্তরা গাইতে হয়, বাকী দুইটি তুক বা পদ প্রায় অস্থায়ী ও অন্তরারই পুনরাবৃত্তি। তান চলে না ধ্রুপদে। তানের মধ্যে চৌতাল, আড়া চৌতাল, তেওরা, ঝাঁপ, সুরফাক্তা, পঞ্চমশোয়ারির ব্যবহারই প্রশস্ত। কিন্তু ধ্রুপদে তালের বাহাদুরী দেখান অন্যায়। গানের শেষে যৎসামান্য বাঁটোয়ারা, আড়ি দেড়ি, কুয়াড়ি বিসম অনাঘাত দোলেই যথেষ্ট হয়। ধ্রুপদের বিষয় হল ধর্ম, প্রকৃতির বর্ণনা ও রাজার

গুণগান। তার গতি গজের, যেমন সর্পগতি হল ধামারের। ধ্রুপদের রস শান্ত ও গম্ভীর—বাহুল্য বর্জিত। তার ঐশ্বর্য অন্তরের। যাঁর কণ্ঠে তান অজস্র, স্বর কম্পমান, যাঁর স্বভাবে সংযম নেই তাঁর পক্ষে প্রকৃত ধ্রুপদী হওয়া অসম্ভব। ধ্রুপদের চার প্রকার বাণী আছে। তার মধ্যে গণ্ডরবাণী ও গোবরবাণী বেশী চলে। খাণ্ডবাণী কিংবা গহরবাণী গাওয়া অত্যন্ত শক্ত। যাঁদের এই কয়প্রকার বাণী শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা জানেন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে voice production বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। কিন্তু ধ্রুপদ গানের বিষয়ে বৈচিত্র্য কম, তার রচনায় ভাষায় কথা বেশী ও কথাগুলি চতুষ্কোণ কাষ্টখণ্ডের মতন, অতএব তার গায়কী রীতিতে স্বাধীনতা প্রকাশের সুযোগ খেয়াল এবং ঠুংরী অপেক্ষা কম সকলেই স্বীকার করেন।

আজকাল অনেকের মুখে শোনা যায় যে খেয়াল ও ঠুংরীতে গায়কের নিজের কৃতিত্ব দেখাবার স্বাধীনতা আছে। বলা বাহুল্য উচ্চশ্রেণীর খেয়াল ও ঠুংরী রচনায় সুরের বিকাশ অনিয়ন্ত্রিত নয়। কোন্ তানের পর কোন্‌টি আসা চাই তার নিয়ম আছে, সে কথা ভালো ঘরোয়ানার গান শুনলেই বোঝা যায়। তা ছাড়া খেয়ালের তান রাগিণীর আশ্রয়ে, তার মূল প্রকৃতির অবলম্বনেই তান ফুটতে পারে সব ভাল খেয়ালিরাই জানেন। ঠুংরীতে এই তানবিস্তার পদ্ধতির ওপর আছে নায়ক-নায়িকা ও তাদের মেজাজ। খেয়াল ঠুংরীতে তানের স্বাধীনতা যে যথেচ্ছাচারিতা নয় বলাই বাহুল্য।

মোদ্দা কথা এই—রবীন্দ্রনাথ শিশুকাল থেকেই সংযত সঙ্গীতেই পরিপুষ্ট। তাঁর প্রতিভা অল্প বয়সেই বিকশিত হয়। তাঁর মতন ব্যক্তির এই প্রকার শিক্ষাদীক্ষায় এবং ঐ প্রকার বেষ্টনীতে যা করা সম্ভব তাই তিনি করেছিলেন। তিনি ধ্রুপদের গুণ গ্রহণ করলেন, গমকের হুঙ্কার ত্যাগ করলেন এবং বৈচিত্র্য আনলেন আধার, বাঙ্‌লা ভাষা। তাঁর বৈচিত্র্য সাধনের উপায় একাধিক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষানবিশীর কাল তখন উত্তীর্ণ হয়েছে, তিনি আর সুরে কথা

বসাচ্ছেন না। রাধিকাপ্রসাদ তখন আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক। রবীন্দ্রনাথ কবিতার উপযুক্ত সুর খুঁজতেন রাধিকাপ্রসাদের কণ্ঠে। তখন তিনি কবি এবং সুরের প্রযোজক মাত্র ; অর্থাৎ কথায় সুর বসানই ছিল তাঁর সমস্যা। এই যুগের তাঁর অনেক রচনা এখনও ওস্তাদের মুখে শোনা যায়। তাঁরা বলেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আজকাল পতন হয়েছে। তাঁদের মন্তব্য বিচার করলে হয়ত পূর্ব-পরিচয়ের আনন্দটুকুই ধরা পড়বে। 'সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি' শুদ্ধ ইমনকল্যাণ, অতএব গানটি ভাল—এক্ষেত্রে শুদ্ধতার অর্থ পুনরাবৃত্তি ; যথাযোগ্যতা গৌণ—যদিও স্বীকার করি এ যুগে বেশীর ভাগ গানেই সুর ছিল কবিতার উপযুক্ত। কিন্তু এ যুগের রচনা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই কথা ও ভাবের উপযোগী না হলেও সুরটা যদি সঙ্গীতজ্ঞ শ্রোতার মনে কোন বিখ্যাত হিন্দুস্থানী গান স্মরণ করাতে সমর্থ হত, যদি সুরটা হুবহু তার নকল হত তাহলেই শ্রোতা সন্তুষ্ট হতেন। অতএব কেবল উপযোগিতা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই যুগের গানকে যাচাই করা যায় না। অতএব উপযোগিতাই সঙ্গীত রচনা ও রচয়িতার মূল্য নির্ধারণ করবে।

উপযোগিতার অর্থ হল এই—কথা ও সুরের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তাকে স্বীকার করা, তার প্রকৃতি উদ্‌ঘাটিত করা এবং সেই প্রকৃতির রূপ দেয়া। তদ্‌ভিন্ন কবিতার মূল ভাবটির সঙ্গে আমাদের সংস্কারগত রাগিণীর মূল ভাব কিংবা মূর্তির মিলন-সাধনাকেও উপযোগিতা বলা হয়।

একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কবিতাটি মেঘলা দিনের বর্ণনা, তার মধ্যে মেঘ, বিজলী, ময়ুর, হানা প্রভৃতি গুরু গম্ভীর কথা রয়েছে। আমাদের সংস্কারে মল্লারের সঙ্গে বর্ষার যোগ আছে। এমনও শুনতে পাই—অমুক ওস্তাদ মল্লার গেয়ে শীতকালে বৃষ্টি আনলেন। অতএব কবিতাটির প্রকৃষ্ট মিলন হবে মল্লারের সঙ্গে। কিন্তু এই প্রকার মিলন সাধনের কোন সাঙ্গীতিক মূল্য সেই কথা ও সুরের মধ্যে সম্বন্ধকে প্রকাশ করাই যদি সমস্যা হয় তবে তাদের মধ্যে গোটা কয়েক সন্ধি

সর্ত থাকা চাই। সন্ধির সর্ত তৈরী করবার সময় মনে রাখতে হবে বাঙ্‌লা কবিতার ভাষা, অর্থ, ছন্দকে, বাঙ্‌লাদেশের প্রচলিত গায়কী পদ্ধতিকে। সন্ধি কখনও একতরফা ডিক্রী নয়, পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান, প্রদানই তার বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ, প্রত্যেককেই সন্ধির সময় কিছু না কিছু ছাড়তে হয়। ছাড়বার সময় পাবার প্রত্যাশা থাকেই থাকে। ঐ যুগের রবীন্দ্র-সঙ্গীতে পাওয়া গেল সুরের মিশ্রণ, বিষয়ের বৈচিত্র্য, এবং আশের আধিক্য। মীড় রয়েই গেল, বিদেশী সঙ্গীতের হারমণিকস এবং যন্ত্রসঙ্গীতের অলঙ্কারের পরীক্ষা সফল হল না। ছাড়া হল, রাগ-রাগিণীরও ব্রজভাষার যতটা শুদ্ধতা তখন ছিল তাকে এবং সেই সঙ্গে তার পাশে যে সংস্কার গড়ে উঠেছিল তাকেও। সুরের মিশ্রণ সম্বন্ধে কেবল এইটুকু বললেই চলবে যে, তাঁর প্রদত্ত সুরে গুরুচণ্ডালী দোষ বর্তায়নি। অনেক বড় ওস্তাদ এই বিষয়ে তাঁর চেয়ে অনেক বেশী পাপী। ইমন বেলাওল, ভৈরো বাহারের গান অনেক বাঙালী যুবক আজকাল গেয়ে থাকেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুর-সৃষ্টির সম্বন্ধে কিছু লিখছি না অতএব সুর ও কথার সন্ধি সর্তে ফিরে যাওয়া যাক।

বাঙ্‌লা ভাষায় স্বরবর্ণের যে বৈশিষ্ট্যগুলি সঙ্গীতালোচনার পক্ষে জানা প্রয়োজনীয় সেগুলিকে নিম্নলিখিত চারটি মন্তব্যে প্রকাশ করা যায়।

(১) অর্থ পরিবর্তনে স্বরবর্ণের হ্রস্বতার বা দৈর্ঘ্যে কোন তারতম্য ঘটে না—যেমন দিন্ দিনকাল ও দীন-দুঃখী একই উপায়ে উচ্চারিত হয়।

(২) যে নিঃশ্বাসটুকু নিয়ে বাক্যারম্ভ করা যায় তার ঝোঁকে যত কথা উচ্চারিত হতে পারে—তারাই একটি সমষ্টি হিসেবে বিবেচিত হয়।

(৩) বাঙ্‌লা উচ্চারণের ঝোঁক পড়ে সাধারণতঃ এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত বাক্যের বা বাক্যাংশের প্রথম শব্দে। এ ছাড়া অর্থভেদেও ঝোঁক পড়তে পারে। অন্য কোন বাধা না থাকলে হসন্ত বর্ণের পূর্ব বর্ণও ঝোঁক দিয়ে উচ্চারিত হয়।

(৪) ক্রিয়াপদ বাদ দিলে বাঙ্‌লা শব্দ স্বরান্ত নয়, হসন্তান্ত।

ব্রজভাষায়, যে ভাষায় ধ্রুপদ রচিত হত তার স্বরবর্ণের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন প্রকৃতির। তার স্বরোচ্চারণরীতিতে অর্থের পরিবর্তনে তারতম্য ঘটে। যেমন দিন ও দীনদয়াল। তার ঐক্য কথাগুচ্ছে আবদ্ধ, শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়মে নয়। তাতে উচ্চারণের জোর দেওয়া হয় উপান্ত সরবর্ণে।

ছুটি ভাষার স্বরবর্ণের ব্যবহারে যদি মোটামুটি ঐ ধরনের পার্থক্য থাকে তবে রবীন্দ্রনাথের রচিত বাঙ্‌লা গানে স্বরবর্ণের বৈচিত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়েছিল স্বীকার করতে হবে। অন্ততঃ, আকারের বেলা ত বটেই। (ধরা যাক রাখাল, কিংবা মাতাল। ব্রজভাষার নিয়মানুসারে প্রথম স্বরবর্ণ ছোট হয়ে এবং শেষেরটি দীর্ঘতর হয়ে রাখাল রাখোয়াল-এ এবং মাতাল মাতোয়ালায় পরিণত হল) বাঙ্‌লা গানে স্বরবর্ণের স্বাভাবিক সঙ্কোচে ক্ষতি হল তানের, কারণ সাধারণতঃ খেয়ালে প্রথম স্বরবর্ণের আশ্রয়ে তান নেওয়া হয় না, শেষের ও উপান্ত স্বরবর্ণেই নেওয়া হয়। কিন্তু ধ্রুপদে সে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, কারণ তালের ব্যবহার নেই সেখানে। অতএব বাঙ্‌লা ধ্রুপদ রচনা অপেক্ষাকৃত সচল বাঙ্‌লার স্বাভাবিক গাঢ় সম্বদ্ধতা ততটা মারাত্মক নয় ধ্রুপদে যতটা মারাত্মক বাঙ্‌লা খেয়াল। স্বরবর্ণ সঙ্কোচের জন্য যে ক্ষতি হয় বাঙালী গায়ক তার পূরণ করেন 'য়' দিয়ে, যেমন 'মা আমার' কথা ছুটির মধ্যকার অবকাশ অতিক্রান্ত, হয় 'মা-য়-আমার' glide-এর দ্বারা।

বাঙ্‌লা ভাষার breath group ধ্রুবপদী অলঙ্কারের নিতান্তই অনুকূল, কিন্তু খেয়ালের প্রতিকুল। মীড় ও গমক স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের বিরামের উপযোগী, বাঙ্‌লা ভাষা যেকালে আমাদের মাতৃভাষা তখন আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথার অর্থ আমাদের মনে আসবেই আসবে। গান যখন কবিতাতেই লেখা হয়, তখন উচ্চারণ করতেই হবে। ব্রজভাষার অর্থ আমরা বুঝি না, তাই তার শুদ্ধবাণীর দায়িত্ব বাঙ্‌লার অপেক্ষা কম। কম বলেই অবশ্য সুর উপভোগের সুবিধা। অতএব একধারে যেমন ক্ষতি অন্যধারে

তেমন সুবিধা। সুতরাং দেখা গেল যে বাঙ্‌লা ভাষায় অনূদিত হয়েই ধ্রুপদের আড়ষ্টতা কমে যায়। বৈচিত্র্যের অবসর পাওয়া যায়। কিন্তু ধ্রুপদাঙ্গের বাঙ্‌লা গান রচনা করে রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। নানা বিষয়ে তিনি গান রচনা করতে লাগলেন, সবগুলি কিছু ধ্রুপদাঙ্গের হতে পারে না। তাঁর রচনায় নানা প্রকারের মনোভাবের মুডএর প্রকাশ হতে লাগল। এখন সমস্যা উঠল সেই সব বিচিত্র রচনার উপযুক্ত সুর দেওয়া নিয়ে।

এইখানে বাঙ্‌লা ছন্দের আড়ষ্টতা ও একঘেঁয়েমি কিভাবে রবীন্দ্রনাথ ভাঙলেন আমাদের জানতে হবে। পুরাতন ছড়া বাদ দিলে বলা চলে যে বাঙ্‌লায় পয়ারেরই রাজত্ব ছিল। পয়ার ভাঙলেন ভারতচন্দ্র মাত্রাবৃত্ত ছন্দ দিয়ে। তবু বাঙ্‌লার ঠাসবুনানি হাল্কা হল না, কারণ যুগ্ম শব্দে গাঁটের মতন। রবীন্দ্রনাথ এসে যুগ্মবর্ণকে দু'মাত্রায় ব্যবহার করলেন। এতদিনে বাঙ্‌লা ছন্দ স্বাধীন হল, কারণ শব্দের মধ্যকার অবসরটুকুর ধ্বনিতে বিস্তারিত হয়ে মাত্রা-গোণার দাসত্ব দিলে ঘুচিয়ে। এই অবসরটুকু দীর্ঘ নয়, অতএব তাকে দীর্ঘ তানকর্তব্য দিয়ে ভরাট করা যায় না, জোর তার মধ্যে আশ ব্যবহার চলে। মীড় ও আশের সাহায্যে কবিতার রূপ অনেকটা ফুটে উঠতে পারে। যতটা পারে ততটাই এই যুগের রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সার্থকতা। তবু কাব্যছন্দের দাসত্ব গেল না। পরের যুগে কথা ও সুর সমস্তরের। 'তিমির অবগুণ্ঠনে' গানটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কথা ও সুরের সন্ধি সর্তগুলি বিজেতা-পরাজিতের নয়, মিত্রমণ্ডলীর মিত্র ও একাধিক, কারণ 'কে তুমি'তে বিস্ময় ভাবটিও চমৎকার ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের সকল গানেই এই প্রকার সুর, কথা ও ভাবের অঙ্গাঙ্গি মিলন দেখা যায় বলছি না, কিন্তু বিস্তর রচনায় সম্পূর্ণ মিলনের সাক্ষাৎ পাই। সেই সব রচনাগুলি আমাদের সমস্যা পূরনের সার্থকতার পরিমাণদণ্ড হবে।

অতএব বোঝা গেল রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তান কেন নেই। বাঙ্‌লা ভাষায় লেখা সঙ্গীতে তানের সুযোগ কম। লেখক আবার ধ্রুপদে

অভ্যস্ত। ততটুকু তান সম্ভব যতটুকুর সুযোগ breath group-এর শেষে অর্থের ইঙ্গিতে এবং ছন্দ বৈচিত্র্যে পাওয়া যায়। তার বেশী তান দিলে রাগিণীর বিকাশ হয়ত হবে, কিন্তু ভাষা, ছন্দ, অর্থ ও সুরের ভারসাম্য নষ্ট হবে অর্থাৎ সঙ্গীত হবে না।' আমার বক্তব্য এই তানের উদ্দেশ্য আর সঙ্গীতের উদ্দেশ্য এক নয়। তান সুরের একপ্রকার অভিব্যক্তি সেটি রাগিণীর রূপ উদ্‌ঘাটনের ইতিহাস; সঙ্গীত হল পরিপূর্ণ সামগ্রী, ইতিহাসের দিকটা তার মুখ্য নয়। তান সুরের একপ্রকার অলঙ্কার, যেটি সুরের উপর বসাচ্ছেন গায়ক স্বয়ং। সঙ্গীতের অলঙ্কার প্রধানতঃ শ্রোতার মনে। তানে চাই স্বরবর্ণের দীর্ঘ অবসর সঙ্গীতের অবসর গাওয়ার পর, রেশে। তা ছাড়া, বাঙ্‌লা সঙ্গীতে বাঙ্‌লা ছন্দ ও ভাষার বৈশিষ্ট্যের জন্য এবং অর্থ ও ভাবকে অগ্রাহ্য করার অক্ষমতাহেতু তানকে নিতান্তই বশে রাখতে হয়। অর্থ-সম্ভার সর্বদাই সুরকে চাপা দিতে যাচ্ছে। তাই সঙ্গীত-রচয়িতারা সেই গুরুভারকে লঘু করতেই সচেষ্ট হয়েছেন এতদিন। সঙ্গীতে সুরের মিশ্রণ এবং বৈচিত্র্যের সাহায্যে গুরুভারকে লঘু না করে সহজে বহন করা—এই হল রবীন্দ্রনাথের একটি কৃতিত্ব।

অনেক দিন থেকেই গুরুদেবের গানের সঙ্গে উচ্চাঙ্গ হিন্দি গানের সম্বন্ধ নিয়ে নানারূপ আলোচনা চলে আসছে। একদল বলছেন, উচ্চাঙ্গের হিন্দি গান গাইবার সময় গায়কদের যে স্বাধীনতা দেওয়া হয় গুরুদেবের গানে তা থাকবে না কেন? আর অপর দল মনে করেন সুর-বিহারের যে স্বাধীনতা উচ্চাঙ্গের হিন্দি গানের গায়কদের দেওয়া হয়েছে তারা তার অপব্যবহার করে। তারা সুরের অলংকারের প্রতি বেশী জোর দেয় বলে গানের সময় কথার কোন মূল্যই খুঁজে পাওয়া যায় না। এইরূপ ত্রুটি গুরুদেবের গানে ঘটেনি। এ ছাড়া রাগমিশ্রণেও গুরুদেব হিন্দি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বাধ্যবাধকতার নীতিকে ভঙ্গ করে গানে সুর যোজনায় যে মুক্তির আলো দেখিয়েছেন, তা উচ্চাঙ্গ হিন্দি সঙ্গীতের কাছে আদর্শ হওয়া উচিত। এইভাবে একদল গুরুদেবের গানে দেখেছেন স্বাধীনতার অভাব, অপর দল দেখছেন তাঁর গানে কথা ও সুরের সমান প্রাধান্য ও মিশ্রণ বিষয়ে মুক্ত মনের পরিচয়। অর্থাৎ সহজ কথায় এই দাঁড়াচ্ছে যে, যেখানে উচ্চাঙ্গের হিন্দি গান মুক্তির পরিচয় দেয় সেখানে গুরুদেবের মন মুক্ত নয়, আবার গুরুদেবের মন গানে যেখানে মুক্ত সেখানে উচ্চাঙ্গের হিন্দি গান মুক্তির বিরোধী। এভাবে বাইরে থেকে দুটির প্রকৃতিতে পার্থক্য, বা দুটির মধ্যে ত্রুটি দেখা গেলেও ভ্রান্ত পথে চালিত নয়। দুটিরই পথ সুনির্দিষ্ট, সুনিয়ন্ত্রিত। লক্ষ্যস্থল উভয়েরই এক। কেবল চলেছে দুই পথে।

রাগিণী, কথা ও ছন্দে মিশে যে কণ্ঠসঙ্গীত আমরা শুনি, তাকে বলি গান। এভাবে দেখলে দেখা যাবে যে, উচ্চাঙ্গের হিন্দি গান থেকে সুরু করে লোক-সঙ্গীত পর্যন্ত সব গানই এক আদর্শে রচিত। কিন্তু এদের মধ্যে আসল পার্থক্য দেখা দেয় গায়কী নিয়ে। গাইবার সময় কে কোন্‌টার উপর বেশী জোর দিল তাই

নিয়েই বিভেদ। আসলে সেই রকম গীত-রীতির প্রভেদই দেখি গুরুদেবের গানের সঙ্গে উচ্চাঙ্গ হিন্দি গানের। অথচ এই স্বীকৃত পার্থক্যের কথা ভুলে গিয়ে আমরা উভয়কে এক ভেবে তুলনামূলক সমালোচনা করতে বসি। সমালোচনায় এইরূপ ভুল পথ ধরেছি বলেই দুই সঙ্গীতের মধ্যে দেখেছি বিরোধ এবং তার যে কারণ নেই তা বুঝতে হলে প্রথমেই সমগ্রভাবে ভারতীয় কণ্ঠসঙ্গীতের স্বরূপ নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার।

হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলে গানের ক্ষেত্রে বড় রকমের দুটি ভাগ বর্তমান। যে গান সুর বা রাগিণী, তাল বা ছন্দকে প্রাধান্য দিয়ে কথাকে তার নিচে স্থান দেয় সেই দলের গানের মধ্যে পড়ে উচ্চাঙ্গের হিন্দি গান, যা আমাদের দেশের ওস্তাদদের মুখে আমরা সব সময়েই শুনতে পাই। এই সব গান রাগিণী ও তালের ঐশ্বর্যে ও বৈচিত্র্যে ভরপুর। কিন্তু গায়কীতে আলাপ তান বিস্তার ইত্যাদি নানাপ্রকার অলংকারপ্রাচুর্যই এর বৈশিষ্ট্য। এখানে গায়কেরা কথাকে যে স্থান দেয় তার সঙ্গে তুলনা করা চলে আমাদের বাংলা দেশের প্রতিমার ভিতরকার বাঁশের কাঠামোটির। এটি না থাকলেও নয়, অথচ তার প্রকাশ মূর্তির সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠুক এ আমরা কিছুতেই চাইব না। সুতরাং যাঁরা প্রতিমা রচনা করেন তাঁরা সেই কাঠামোটিকে একেবারে গোপন করে মূর্তিকেই সকলের সামনে সুন্দর ছন্দোময় গঠনে গড়নে রঙের ছোপে ও তুলির টানটোন ইত্যাদি বিচিত্র অলংকারে সাজিয়ে তোলেন। হিন্দি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে আজকাল কথার অবস্থাটা হল অবিকল এই রকমের। উচ্চাঙ্গ হিন্দি গানের মূল উদ্দেশ্য হল সুর বা রাগিণীর সাহায্যে অহেতুক আনন্দের সাধনা। তাদের কাছে কথা থাকা না থাকা সমান। যে কারণে কথা-নিরপেক্ষ যন্ত্রসঙ্গীতের এত সম্মান এবং যে কারণে কণ্ঠসঙ্গীতে যাঁরা কথাহীন রাগ-রাগিণীর আলাপ ও তানে পটু তাঁদের আমরা আমাদের সঙ্গীতের সবচেয়ে বড় শিল্পী হিসেবে শ্রদ্ধা করি। এ রকম অনেক সঙ্গীত-শিল্পী আছেন যাঁরা কথা-নিরপেক্ষ সুরের বা রাগিণীর আলাপের পারদর্শিতাকে

মনে করেন সঙ্গীতের সাধনায় শেষ পরিণাম। যে সাধক সুরের সাধনায় এই পর্যায়ে উঠতে পারেন তাঁর কাছে সঙ্গীতের আর কোন পথ পছন্দ হয় না। তাঁর কাছে কথা তখন অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত নিয়ে ভালো করে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, রাগমিশ্রণের পথেও সে যথেষ্ট উদার। রাগ-রাগিণীর যে তালিকা আজ আমরা দেখি তার বেশীর ভাগেরই উৎপত্তি হল মিশ্রণের সাহায্যে।

এই হল আমাদের সঙ্গীত সাধনার একটি পথ। আরও একটি পথ আছে। সেটি হল কথা, সুর ও ছন্দ বা তালের জৈব মিলনের যে পূর্ণ রূপ আমরা দেখি, তাই। উচ্চাঙ্গ হিন্দি গানের গীত কীর্তিটিকে বাদ দিলে যা দাঁড়ায় এ হল গানের সেই আদি রূপ। গানের এই ত্রিধারার সম্মিলনে পূর্ণতার যে মূর্তিটি প্রকাশ পায়, তারই যে কোন একটিকে অস্বাভাবিকভাবে স্ফীত হতে দিলে গানের সেই ছন্দ সাম্যটি নষ্ট হতে বাধ্য। এই দলের গানের কথাকে কাঠের মূর্তি বা পাথরের মূর্তির সঙ্গে তুলনা করা চলে। মূর্তি খোদাই করার সময় কাঠ ও পাথরের নিজস্ব স্বভাব বা সত্তাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করেই শিল্পী তাকে গড়ন, গঠন, ছন্দ ইত্যাদির দ্বারা রূপ ফুটিয়ে তোলেন। পাথরের বা কাঠের মূর্তিকে কাদামাটির আস্তর দিয়ে বা নানা প্রকার রং-এর প্রলেপ ও তুলির রঙীন টানের অলংকারভারে ভারাক্রান্ত করে তাকে মূর্তির মধ্যে লুপ্ত হতে দেন না। সমজদার বলবে এইখানেই সেই শিল্পসৃষ্টি সার্থক।

আসলে এ ধরনের গানের কথাই হল মূল ভিত্তি। রাগিণী ও ছন্দ কথার সঙ্গে মিশে গিয়ে কথার ভাবকে আরো প্রাণবান করে তোলে। কবি বলেন, কথায় যখন মনের ভাবটি স্পষ্ট করে প্রকাশ কর যায় না, তখন সুরের সাহায্য ছাড়া আর কোন গতি নেই। সুর ও ছন্দই তখন কথার সঙ্গে মিশে গিয়ে কথার মর্মকে যেন টেনে বের করে এনে ধরে সকলের সামনে। কথা, সুর ও ছন্দের সুষ্ঠু মিলনে পূর্ণতার যে রস প্রকাশ পায়, সঙ্গীত-সাধকের কাছে তারও মূল্য কম নয়। সাধনার

পথে এরও শক্তি সসীম। যে কারণে মুসলমান শাসনের যুগে উত্তর ভারতের প্রায় সব বড় বড় ধর্মসাধকেরা তাঁদের সাধনায় গানকে বড় স্থান দিয়েছিলেন, যার জন্যে ভারতীয় সঙ্গীতে ভজন, দোঁহা, পদ ইত্যাদির এক বিশাল ও স্বতন্ত্র জগৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এর গীতপদ্ধতি প্রথম দলের চেয়ে অনেক সহজ ও সরল।

লোক-সঙ্গীতের বিষয়ে ধারণা আমাদের সকলেরই কিছু-না-কিছু আছে। এ গান আমরা যখন তখন শুনি আমাদের আশেপাশে। এ গানের যাঁরা রচয়িতা তাঁদের মধ্যে পাই না পুঁথিগত বিদ্যার কোন পরিচয় বা দেখি না ওস্তাদের মত তাঁদের গান শিখতে। জন্ম থেকেই স্বতঃউৎসারিত সহজ গানের একটি মধুর আবেষ্টনে বর্ধিত হয়ে সেই গানের সংস্কার ও রস আপনা থেকেই তারা মনের মধ্যে সঞ্চয় করে। তাই পরে যখন নিজেকে গানে প্রকাশ করতে চায় তখন তার ভিতরে তার ছাপ না পড়ে পারে না। এ গানের সুর ও ছন্দের ঢং একই রকমে যুগ যুগ থেকে এদের মধ্যে প্রচলিত, তবুও তাকে তারা পরিবর্তন করতে চায় না। এর এমনই এক মোহিনী শক্তি। এর থেকেই স্পষ্ট ধরতে পারা যায় যে, গান মানুষের অন্তর্নিহিত একটি অতিবড় প্রয়োজনীয় সত্য। মানুষকে গাইতেই হবে, তা সে এক সুরেই হোক, দু'সুরেই হোক, আর সাত সুরেই হোক। গানে নিজের মনের অহেতুক আনন্দের বেদনাকে প্রকাশ না করে কোনদিন থাকতে পারবে না।

উচ্চাঙ্গ ভারতীয় সুর-জগৎকে রাগ-রাগিণীর জগৎ বলা হয়। এই জিনিসটি ভারতীয় সঙ্গীতের একটি অতি মূল্যবান সম্পদ যা পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই। আসলে রাগ-রাগিণী হল লিরিক কবিতার মত সুরের সাহায্যে মানুষের নানাপ্রকার হৃদয়াবেগের প্রকাশ মাত্র। ভারতীর সঙ্গীতের এইটি হল প্রধান বৈশিষ্ট্য। হৃদয়ের বিশেষ বিশেষ বেদনাকে এক একটি রাগিণীর কাঠামোতে ধরে রাখা বা প্রকাশ করাই হল এর সাধনা। যেমন নানা যুগের লিরিক কবিরা ছোট ছোট নানা হৃদয়াবেগকে ধরে রাখাত চেয়েছেন কবিতার ভাষায় ও ছন্দে। রাগিণী

সঙ্গীতের সাহায্যে গায়কেরা চিরন্তন মানুষের হৃদয়াবেগকে কতখানি রসোত্তীর্ণ করে তুলতে পারেন সেইখানেই হল তাঁদের আসল পরীক্ষা। সূক্ষ্ম বিচারে মানুষের মনের বেদনায় যে কত বৈচিত্র্য থাকতে পারে আমাদের রাগ-রাগিণীগুলিকে গভীরভাবে অনুভব করতে শিখলে সে কথা বোঝা সহজ হয়।

কথা, সুর ও ছন্দের একত্র মিলনে যে গানের বিষয় আগে বলেছি সেখানে কবি চেষ্টা করেন কবিতার ভাবের সঙ্গে মেলে এমন সব রাগ-রাগিণীকে সাজিয়ে নিতে। মূলেতে লিরিক কবিতার যা উদ্দেশ্য রাগ-রাগিণীরও সেই একই উদ্দেশ্য। সুতরাং কাব্য ও রাগিণী সঙ্গীতে সমান বোধসম্পন্ন কবির গান ভাবের ও সুরের বৈচিত্র্যে ও মাধুর্যে অনির্বচনীয় এক রসের সৃষ্টি করে।

লোক-সঙ্গীতের সুরগুলি রাগিণী সঙ্গীতের মত হৃদয়াবেগের নানারূপ বৈচিত্র্য প্রকাশের চেষ্টা করেনি। এই সুরে আমরা পাই একটি মাত্র হৃদয়াবেগের প্রকাশ। কিন্তু সে প্রকাশ হল মানুষের বেদনার যদি কোন প্রথম বা আদি রূপ থাকে ত তাই। এর মধ্যে কোন প্রকার বাইরের পরিবেশের প্রভাব নেই, এ একেবারে স্বতঃ-উৎসারিত। বেদনাই হল সব লোক-সঙ্গীতের মূল সুর। নানা দেশে নানা ভাষায় কখনো তিন সুরে, কখনো চার সুরে, পাঁচ সুরে ছয় সুরে ও সাত সুরের ভিত্তিতে সে সব গান রচিত হলেও তার ভিতরকার মূল সুরটি এক। এই সুরগুলির সাহায্যে চিরকালের মানুষ যেন বারে বারে চেষ্টা করেছে নিজেরই অন্তরের একটি গভীর বেদনার মূলেতে হাত দিতে। এই গানে কথার প্রাধান্য থাকলেও সুরগুলিই গানের আসল প্রাণ। সহজ হলেও তার মন আকর্ষণ করার ক্ষমতা অসীম। একই সুরের পুনরাবৃত্তিগুলি গানের পংক্তির পর পংক্তিতে, তা সত্ত্বেও এগুলি মানুষের হৃদয়ের এমন এক অকৃত্রিম সুর যে তাকে বারে বারে শুনেও মনে ক্লান্তি আসে না। নানারকম সাধারণ কথাও এই সুরগুলির সাহায্য অসাধারণ হয়ে ওঠে এবং এই গানের সুরেও ছন্দের অলংকার বলতে প্রায় কিছুই থাকে না।

লোক-সঙ্গীতের সুরগুলি এমন এক রসের জিনিস যে, তাকে বুদ্ধিবিদ্যায় তৈরী করা যায় না। বহু দেশের বহু রকমের যে সব সুর আজ পর্যন্ত আমরা পেয়েছি সেগুলি কালের ছাঁকুনিতে এমন-ভাবের যাচাই হয়ে এসেছে যে, আজকের দিনে তাকে সম্পূর্ণ সরিয়ে দিয়ে নতুন করে ঐ সুর রচনা করা অসম্ভব।

হিন্দি ও উর্দু ভাষার কবিরা তাঁদের কবিতা যেভাবে আবৃত্তি করে শোনান তাকেও আমাদের ভাষায় অনায়াসেই বলা চলে গান গাওয়া। এসব কবিতায় সুর বসানো হয় লোক-সঙ্গীতের আদর্শে। অনেক সময়ে আবৃত্তিতে গানের মত সমানভাবে তাল রাখতে দেখা যায়, কিন্তু তা বেশ সহজ। তাতে নেই কোন ছন্দের জটিলতা। আবার সুর থাকলেও ভাঙা তালে বা গদ্যছন্দের মত অসম ছন্দের আবৃত্তি করার প্রথাও কবিদের মধ্যে খুব প্রচলিত। বাংলাদেশে ও ইংরেজপূর্ব যুগে প্রায় সব কাব্যই গানের সুরে ও ছন্দে আবৃত্তি করা হত, যা আমরা এখনও গ্রামাঞ্চলে রামায়ণ, ব্রতকথা বা পাঁচালী-পাঠে শুনতে পাই। কিন্তু সহরের শিক্ষিত কবিদের মধ্যে সে প্রথা বহুদিন থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে। হিন্দি ও উর্দু কবিতায় কথাই প্রধান। সুর থাকে তার পিছনে পিছনে। সুরের দিক থেকে লোক-সঙ্গীতের মত প্রাণ মাতানোর ক্ষমতা এর প্রায়ই দেখা যায় না। সুরের দিক থেকেও এইসব গানগুলি একেবারে নিরলংকার।

কেউ কেউ প্রশ্ন করবেন যে ওস্তাদদের মধ্যে অনেকেই যখন ভজন, দোঁহা, পদ, গীত, ধুন ইত্যাদি গান করেন তখন দেখা যায় কথার চেয়ে সুরের ও ছন্দের অলংকারের প্রতি তাঁদের নজর বেশী। এর উত্তর হল, ওস্তাদের হাতে পড়েই ঐ সব গানের ঐ দশা ঘটে। কিন্তু যাঁরা এর মূল রচয়িতা বা যে সব সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সব গানের চর্চা, তাঁরা এই গানে ওস্তাদের মত সুরবিহার করেন না, বা অলংকারকে প্রাধান্য দেন না। সুতরাং ওস্তাদের মুখে বা তাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত অন্যান্য গায়কদের মুখে ভজন, দোঁহা, পদ যে রূপ নেয় তাকে তার আদর্শ রূপ বলা চলে না।

হিন্দি গানের সঙ্গে বাংলা গানের তুলনামূলক আলোচনার সময় তার মূল ধারা দুটির প্রতি মন যদি সতর্ক থাকে তবে বাংলা গানের সঙ্গে এ দুটির মধ্যে কোন্‌টির বেশী মিল তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না।

অনেক দিন থেকেই বাংলাদেশে হিন্দি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের হুবহু নকলে এক ধরনের বাংলা গান রচিত এবং সেই আদর্শে সুরবিহারের স্বাধীনতা নিয়ে গেয়ে শোনাবার চেষ্টা চলে আসছে। বাঙলীর কাছে এই গান কতটুকু আদর পেয়েছ সে কথা ভেবে দেখতে বলি। ওস্তাদ-পন্থী রচয়িতাদের এই সব রচনা গান বা কাব্য হিসেবে দেশে প্রতিষ্ঠা পায়নি এবং সেই আদর্শে সাজানো এই গানগুলি উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ওস্তাদ মহলেও স্থান পেল না। কিন্তু যে স্রষ্টারা রাগ-রাগিণীর সঙ্গে কথাকে সমান স্থান দিয়ে তবে অলংকার বাহুল্যকে বর্জন করে বাংলা গান রচনা করতে পারলেন, তাঁদের গানই বাঙালীর প্রাণে চিরকালই সাড়া জাগিয়েছে। এই দলের রচয়িতারা কেউ ঠিক ওস্তাদ বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন না। এঁরা সকলেই উচ্চাঙ্গ হিন্দি সঙ্গীত থেকে রাগ-রাগিণী, ছন্দের প্রাচুর্য আমদানি করেছেন বাংলা গানে, কিন্তু তার গীতি-রীতির সুরবিহারকে বর্জন করতে চেষ্টা করেছেন সর্বদাই। এঁরা বাংলা গানে ধ্রুপদ এনেছেন, খ্যায়াল এনেছেন, টপ্পা এনেছেন, ঠুংরী এনেছেন, কিন্তু তার গীত-রীতিকে তাঁরা হুবহু গ্রহণ করতে পারেন নি। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগে কথার সঙ্গে সুর যেভাবে রূপ নিয়েছে এঁরা বাংলা গানে কেবল সেটুকুই নিলেন, তার বেশী আর নয়।

সুতরাং আরম্ভে যে প্রশ্ন নিয়ে কথার সূত্রপাত করেছিলাম তার সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো এই যে, গুরুদেবের গানকে যদি কোন প্রকার হিন্দি গানের সঙ্গে তুলনা করতেই হয় তবে উচ্চাঙ্গের হিন্দি গানের গীত-রীতির সঙ্গে না করে করা উচিত উল্লিখিত দ্বিতীয় দলের সঙ্গে। এইভাবে গুরুদেবের গানকে দেখলে উচ্চাঙ্গের হিন্দি গানের সঙ্গে তার বিরোধের কোন কারণ থাকে না। উচ্চাঙ্গের হিন্দি গান থেকে

নানাভাবে সাহায্য নিয়েও যেভাবে ভজন, দোঁহা, গীত, ধুন, গজল ইত্যাদি নিজেদের বৈশিষ্ট্যকে ঠিক রাখতে পারল, গুরুদেবের গানের মধ্যেও সেইটি লক্ষ্য করার বিষয়। তিনি প্রচুর সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু সেই নেওয়াকে নিজের মত করে প্রকাশ করেছেন, নিজের রুচির সঙ্গে মিলিয়ে নিজেদের গীত-রীতিতে।

অনেকে অনুযোগ করেন যে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বড় বৈচিত্র্যহীন, একঘেঁয়ে! কিন্তু সত্যি সত্যি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে, কাব্যে ও স্থরে যত বৈচিত্র্য আছে তা তো আর কারো রচনায় নেই। কাব্য সম্বন্ধে এই মত সর্ববাদীসম্মত কিন্তু স্থর সম্বন্ধে তা নয়, কারণ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্থর সম্বন্ধে সঙ্গীতবিদ্‌দের অনেকের ধারণা খুব স্থস্পষ্ট নয় যেহেতু গতানুগতিক পথ ছেড়ে এই স্থরের স্রোত বয়ে গেছে। যদিও রবীন্দ্র-সঙ্গীত কাব্যপ্রধান, স্থর সহকারীভাবে রসসৃষ্টির সাহায্য করছে, তথাপি এই স্থর-রচনায় যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা এত স্থস্পষ্ট যে আজকাল নেহাৎ আনাড়ি সঙ্গীতানভিজ্ঞ ব্যক্তিও রবিঠাকুরের স্থরের বিশেষত্ব লক্ষ্য করতে সক্ষম। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বহুল প্রচলনের মূলে যে লোকরঞ্জনকারী আবেদন রয়েছে তা শুধু কাব্যের উপরই নির্ভর করে না, স্থরের উপরও যথেষ্ট নির্ভরশীল।

বাউলদের সম্বন্ধে কথা আছে যে তারা সমসাময়িক প্রচলিত রীতিনীতি মেনে চলে না। যদিও এতে যথেচ্ছাচারের ভয় আছে তথাপি উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন লোকের হাতে নব নব সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়। কথিত আছে, ভক্ত কবীর ভৈরবী রাগে অনেক মিশ্রণের প্রচলন করেন এবং এই মিশ্ররূপের যথেষ্ট সমাদর ঘটেছে, যদিও স্রষ্টার কথা লোকে ভুলে গেছে। রবীন্দ্রনাথ স্থর রচয়িতা হিসাবে এই বাউল পর্যায়ের লোক। তিনিও এই ভৈরবী রাগকে এত বিচিত্ররূপে প্রকাশ করেছেন যে ভাবলে অবাক হতে হয়। অতি প্রিয়জনও অনেকদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে পুরোনো হয়ে যায়, তখন তাকে নতুন সজ্জায় দেখলে যেমন অধিকতর স্থন্দর মনে হয়, তেমনি এই আমাদের অতি প্রিয় পুরাতন ভৈরবী রাগকে রবীন্দ্রনাথ নবসজ্জায়, নবরূপে সাজিয়ে আমাদের কতো-না আনন্দ দিয়েছেন। আজকাল মার্গ-সঙ্গীতেও ভৈরবী রাগের বৈচিত্র্য স্বীকৃত হয়েছে।

ভৈরবীতে র গ ধ ন কোমল ছাড়াও সব শুদ্ধ স্বর ও কড়ি ম বিবাদী স্বর হিসাবে ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ নব নব রসের সমাবেশ করে অপরিসীম সৃজনী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

বিবাদী স্বর বলতে অনেকের ধারণা সুস্পষ্ট নয়। বিবাদী স্বর যদিও রাগ-বিরুদ্ধ তথাপি পরাজিত শত্রুকে যেমন ভৃত্যের ন্যায় কাজে লাগানো হয়, সেভাবে সংযত করে অল্প ব্যবহার করলে বিবাদী স্বরের জন্য রাগের রসভ্রংশ তো হয়ই না বরং এক অপূর্ব সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যে সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা অতুলনীয়।

তাছাড়া অত্যন্ত বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে খরজ পরিবর্তন করে ভৈরবীকে শুদ্ধ-স্বরের মেলে স্থানান্তরিত করে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা অতি বড় সঙ্গীত-শাস্ত্রবিদের পক্ষেও দুরূহ। উদাহরণ স্বরূপ "আমার রাত পোহাল", "আমার একটি কথা বাঁশি জানে" প্রভৃতি গান উল্লেখযোগ্য।

কেউ কেউ বলেন যে রবীন্দ্রনাথের গানের সুরে অস্থায়ীটিতে যেমন বৈচিত্র্য দেখা যায় অন্তরায় তা নেই, সেই একধারায় একরকম স্বরের সমাবেশ। এই বিষয়ের সুর রচয়িতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে মস্ত বড় নজির রয়েছে এই যে, মার্গসঙ্গীতেও অন্তরায় বৈচিত্র্য খুব কম বিদ্যমান। যাঁরা মার্গসঙ্গীতের চর্চা করেন তাঁরা একটু ভাল করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন যে, অনেক সমজাতীয় রাগেই গানগুলির সুরে আস্থায়ীতে যা কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। অন্তরাগুলিতে প্রায় কোন প্রভেদ নেই সুরের।

কল্যাণ-ঠাটে এবং বিলাবল-ঠাটের অনেক রাগেরই অন্তরায় এই কতকগুলি বাঁধা স্বর সমাবেশ শ্রুত হয়। কাফি-ঠাট ও খমাজ-ঠাটেরও এই মিল দেখা যায়।

এই বাঁধাধরা অন্তরার পথ থেকে আমাদের দেশের পুরাতন সুরকাররা বিচ্ছিন্ন হতে সাহস করেন নি। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই রাজপথ ছেড়ে নূতন পথের সন্ধান করলেন। "বহুযুগের ওপার হতে"

গানখানির অন্তরায় আমরা যে স্বর সমাবেশ শুনতে পাই, তা রবীন্দ্রনাথের সৃজনী প্রতিভার একটি উদাহরণ। এগুলিই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য যা অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারাও শুনে চিনতে ভুল করে না। অবশ্যই এই বৈশিষ্ট্য আমাদের রুচিসংসদ-এর কেষ্টর চেহারা ও বেশভূষার মত প্রশ্রয় দেয় নি। এরূপ নূতন সৃষ্টির অবকাশ অত্যন্ত কম, তাই রবীন্দ্রনাথও এরূপ সৃষ্টি খুব কমই করতে সক্ষম হয়েছেন।

অনেক গানেই একই বাঁধাধরা স্বর-সমাবেশ শুনতে পাই বলে অনেক সময়ে একঘেঁয়ে মনে হয়। মার্গসঙ্গীতে তান বিস্তার করে অন্তরার বৈচিত্র্যহীনতা লুকান যায়, কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সেই অবকাশ নেই।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত অনেক সময় একঘেঁয়ে মনে হয় গায়কী-পদ্ধতির দোষে। এ বিষয়ে যাঁরা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভাণ্ডারী সেই শান্তিনিকেতনের গায়ক-গায়িকাদের সমন্ধে দুটো কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি। আশা করি তাঁরা আমাকে ভুল বুঝবেন না। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুরের শুদ্ধতা রক্ষার জন্য তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা যদিও প্রশংসাযোগ্য, তথাপি এই প্রচেষ্টার আতিশয্যের ফলে তাঁরা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রাণবস্তু থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছেন, শুধু প্রাণহীন বাইরের কাঠামোটির উপর অতিমাত্রায় জোর দেওয়ার ফলে তাঁদের গায়কী অত্যন্ত নীরস মনে হয়। ভক্ত কবীর বলেছেন "বেঢ়াহি খেত খায়।" উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক না কেন গণ্ডীর সঙ্কীর্ণতা অনেক সময়েই ক্ষতিকর হয়। আজ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মহোৎসবে যোগ দিতে অগণিত সাধারণ ভিড় করে এসেছে। তাদের বিমুখ না করে সাদরে দ্বার উন্মুক্ত করে প্রবেশ করতে দেওয়াই উচিত নয় কি?

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যে লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহাদেরই প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়া বাংলাদেশেও কয়েকজন মনীষী এই বিষয়ের দিকে আকর্ষণ অনুভব করেন। তাঁহাদের মধ্যে রেভাঃ লালবিহারী দে'র নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার লোক-কথার সংগ্রহ ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহারই ফলে তাঁহার সংগ্রহের প্রতি এদেশের ইংরেজি শিক্ষিত জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ ইংরেজি ভাষার মধ্যস্থতায় প্রকাশিত হইবার ফলে রেভাঃ লালবিহারী দে'র সংগ্রহ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়। এই সময় প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদ্ স্যর জি, এ, গ্রীয়রসন্ ভারতীয় বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাসমূহের পরিচয় প্রদান করিয়া যে লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ সংকলন করেন, তাহার মধ্যেও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-সঙ্গীতের কিছু কিছু পরিচয় প্রকাশ পায়। এই সকল পণ্ডিতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কয়েকজন বঙ্গভাষার অনুরাগী ব্যক্তি বাংলা ভাষার মধ্যস্থতায় বাংলার লোক-সাহিত্যের পরিচয় প্রকাশ করিতে যত্নবান হন। কিন্তু তাঁহাদের সকলের প্রচেষ্টা অতিক্রম করিয়া এই বিষয়ে যাঁহার প্রয়াস সর্বাপেক্ষা সাফল্য লাভ করে তিনিই রবীন্দ্রনাথ।

১৩০১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। তাহা ইংরেজি ১৮৯৫ সন অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ পাদ। সেই বৎসরেরই সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেভুলানো ছড়া' নামক সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের মধ্যে তিনি যে সকল ছড়া উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় রস-বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকটি ছড়াই তাঁহার নিজের

চেষ্টায় সংগৃহীত—ইতিপূর্বে বাংলা কিংবা ইংরেজি ভাষায় বাংলা ছড়ার কোন সংগ্রহ প্রকাশিত হয় নাই। এখানে উল্লেখ করিতে পারা যায় যে, ইতিপূর্বে বাংলা প্রবাদের প্রায় দশটি ছোট বড় সঙ্কলন প্রকাশিত হইয়াছিল। সর্বপ্রথম বাংলা প্রবাদ সঙ্কলন ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, ইহার সঙ্কলয়িতার নাম রেভাঃ ডব্লিউ মর্টন। এই সকল প্রবাদ-সঙ্কলনের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু ছড়া প্রকাশিত হইলেও স্বতন্ত্রভাবে বাংলা ছড়ার কোন স্বাধীন সঙ্কলন রবীন্দ্রনাথের উক্ত আলোচনার পূর্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। প্রায় সমসাময়িক কালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক সভায় রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' করিয়া বলিয়াছিলেন, সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে, তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রত-পার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ, অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখাই যথার্থ শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ আশা করিয়াছিলেন যে, নব প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মধ্যস্থতায় এই কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারিবে। সেইজন্য উহা প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রথম বৎসরই সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার প্রথম খণ্ডেই তিনি তাঁহার 'ছেলেভুলানো ছড়া' নামক প্রবন্ধটি প্রকাশ করিয়া এ বিষয়ে দেশের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পান। কেবলমাত্র এই প্রবন্ধটিই নহে—পরিষৎ পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যাতেই তিনি তাঁহার নিজের সংগৃহীত একটি ছড়ার সঙ্কলন প্রকাশ করেন। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ ও ছড়ার সঙ্কলন প্রকাশিত হইবার সুফল অচিরে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর কয়েক বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন সঙ্কলয়িতা কর্তৃক সংগৃহীত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ছড়া ও গান ধারাবাহিকভাবে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার

পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইতে থাকে। এইভাবে বসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর হইতে সংগৃহীত হইয়া 'ছেলেভুলানো ছড়া'র এক মূল্যবান সংগ্রহ ইহাতে প্রকাশিত হয়। রজনীকান্ত গুপ্ত 'সাঁওতাল পরগণার ছড়া' প্রকাশিত করেন। কুঞ্জলাল রায় ও অম্বিকাচরণ গুপ্ত বর্ধমান ও হুগলী জেলার ছড়া সংগৃহীত করিয়া প্রকাশ করেন; সুদূর চট্টগ্রাম হইতে মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বহুসংখ্যক ছড়ার এক মূল্যবান সংগ্রহ পরিষৎ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত করিতে থাকেন। এই পথ অনুসরণ করিয়া দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, রামপ্রাণ গুপ্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হরিদাস পালিত, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রভৃতি অসংখ্য সংগ্রাহক প্রত্যেকে নিজেদের অঞ্চল হইতে ছড়া ও গীতি সংগ্রহ করিয়া পরিষৎ পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত করিতে থাকেন। পরিষৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেভুলানো ছড়া' নামক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইবার পরবর্তী দশ বৎসর কালের পরিষৎ পত্রিকার পাতা উল্টাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধটি জনসাধারণের মধ্যে কি সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে পারা যায় যে, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার পাতা উল্টাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত যে, 'ছেলেভুলানো ছড়া' নামক প্রবন্ধ এবং ১৩৩২ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'ছড়া-সংগ্রহ' পরবর্তীকালে বাংলার লোক-সাহিত্য বিষয়ক সকল আলোচনার উৎস স্বরূপ। এখন এই প্রবন্ধটির প্রকৃতি একটু বিচার করিয়া দেখা যাক।

পূর্বেই বলিয়াছি, খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীব্যাপী লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণের কেবলমাত্র সংগ্রহকার্য চলিতেছিল। রবীন্দ্রনাথও উক্ত প্রবন্ধ রচনার পূর্বে ছড়ার সংগ্রহ কার্যেই ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি তাঁহার উক্ত প্রবন্ধের প্রথমেই লিখিয়াছেন, 'বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে সব মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম।' অতএব

দেখা যাইতেছে সংগ্রাহকরূপেই রবীন্দ্রনাথ লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে ইতিপূর্বে বাংলা ছড়ার কোনও সংগ্রহ তাঁহার সম্মুখে বর্তমান ছিল না, সে জন্য সংগ্রহের আদর্শ তাঁহাকে নিজেকেই স্থির করিয়া লইতে হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগতে লোক-সাহিত্যে যেভাবে সংগ্রহকার্য নিষ্পন্ন করা হয়, তাহা নিতান্তই যান্ত্রিক, এমন কি আধুনিক পাশ্চাত্য লোক-সাহিত্য সংগ্রাহকগণ লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া শব্দগ্রাহক-যন্ত্র ব্যবহার করিবারই পক্ষপাতী। সে দেশে ইহার বিষয়ে গবেষণা করিবার যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তাহা নিতান্ত মস্তিষ্কজাত, হৃদয়ের সঙ্গে তাহার কোনও যোগ নাই। কিন্তু লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া হৃদয়ের অনুভূতিকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া কেবলমাত্র মস্তিষ্ককেই সক্রিয় রাখিলে যে সুফল পাওয়া যাইতে পারে না, তাহা যে কত সত্য, তাহা রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। যে বিপুল লোক-সাহিত্যের উপকরণসম্ভার আজ পাশ্চাত্য দেশের সংগ্রাহকদিগের পরিশ্রমের ফলে সংগৃহীত হইয়াছে তাহার তালিকা প্রস্তুত ও শ্রেণী বিভাগ করিবার দুরূহ কার্যে পাশ্চাত্য লোকশ্রুতিবিদ-গণের সময় আজ অতিবাহিত হইতেছে; কিন্তু যে ক্ষেত্রে ইহাদের যথার্থ সার্থকতা, অর্থাৎ ইহাদের রসাবেদনের ক্ষেত্রে তাহা সেখানে উপেক্ষিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, 'আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।' অতএব দেখা যাইতেছে, সাধারণ সংগ্রাহকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি স্থূল পার্থক্য আছে। নৃ-তত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বের দিক হইতে যাঁহারা লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাঁহাদের ব্যক্তিগত রস-বিচার বোধ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করিয়া এ কার্যে

অগ্রসর হইয়া থাকেন; কারণ, তাঁহারা যাহা যেমনটি পাইবেন, অবিকল সেইটি তেমনই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কোন কারণেই কিছুই পরিত্যাগ কিংবা কিছুই পরিবর্তন করিতে পারিবেন না। কারণ, মানব-সমাজের ক্রমবিকাশের ধারা নিরূপণ করিবার জন্য প্রত্যেকটি প্রামাণ্য উপকরণেরই বিশিষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। অতএব এই সকল সংগ্রাহকগণ অশ্লীল এবং কুরুচিপূর্ণ উপকরণ ও গালিগালাজের ভাষাও সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য থাকেন। সম্প্রতি মার্কিন দেশীয় কথ্যভাষায় অশ্লীল ভাষার ব্যবহার লোক-সাহিত্য সংগ্রহের একখানি গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি মার্কিন দেশীয় লোক-সাহিত্য সংগ্রাহকদিগের নির্বিচার সংগ্রহের উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার লক্ষ্য সংযম ও সৌন্দর্য। শিব ও সুন্দরের যে আদর্শ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবি-জীবনকেই নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, ইহার মধ্যেও তাহা বিসর্জিত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ নিজের সংগৃহীত একটি ছড়া এই প্রকারে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

বোন্ কাঁদেন বোন্ কাঁদেন খাটেন খুরো ধরে।
সেই যে বোন্—

ছড়াটি যে আকারে রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহার পর এমন একটি গ্রাম্য ভাবাপন্ন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল যে, তাহা রবীন্দ্রনাথ নিজে এখানে উদ্ধার করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন। সেইজন্য তিনি পাঠকদিগের নিকট এই কৈফিয়ৎ দিতেছেন—'এইখানে পাঠকদিগের নিকট অপরাধী হইবার আশঙ্কায় ছড়াটি শেষ করিবার পূর্বে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। যে ভগিনীটি আজ খাটের খুরা ধরিয়া দাঁড়াইয়া অজস্র অশ্রুমোচন করিতেছেন, তাঁহার পূর্ব ব্যবহার কোনো ভদ্রকন্যার অনুকরণীয় নহে। বোনে বোনে কলহ না হওয়াই ভালো, তথাপি সাধারণত এরূপ

কলহ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কন্যাটির মুখে এমন ভাষা ব্যবহার হওয়া উচিত হয় না, যাহা আমি অদ্য ভদ্র সমাজে উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছি। তথাপি সে ছত্রটি একেবারেই বাদ দিতে পারিতেছি না। কারণ, তাহার মধ্যে কতকটা ইতর ভাষা আছে বটে, কিন্তু তদপেক্ষা তাহাতে অনেক অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ করুণ রস আছে। ভাষান্তরিত করিয়া বলিতে গেলে মোট কথা এই দাঁড়ায় যে, এই রোরুদ্যমানা বালিকাটি ইতিপূর্বে কলহকালে তাঁহার সহোদরাকে ভর্তৃখদিকা বলিয়া অপমান করিয়াছেন। আমরা সেই গালিটিকে অপেক্ষাকৃত অনতিরূঢ় ভাষায় পরিবর্তন করিয়া নিয়ে ছন্দ পূরণ করিয়াছিলাম :

বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুটো ধরে।
সেই যে বোন গাল দিয়েছেন স্বামীখাকী বলে॥'

ভদ্র সমাজে অনুচ্চার্য কোন্ কথাটিকে যে রবীন্দ্রনাথ এখানে স্বামীখাকী বলিয়া পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন, তাহা তিনি সুস্পষ্ট-ভাবে নির্দেশ না করিলেও সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। অতএব দেখা যাইতেছে, এই সংগ্রহ ও তাহার বিশ্লেষণ সৌন্দর্য ও আদর্শবাদী কবির সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ; পাশ্চাত্য জগতে নৃ-তত্ত্ব, জাতিতত্ত্বালোচনার উপকরণ হিসাবে লোক-সাহিত্যের যে সংগ্রহ ও বিচার হইয়া থাকে, তাহা ইহা নহে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজস্ব রস, রুচি ও সৌন্দর্যবোধ অনুযায়ীই প্রধানতঃ ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন ; যে সকল ছড়া তাঁহার মতে অতিরিক্ত গ্রাম্যতা ভাবাপন্ন তাহা সংগ্রহে ও আলোচনায় স্থান লাভ করিতে পারে নাই। তবে তাঁহার সংগ্রহ গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, তিনি গ্রাম্যতা-দোষ দুষ্ট কোনও কোনও ছড়া সংগ্রহ হইতে পরিত্যাগ করিলেও কোনও ছড়াই নিজে পরিবর্তিত করিয়া গ্রহণ করেন নাই। ইহা তাঁহার ছড়াগুলির অন্তপ্রকৃতি সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞানেরই পরিচায়ক।

রবীন্দ্রনাথ যখন ছড়াগুলির সংগ্রহকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন এই ছড়াগুলির দ্বারা নৃ-তত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বমূলক কোনও গবেষণা সম্ভব হইতে পারে বলিয়া এদেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে কোনও ধারণাই সৃষ্টি হইতে পারে নাই। নৃ-তত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বের আলোচনা আমাদের দেশে খুব ব্যাপকভাবে আজিও আরম্ভ হয় নাই এবং বিংশতি শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চত্য জগতের সর্বত্র যখন লোক-সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলন হইতে দেখা যাইতেছে, তখনও এদেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেও লোক-সাহিত্য সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট ধারণাই সৃষ্টি হইতে পারে নাই। অতএব রবীন্দ্রনাথ ছড়াগুলির মধ্য হইতে কোনও তত্ত্বকথার অনুসন্ধান না করিয়া যে কাব্যরস অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ইহাদের প্রতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। সেদিন কবির দৃষ্টি লইয়া ইহাদের মধ্য হইতে কাব্যরস অনুসন্ধানের পরিবর্তে যদি কেহ জ্ঞানীর দৃষ্টি লইয়া দার্শনিক তত্ত্ব কিংবা সামাজিক তথ্য অনুসন্ধান করিতেন তাহা হইলে এগুলির আবেদন ব্যর্থ হইত। রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধ যে রসিক সমাজে অভূতপূর্ব প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা ইহার কাব্যরসের আবেদনের জন্যই সম্ভব হইয়াছিল। পৃথিবীর লোক-সাহিত্য আলোচনার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিভাশালী কবির মত কোনও ব্যক্তিকে লোক-সাহিত্য সম্পর্কে এমন সুগভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। পাশ্চাত্য জগতেও যাঁহারা লোক-সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রধানতঃ জ্ঞানী অধ্যাপক কিংবা গবেষক। অতএব তাঁহাদের আলোচনায় কোনও সাহিত্যিক আবেদন সৃষ্টি হইতে পারে না। তাঁহারা প্রধানতঃ সংগৃহীত উপাদানগুলির শ্রেণী বিভাগ করিয়া থাকেন, দেশদেশান্তর হইতে সংগৃহীত উপাদান-গুলির সঙ্গে নিজেদের সংগৃহীত উপাদানের তুলনামূলক আলোচনা করেন, ইহাদের উৎপত্তি ও বিস্তার সম্পর্কে সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা করেন। রবীন্দ্রনাথ সে পথ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল-

মাত্র নিজের কবি-হৃদয়টি খুলিয়া দিয়া ইহাদিগকে তাহার মধ্যে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। রবীন্দ্র-কবি-মানসের শৈশব-স্মৃতির পটভূমিকা হইতে ইহাদিগকে উদ্ধার করিয়া পরিণত রস-পাত্রে পরিবেশন করিয়াছেন। মানুষ বয়সের দিক দিয়া যতই প্রবীণ হইতে থাকুক না কেন, শৈশবের সংস্কার হইতে সে কোনদিনই পরিত্রাণ পায় না। সেইজন্য যে রসানুভূতি লইয়া রবীন্দ্রনাথ ছড়াগুলির বিশ্লেষণ করিয়াছেন, সেই অনুভূতি দ্বারাই পাঠক সর্বান্তঃকরণে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

উপনিষদের মন্ত্রের সঙ্গে কবির পরিচয় হয় খুব ছেলেবেলায়। এই মন্ত্রগুলি ছিল তাঁর জীবনের আশ্রয়। তাই তাঁর সাধনার মধ্যে দেখি উপনিষদের শান্ত সমাহিত গম্ভীর ভাব। কোনো উচ্ছ্বাস নেই। কবির কাছে শুনেছি, আগে গায়ত্রী মন্ত্র ব্যবহার করতেন। পরে তাঁর ধ্যানের মন্ত্র ছিল "শান্তং শিবং অদ্বৈতম্।"

নিজের জীবনেও তাঁর পথ ছিল অত্যন্ত সহজ সরল। একখানি চিঠিতে লিখেছেন :

"আমার কাছে ধর্ম ভারী concrete যদিও এবিষয়ে আমার কিছু বলবার অধিকার নেই। কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরকে কোনোরকমে উপলব্ধি করে থাকি বা ঈশ্বরের আভাস পেয়ে থাকি, তাহলে এই সমস্ত জগৎ থেকে, মানুষ থেকে, গাছপালা, পশুপাখি, ধূলোমাটি—সব জিনিস থেকেই পেয়েছি।···আকাশে, বাতাসে, জলে সর্বত্র আমি তাঁর স্পর্শ অনুভব করি। এক এক সময় সমস্ত জগৎ আমার কাছে কথা কয়।"

গানে কবিতায় বারে বারে বলেছেন :

"আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে।
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে ;
প্রভাত-সন্ধ্যার
আলো-অন্ধকার
মোর চেতনায় গেছে ভেসে ;
অবশেষে
এক হয়ে গেছে আমার জীবন,
আর আমার ভুবন।"

কতবার বলেছেন, "সোনালী রূপালী সবুজে সুনীলে সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে" হয়তো গাছের পাতায় আলো পড়েছে, গেয়ে

উঠেছেন, "এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়।"

বোলপুর বা কলকাতায় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে অসহ্য গরম, দুপুর-বেলা চারিদিক রোদে পুড়ে যাচ্ছে কিন্তু কখনো দরজা জানালা বন্ধ করতেন না। বর্ষার সময়েও দেখছি হয়তো জানালা খুলে রেখেছেন যাতে অবাধে আসতে পারে "বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে।" যখন বয়স কম ছিল, কালবৈশাখির মেঘ আকাশে ঘনিয়ে এসেছে, বোল-পুরের খোলা মাঠে ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে বেরিয়ে পড়েছেন। সারা বছর বিকাল থেকে খোলা ছাদে বসে থাকতে ভালোবাসতেন। বিলাতে শীতের জন্য দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখতে হত, তাতে ওঁর মন খারাপ হয়ে যেত। বলতেন, "ভালো লাগে না, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।"

বাইরের জগৎটা ওঁকে সত্যিই যেন পাগল করে দিত। তাই লেখবার সময় জানালার কাছ থেকে দূরে বসতেন। আমাদের আলিপুরের বাড়িতে যে ঘরে থাকতেন তার জানালা ছিল পূবদিকে—ঠিক সামনে অনেকগুলি পাম গাছ, তার পরে খোলা মাঠ, পিছনে বট অশোক আর অন্য সব বড়ো বড়ো গাছ। লেখবার সময় টেবিলটাকে ঘুরিয়ে জানালার দিকে পিছন ফিরে বসতেন। বরা-নগরের বাড়িতে থাকতেন খুব ছোটো একটা কোণের ঘরে। সামনে একটা বড়ো জানালা দিয়ে পূব-দক্ষিণ কোণে দেখা যেত পুকুরঘাট, আম সুপুরির বাগান—তাই ঘরটার নাম দিয়েছিলেন "নেত্রকোণা"। এই ঘরেও লেখবার টেবিলটা রাখতেন জানালার কাছ থেকে সরিয়ে এক কোণে যেখানে দু'পাশে দেয়াল, কোনোদিকে কিছু দেখা যায় না। বলতেন, "খোলা জানালার কাছে বসলে আর আমার লেখা হবে না। আমার মন ঘুরে বেড়াবে ঐ বাইরে দূরে।" যখন কাজ-কর্ম শেষ হয়ে যেত, তখন জানালার সামনে ইজিচেয়ারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতেন।

পঞ্চাশ বছরের জন্মোৎসবের আগে প্রায় দু'মাস শান্তিনিকেতনে

ছিলাম। কবি তখন থাকতেন অতিথিশালার দোতলায় পূর্বদিকের ঘরে। সবচেয়ে ছোটো এই ঘর। সামনে খোলা ছাদ। আমি থাকি পশ্চিমদিকের ঘরে। সে আমলে বাইরের লোকের আসা-যাওয়া কম। কবির জীবনযাত্রাও অত্যন্ত সরল নিরাড়ম্বর। সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে খোলা বারান্দায় গিয়ে বসতেন। আশ্রমের অধ্যাপকেরা কেউ কেউ দেখা করতে আসতেন। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠত। অধ্যাপকেরা একে একে যেতেন। রাত হয়তো এগারোটা বারোটা বেজে গিয়েছে, তখনো কবি অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে বসে আছেন। আমি ঘুমোতে চলে যেতুম। আবার সূর্য উঠার আগেই উঠে দেখি কবি পূবদিকে মুখ করে ধ্যানে মগ্ন।

কোনো কোনো দিন হয়তো অন্ধকার থাকতে মন্দিরে পূবদিকের চাতালে গিয়ে বসেছেন। পিছনে দু-চারজন লোক। সূর্য উঠার সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে হয়তো কিছু বললেন। 'শান্তিনিকেতন' নামক বইয়ের অনেক ব্যাখ্যান এইভাবে মুখে মুখে বলা।

তিরিশ বছরের বেশি এই রকমই দেখেছি। শেষ বয়সে রোগশয্যায় যখন অজ্ঞান তাছাড়া কখনো এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। অসুস্থতার মধ্যেও অপেক্ষা করে থাকতেন কখন ভোর হবে। বার বার বলতেন, "ভোর হোলো, আমাকে উঠিয়ে বসিয়ে দাও।" যখন যে বাড়িতে থাকতেন পছন্দ করতেন পূবদিকের ঘর। যাতে প্রথম সূর্যের আলো এসে মুখে পড়ে। জানালা কখনো বন্ধ করতেন না। সূর্য উঠার অনেক আগেই উঠে বসতেন। বলতেন, "শেষ রাত্রে উঠে রোজ চেষ্টা করি নিজের ছোটো আমির কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেই বড় আমির মধ্যে আপনাকে বিলিয়ে দিতে; পারিনে তা নয়, কিন্তু একটু সময় লাগে।" আমরা বলেছি, "ক্লান্ত শরীরে আরেকটু শুয়ে থাকলে ভালো হয়।" বলেছেন, "দেখেছি যে শেষরাত্রে যখন চারিদিক নিস্তব্ধ তখন সহজে এটা হয়। তাই ঘুমিয়ে এ সময়টা ব্যর্থ করতে ইচ্ছা হয় না।"

"ছেলেবেলায় বাবা মশায় রাত চারটের সময় ঘুম থেকে তুলে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করাতেন। তখন ভাবতুম, কেন আরেকটু শুয়ে

থাকতে দেন না। এখন তার মানে বুঝতে পারি। ভাগ্যিস তিনি এই অভ্যাস করিয়েছিলেন। এতে যে আমাকে কত সাহায্য করে তা বলতে পারি না।"

এই ভোরে ওঠা নিয়ে বিদেশে মজার মজার ব্যাপার ঘটত। নরওয়েতে ওঁর শোবার ঘরের পাশে আমাদের শোবার ঘর। মাঝে একটা ছোটো দরজা। প্রথমদিন সভাসমিতি অভ্যর্থনা সেরে শুতে যেতে দেরি হয়ে গেল। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে শুনি দরজায় টক্‌টক্ আওয়াজ। কবি বলছেন, "আর কত ঘুমোবে? অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে।" ঘরে চারদিকে কালো পর্দা টাঙানো। আলো জ্বেলে ঘড়িতে দেখি রাত তিনটে। তখন গ্রীষ্মকাল, নরওয়েতে সূর্য ওঠে রাত দুপুরে। কবির ঘরেও কালো পর্দা টাঙানো ছিল, কিন্তু শোবার আগেই সরিয়ে দিয়েছেন। মাঝরাত্রে ঘর আলোয় ভরে গিয়েছে আর উনিও উঠে বসেছেন। আমাদের জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আর থাকতে না পেরে আমাদের ডেকে তুলেছেন। যাহোক, ওঁকে তখন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললুম যে, তখন রাত তিনটা। নরওয়েতে ভোরের আলো দেখে ওঠা চলবে না। সকালে চায়ের টেবিলে এই নিয়ে খুব হাসাহাসি হল।

কত কবিতার মধ্যে বলেছেন, "প্রভাতে প্রভাতে পাই আলোকের প্রসন্ন পরশে অস্তিত্বের স্বর্গীয় সম্মান।"

বলেছেন ঃ

> হে প্রভাত সূর্য
> আপনার শুভ্রতম রূপ
> তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেরিব উজ্জ্বল ঃ
> প্রভাত ধ্যানেরে মোর সেই শক্তি দিয়ে
> করো আলোকিত······

ভোরবেলা যেমন, রাত্রে শুতে যাবার আগেও সেই রকম চুপ করে বসে থাকতেন। বলতেন, "সারাদিনের ছোটখাটো কথা, সব ক্ষুদ্রতা, সমস্ত গ্লানি একেবারে ধুয়ে মুছে স্নান করে শুতে যেতে চাই।" এর

মধ্যে কোনো আড়ম্বর ছিল না। এমন কি এই যে প্রতিদিনের ধ্যানের অভ্যাস বাইরের লোকের কাছে তা জানাতেও যেন একটু সংকোচ ছিল। ওঁর নিজের কাছে এর এমন গভীর মূল্য পাছে অন্য লোকের কাছে হালকা হয়ে যায়। যাদের সত্যি শ্রদ্ধা আছে তাদের সঙ্গে নিঃসংকোচে আলোচনা করতেন।

মন যখন বেশি ক্লিষ্ট তখন কোনো কোনো সময়ে নিজের মনে গান করতেন। কুড়ি বছর আগে ৭ই পৌষের উৎসবের সময় কোনো পারিবারিক ব্যাপারে কবির মন অত্যন্ত পীড়িত। একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু কিছু হল না। ৬ই পৌষ সন্ধ্যাবেলা শান্তিনিকেতনে গিয়ে পৌঁচেছি। কবি তখন থাকেন ছোটো একটা নতুন বাড়িতে—পরে এ বাড়ির নাম হয় "প্রান্তিক"। শুধু দুখানা ছোট ঘর। খাওয়ার পরে আমাকে বললেন, "তুমি এখানেই থাকবে।" লেখবার টেবিল সরিয়ে আমার শোবার জায়গা হল। পাশেই কবির ঘর। মাঝে একটা দরজা, পর্দা টাঙানো। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে শুনতে পেলুম গান করছেন, "অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ।" বার বার ফিরে ফিরে গান চললো সারা রাত ধরে। ফিরে ফিরে সেই কথা "অন্ধজনে দেহ আলো।" বিকাল থেকে মেঘ করেছিল, ভোরের দিকে পরিষ্কার হল। সকালে বললুম, "কাল তো আপনি সারারাত ঘুমোন নি।" একটু হেসে বললেন, "মন বড়ো পীড়িত ছিল তাই গান করছিলুম। ভোরের দিকে মন আকাশের মতোই প্রসন্ন হয়ে গেল।"

নাট্যাভিনয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'যখন একটা কিছু অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখন এমন নেশা চেপে যায় যে, মনে হয়, চাইকি এটাতেও একজন মানুষ আপনার জীবন নিয়োগ করতে পারে।'

কথাটা নিতান্তই কবি-কল্পনা নয়। বিশ্ববিদিত নট-নটীর জীবন-ইতিহাসে এ সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। কবির বাস্তব জীবনেও এটা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। অভিনয়ে কবি একেবারে মেতে উঠতেন।

রবীন্দ্রনাথ অভিনেতারূপে প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন যখন তাঁর বয়স মাত্র ষোলো। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম আর করব না' নামে একখানি হাস্যকৌতুকপ্রধান ক্ষুদ্র নাটিকার প্রধান চরিত্র অলীকবাবুর ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেন। এ অভিনয় ঠাকুরবাড়িতেই ঘরোয়াভাবে হয়েছিল। দর্শকের সংখ্যাও ছিল ঠাকুরবাড়ির পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ আবাল্য একটু লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। তাই সেদিনের সেই ঘরোয়া নাচঘরে অলীকবাবুর ভূমিকায় তাঁর সর্বাঙ্গ-সুন্দর অভিনয় সকলকে একেবারে চমৎকৃত করে দিয়েছিল। কিশোর অভিনেতার প্রশংসা শোনা গিয়েছিল পঞ্চমুখে।

এর পর তিনি বিলেত চলে যান। ফিরে এসে আবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই রচিত একখানি গীতিনাট্য 'মানময়ী'তে কবি মদনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এ অভিনয়ে সুঅভিনেতারূপে তাঁর খ্যাতি পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, সকলেই সেদিন হয়ে উঠেছিলেন যেন 'মদন-মোদিত'।

ঠাকুরবাড়িতে 'বিদ্বজ্জন সমাগম সভা'র অধিবেশন হবে সেবার। সভায় সমাগত সুধীজনের চিত্তবিনোদনের জন্য একটি নাটক অভিনয় করা হবে স্থির হয়েছিল। এর সমস্ত দায়িত্ব কিন্তু এসে পড়ল তরুণ

কবি রবীন্দ্রনাথের ওপর। কবির বয়স তখন উনিশ বৎসর মাত্র। কিন্তু অসামান্য তাঁর আত্মপ্রত্যয়, তিনি নিজেই 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নামে একখানি গীতিনাট্য রচনা করে ফেললেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত দেশি ও বিদেশি সম্মিলিত সুরের কাঠামোয় রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয় চৌধুরী উভয়ে মিলে গানগুলি রচনা করে ফেললেন। নৃত্যগীতের মাধ্যমেই সমগ্র নাটকখানির অভিনয় হয়েছিল।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ছাদের উপর মণ্ডপ নির্মাণ করে তারই মধ্যে গঠিত অস্থায়ী মঞ্চে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রথম অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে বাল্মীকির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এবার অভিনয় আসরে 'বিদ্বজ্জন সমাগম সভা'র বহু গণ্যমান্য বরেণ্য অতিথি উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর পরিবারের বাইরের দর্শকদের সামনে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম প্রকাশ্য রূপাবতরণ। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অপূর্ব অভিনয় দর্শনে সেদিন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ মনীষীগণ ও বহু রসবেত্তা সুধীবৃন্দ কবির নাট্যপ্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

কবি এঁদের অভিমত শুনে খুবই উৎসাহিত হয়েছিলেন। হবারই কথা। কারণ, বয়সটা যে তখন সবে উনিশ! কৈশোর ও যৌবনের মধুর মিতালি তাঁর জীবনের খেলাঘরে তখনও হাত ধরাধরি করে খেলছে।

ঠাকুরবাড়ির আসরের বাইরে কবির প্রথম প্রকাশ্য মঞ্চাবতরণ দেখা যায় ভারত সংগীত সমাজের নাট্যপীঠে। এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল কলকাতার সৌখীন ধনী সম্প্রদায়ের উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যে। এটি শহরের সম্পূর্ণ অভিজাতবর্গের গীত-বাদ্য-নৃত্য ও নাট্যানুষ্ঠানের আসর। এঁদের অনুষ্ঠানেও কেবলমাত্র বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনই নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। জনসাধারণের এখানে প্রবেশাধিকার ছিল না।

কি ঠাকুরবাড়ির অভিনয়, কি ভারত সংগীত সমাজের অভিনয়, পেশাদার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনয় থেকে এঁদের নাট্য প্রযোজনা

ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। এঁদের উভয় দলের অভিনয়ই শিক্ষিত রসজ্ঞ দর্শকদের খুবই ভালো লাগত। আবার ঠাকুরবাড়ির অভিনয় আর সংগীত সমাজের অভিনয় এ দু'য়ের মধ্যেও বেশ একটু পার্থক্য ছিল। সংগীত সমাজের অভিনয় ঠাকুরবাড়ির অভিনয়ের চেয়ে খুব বেশি নিম্নস্তরের না হলেও, সংগীত সমাজের রঙ্গমঞ্চে একটু ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী এবং জাঁক-জমকের বাহুল্য ছিল।

ভারত সংগীত সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথের জ্যোতিদাদা। পরে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদেও বৃত হয়েছিলেন। এখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত একাধিক নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসন অভিনীত হয়েছিল। জ্যোতি-দাদার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও পরম উৎসাহে এই ভারত সংগীত সমাজ সংগঠনে এবং এর অভিনয়ের উৎকর্ষ সাধনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

নাট্যাভিনয়ের প্রতি নিজেব গভীর অনুরাগবশত তিনি সংগীত সমাজের সৌখীন অভিনেতাদের অতি যত্ন ও পরিশ্রমের সঙ্গে অভিনয়-কলা শিক্ষা দিতেন। তাঁর শিক্ষার গুণে যেন বোবার মুখেও কথা ফুটত। এক একদিন নাটকের মহড়া দিতে দিতে হয়তো রাত্রি দেড়টা দুটো হয়ে যেত। কবির সেদিকে খেয়ালই থাকত না। যতক্ষণ পযন্ত না কোনো অভিনেতার চরিত্রানুগ বাচনভঙ্গী, সংলাপের প্রত্যেকটি শব্দের সূক্ষ্ম উচ্চারণ, মঞ্চে প্রবেশ ও নির্গমন, দাঁড়ানোর ভঙ্গি, অঙ্গ সঞ্চালন, চোখের দৃষ্টি, মুখের ভাব একেবারে শিল্পীজনোচিত নিখুঁত না হয়ে উঠছে ততক্ষণ তিনি তাকে শিক্ষা দেওয়া থেকে বিরত হতেন না।

এই সংগীত সমাজ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্যই তিনি তাঁর কৌতুক-নাট্য 'গোড়ায় গলদ' রচনা করেছিলেন। কিন্তু, এ নাটকে কবি নিজে কোনো বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। সকলের আগ্রহে কেবল একটি দৃশ্যে তিনি স্বনামেই অবতীর্ণ হয়ে একখানি মাত্র গান গেয়েছিলেন। এই 'গোড়ায় গলদ'ই বহুকাল পরে পরিবর্তিত আকারে 'শেষ রক্ষা' নামে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল।

কবির 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্যখানি বন্ধুবান্ধবের বিশেষ অনুরোধে একাধিকবার অভিনীত হয়েছিল। এমন কি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ 'স্টার থিয়েটারে'ও আদি ব্রাহ্ম সমাজের সাহায্যকল্পে টিকিট বিক্রয় করে অভিনয় হয়েছিল। ব্যাপারটা বিশেষভাবে স্মরণীয় এইজন্য যে, ঠাকুরবাড়ি বা সংগীত সমাজের বাইরে সাধারণ দর্শকদের সামনে কবিব এই প্রথম প্রকাশ্য অভিনয়। এবারও কবি বাল্মীকির ভূমিকাতেই নেমেছিলেন এবং নিজের আসামান্য অভিনয় নৈপুণ্যে দর্শকমণ্ডলীকে বিস্ময়াভিভূত করে দিয়েছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সাহায্যে ও সহযোগিতা লাভ করে সংগীত সমাজ বিশেষ উপকৃত হয়েছিল। এখানে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের ন্যায় রবীন্দ্রনাথেরও একাধিক নাটক অভিনীত হয়েছিল। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে কবি 'কালমৃগয়া' নামে আর একখানি গীতিনাট্য বচনা করেন। এখানি কিন্তু ঠাকুর-বাড়িতেই প্রথম অভিনীত হয়েছিল। কবি এ নাটকে অন্ধমুনির-ভূমিকার অবতীর্ণ হয়ে অপূর্ব করুণারসের অভিনয়ে সকলকে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। বহুকাল পরে গীতবিতান এই 'কালমৃগয়া'র পুনরাভিনয় করে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক বা নাট্যকাব্য 'রাজা ও রানী' সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিজিতলার বাড়িতে সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ রাজা বিক্রমদেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ির প্রত্যেকটি অভিনয়ে স্ত্রী ভূমিকায় তাঁদের পরিবারের বধূ ও কন্যারাই অবতীর্ণ হতেন। পুরুষকে নারী সাজিয়ে অভিনয় করানোর বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সংগীত সমাজের অভিনয়ে স্ত্রী-ভূমিকায় নারীর সাহায্য পাওয়া দুর্লভ ছিল ব'লে অজ্ঞাতশ্মশ্রু কিশোরদের নারীর ভূমিকায় নামানো হত। তবে, সংগীত সমাজের অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সাক্ষ্য দিতে পারবেন যে, ছেলেরা এখানে এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করতেন যে তা দর্শকেরা কেউ

ধরতেই পারতেন না যে তাঁরা নারী নন, পুরুষ। বিশেষতঃ মুটু ও অশ্বিনী ভায়ার কথা আমরা কোনওদিনই ভুলবো না। 'মৃণালিনী'র অভিনয়ে মুটুর সেই 'মনোরমা' আর অশ্বিনীর 'গিরিজায়া' আজও যেন চোখের সামনে ভাসছে।

'রাজা ও রানী' নাটকের অভিনয়েই সেই প্রথম ও শেষবারের মতো কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী দেবদত্তের স্ত্রী নারায়ণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রানী সুমিত্রার ভূমিকায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী নেমেছিলেন। 'রাজা ও রানী' নাট্য-কাব্যের অভিনয় এমন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল যে তদানীন্তন প্রখ্যাত সাধারণ রঙ্গালয় 'এমারেল্ড থিয়েটার' অবিলম্বে কবির এই নাটকখানি মঞ্চস্থ করেন। তবে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এই নাটকখানিই কবির প্রথম অভিনীত নাটক নয়। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসখানি 'রাজা বসন্ত রায়' নামে নাটকাকারে রূপান্তরিত হয়ে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। কবির 'চোখের বালি' উপন্যাসখানিকে স্বর্গীয় নট ও নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত নাট্যাকারে রূপান্তরিত করে নিয়ে ক্লাসিক থিয়েটারে মঞ্চস্থ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চেও অতিরিক্ত আসবাবপত্র ও দৃশ্যপট ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না। শেষের দিকে তো তিনি প্রত্যেক নাট্যাভিনয়ে মঞ্চের উপর কেবল মাত্র নাটকোপযোগী বিভিন্ন বর্ণের পর্দার পটভূমিকা রচনা করে মঞ্চসজ্জার ব্যবস্থা করতেন। এঁদের অভিনয়ে সাজ-পোশাকে, রূপসজ্জায়—সবকিছুর মধ্যেই বেশ একটু প্রাচ্য বিশেষত্ব প্রকাশ পেত। প্রাচীন ভারতের নাট্যশালার একটি সুসংযত প্রতিরূপ যেন দর্শকদের চোখের সামনে ভেসে উঠত। এঁদের নাটকের রাজা কখনো মখ্‌মল্‌ ভেল্‌ভেটের উপর শল্মাচুমকি ও জরির কাজ করা ঝলমলে পোশাক পরে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হতেন না। এঁদের রাজা পরতেন চীনাংশুক বা কোষেয় কটিবাস এবং রঙিন উত্তরীয়। বাহুতে অঙ্গদ, মণিবন্ধে কঙ্কণ, কর্ণে কুণ্ডল, শিরে উষ্ণীষ বা সুবর্ণ কিরীট ; পায়ে ভারতীয় প্রাচীন পাদুকা। এসব বিষয়ে

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গী ও সহকারীরূপে পেয়েছিলেন সমরেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীও যথাসাধ্য সাহায্য করতেন, আর সাহায্য করতেন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকমণ্ডলী। ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর প্রভৃতি গুণী ও শিল্পীরা। এঁদের অভিনয় দেখে কাউকে কখনো হতাশ হয়ে ফিরতে হয়নি। একটা কেমন অভিনব ও অভিজ্ঞাত সুন্দর প্রয়োগ-নৈপুণ্য প্রকাশ পেত এঁদের প্রত্যেকটি নাটকের অভিনয় আয়োজনে।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী নাটক 'বিসর্জন' সংগীত সমাজেই সম্ভবত প্রথম অভিনীত হয়েছিল। এ অভিনয়ে কবি স্বয়ং রঘুপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেদিন কবির এই রঘুপতি চরিত্রের অভিনয় সমগ্র দর্শকমণ্ডলীকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল।

এর পর কবির 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয় হয় ওই সংগীত সমাজেই। কবি এতে কেদারের ভূমিকা নিয়ে নেমেছিলেন। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ঠাকুরবাড়িতেও অভিনীত হয়েছিল। তাতে অবনীন্দ্রনাথের তিনকড়ির ভূমিকা অভিনয়েরও প্রচণ্ড সুনাম হয়েছিল। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয়ে কেদারের ভূমিকায় চরিত্রানুগ এমন চমৎকার রূপসজ্জা হয়েছিল কবির যে, রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ মাত্র সে রূপসজ্জা সমস্ত দর্শককে হর্ষোৎফুল্ল করে তুলেছিল। কেদাররূপী কবির সেই চটুল অথচ স্বভাবসুন্দর অভিনয়ের সে রাত্রে সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল। নটগুরু গিরিশচন্দ্র সেদিন এই অভিনয়ে দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়ান্তে তিনি নাকি বলেছিলেন, শোনা যায় যে, 'আমি যদি এঁদের মতো সব সুদক্ষ শিল্পী পেতুম তা হলে আমার থিয়েটারে আগুন ছুটিয়ে দিতে পারতুম।' বাস্তবিকই ঠাকুরবাড়ির অভিনয় উৎকর্ষ সকলকেই বিমুগ্ধ করত।

সংগীত সমাজে পরবর্তী নাটক হয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সেই 'এমন কর্ম আর করব না'। রবীন্দ্রনাথ নাটকখানিকে এবার অনেক

অদলবদল করে 'অলীকবাবু' নাম দিয়ে মঞ্চস্থ করেছিলেন এবং এবারও নিজেই অলীকবাবুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দর্শকদের মধ্যে সেবার কবির অনুরাগী কবিবর প্রিয়নাথ সেনও ছিলেন। তিনি কবির সেই অভিনয় দেখে এসে লিখেছিলেন: 'এমন সুন্দর অভিনয় কখনও দেখি নাই। নিজে রবিবাবু 'অলীক-প্রসাদ' সাজিয়াছিলেন। যাঁহারা রবিবাবুর অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে কবিবর শুধু আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের শিরোমণি নহেন, নটচূড়ামণিও বটে।'

তদানীন্তন স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মসমাজ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করাটা নীতি-সম্মত বলে মনে করতেন না। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গত কৃষ্ণকুমার মিত্র ছিলেন সেই দলেরই একজন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকখানি প্রতিমা পূজার বিপক্ষে এবং ধর্মের নামে 'বলিদান' বা জীবহত্যার বিরোধী শুনে তিনি সাগ্রহে অভিনয় দেখতে এসেছিলেন, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে রঘুপতির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের অভিনয় দেখে তিনি এমনই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় উক্ত অভিনয়ের এক সুদীর্ঘ সমালোচনা করে কবির নাট্য-প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। শুনেছি এর পর নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে তাঁর মতও পরিবর্তিত হয়েছিল।

শান্তিনিকেতনে প্রায় প্রতি বৎসরই কবির রচিত নূতন নূতন নাটক এবং মাঝে মাঝে পুরাতন নাটকেরও পুনরাভিনয় হত। কবির সেই নাট্যাভিনয় দেখবার জন্য শহর থেকে কবির বহু ভক্ত শান্তিনিকেতনে গিয়ে হাজির হতেন। কবি তাঁর 'শারদোৎসব' নাটকে স্বয়ং মহারাজ বিজয়াদিত্যের ছদ্মরূপ সন্ন্যাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। 'রাজা' নাটকই পরে 'অরূপরতন' নামে কিছু পরিবর্তিত হয়ে পুনরভিনীত হয়েছিল।

নাট্যকলা ও নৃত্যকলা এবং সংগীতরাজ্যে নব নব ধারা সৃজনের আকাঙ্ক্ষা কবির মনে সেই যে তাঁর প্রথম যৌবন থেকেই জাগ্রত হয়ে উঠেছিল, জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত দেখতে পাই কবি তাঁর এ ব্রত

পালনে সমভাবেই সচেষ্ট হয়ে রয়েছেন। শান্তিনিকেতনে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে নাট্যপ্রতিভা বিকাশের সুযোগ দানের জন্যই তিনি সেখানে এই আনন্দ-যজ্ঞের আয়োজন করতেন। ছাত্রছাত্রীদের অভিনয় উপযোগী একাধিক নাটক তিনি রচনা করে গিয়েছেন এবং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সমানে তিনি নিজেও অভিনয় করেছেন। এদেরই জন্য স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত 'মুকুট' নাটকখানি তিনি প্রথম রচনা করেন। তাঁর 'শারদোৎসব' নাটকেও কোনো স্ত্রী-ভূমিকা ছিল না। আবার 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটকখানি সম্পূর্ণ পুরুষ-ভূমিকা বর্জিত। 'মুকুট' অভিনয়ের সময়ই শান্তিনিকেতনে কবির 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকখানি অভিনীত হয়। কবি এ নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকা অভিনয় করেন। এই ধনঞ্জয় বৈরাগীকে আমরা আবার 'মুক্তাধারা' নাটকে দেখতে পাই। কিন্তু কবি সে নাট্যাভিনয়ে ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব শান্তিনিকেতনেও বিরাটভাবে পালিত হয়েছিল। শহরের বহুলোক এই উৎসবে যোগ দেবার জন্য শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই উৎসবের আনন্দসূচীর মধ্যে 'রাজা' নাটকের পুনরাভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। এবারেও কবি এ নাটকে ঠাকুর্দার ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করে সকলকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছিলেন।

'অচলায়তন' নাটকখানিতে কবির একটি বিশেষ বক্তব্য নিহিত থাকা সত্ত্বেও এ নাটকখানি রচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এর অভিনয় আয়োজন করা কবির পক্ষে নানাকারণে সম্ভব হয় নি। পরে শান্তিনিকেতনে এবং জোড়াসাঁকোতেও 'অচলায়তন' অভিনীত হয়েছিল। কবি এ নাটকে 'আচার্য অদীনপুণ্যে'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অতি মনোজ্ঞ অভিনয় করেছিলেন। কবির পরবর্তী নাটক 'ডাকঘর' বিচিত্রা হলে অভিনীত হয়েছিল। 'ডাকঘর' এক করুণ রসাশ্রয়ী অভিনব রূপক নাটক, তেমনিই হয়েছিল প্রাণস্পর্শী এর অপূর্ব অভিনয়। কবি এ নাটকে ঠাকুর্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

এরপর শান্তিনিকেতনে কবি তাঁর নবরচিত নাটক 'ফাল্গুনী'র অভিনয়ে অন্ধ বাউলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। 'ফাল্গুনী' নাটকখানির কলেবর ক্ষুদ্রাকার বলে কবি এর সঙ্গে প্রস্তাবনাস্বরূপ 'বৈরাগ্য-সাধন' নামে একটি অংশ সংযোগ করেন এবং এতে কবিশেখরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। একই রাত্রে বিভিন্ন ভূমিকায় কবিকে দেখে সহজে কেউ বুঝতে পারেনি যে যিনি কবিশেখর, তিনিই বাউল। এই অভিনব নাটকের প্রয়োগকৌশল, এর সাজসজ্জা, পশ্চাদপট ও আসবাবপত্র সমস্ত কিছুর মধ্যেই এমন একটি প্রাচীন ভারতীয় ঐশ্বর্যের স্নিগ্ধশ্রী পূর্বাপর লিখিত লাবণ্যে বিকশিত করে তোলা হয়েছিল, যা দেখে দর্শকমাত্রেই বেশ একটু স্বাজাত্যাভিমানে গর্বিত ও মুগ্ধ না হয়ে পারে নি। 'ফাল্গুনী' অভিনয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন একটি সহজ সাবলীল সুসংগত সৌন্দর্য প্রকাশ পায় যে তার প্রভাব পেশাদার সাধারণ রঙ্গালয়েরও কোন কোনটিকে এই ধরনের প্রয়োগ-কৌশল অনুসরণে প্রবুদ্ধ করে। বিশেষত এই নাটকখানি যখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বাঁকুড়ার নিরন্নদের সাহায্যকল্পে উপর্যুপরি চার রাত্রি অভিনীত হয় তখন সারা শহরে এ নাটকের অভিনব অভিনয় একটা বিপুল সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। এ নাটকের অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঠাকুর পরিবারের সকলেই প্রায় এক একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এ নাটকের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের পশ্চাতে ছিলেন স্বয়ং শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর প্রভৃতি প্রখ্যাত কলাকুশলীগণ। এঁদের সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় ও কবির কল্পনাধন্য পরিচালনার গুনে 'ফাল্গুনী' নাটকের অপূর্ব অভিনয় অসামান্য সাফল্যের জয়মাল্য অর্জন করেছিল।

এর পর যতদূর মনে পড়ে, কবি 'মুক্তধারা' নাটক লিখে এনে বিচিত্রার আসরে পাঠ করে শোনালেন। কবির কণ্ঠে সন্তানহারা মায়ের সেই মর্মস্পর্শী ডাক: 'সুমন! ওরে সুমন! বাবা সুমন আমার!' আজও যেন আমাদের কানে বাজছে। কবি তাঁর শেষের

দিকের লেখা সব নাটকই প্রায় বিচিত্রার আসরে প্রথমে পড়ে শোনাতেন। কথকতার মতো সে কি আশ্চর্য পাঠ; নাট্যোল্লিখিত প্রত্যেকটি চরিত্র যেন কবির কণ্ঠে নিজ নিজ রূপে রসে মূর্ত হয়ে উঠত।

প্রতিভাবান লেখক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, যিনি আবাল্য কবির এক-জন প্রিয় শিষ্য, তাঁর একটি রচনার ভাব অবলম্বনে কবি 'রথযাত্রা' নামে একখানি ক্ষুদ্র রূপক নাটিকা রচনা করেছিলেন। পরে এটি 'কালের যাত্রা' বা 'রথের রশি' নামে শান্তিনিকেতনে অভিনীত হয়েছিল।

'প্রজাপতির নির্বন্ধ'কে পরে 'চিরকুমার সভা' নাম দিয়ে কবি একখানি চমৎকার হাস্যরসোজ্জ্বল নাটকে রূপান্তরিত করে দিয়ে-ছিলেন। সাধারণ পেশাদার নাট্যশালা 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এ নাটকখানি অভিনীত হয়েছিল। অভিনয় দেখবার সময় বেশ বোঝা যায় অক্ষয়ের ভূমিকাটি যেন কবি নিজে অভিনয় করবেন বলেই রচনা করেছিলেন। কিন্তু, কবিকে এ ভূমিকায় কখনো অভিনয় করতে দেখিনি। যেমন দেখিনি তাঁর নূতনতর নাটক 'গৃহপ্রবেশ' ও 'শোধবোধ' বই ছু'খানিতে। এ ছু'খানি উচ্চাঙ্গের নাটকও সাধারণ রঙ্গমঞ্চ 'ষ্টারে' 'আর্ট থিয়েটার' সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত হয়েছিল।

কবি তাঁর সেকালের নাট্যকাব্য 'রাজা ও রানী'কে ভেঙেচুরে বদলে 'তপতী' নামে আশ্চর্য এক নূতন রূপ দিলেন। ঠাকুরবাড়ির আসরেই এই 'তপতী'রও প্রথম অভিনয় হয়েছিল। কবি এ নাটকেও মহারাজ বিক্রমদেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কবির বয়স তখন সত্তর হয়েছে। এ অভিনয়ে কবি মঞ্চের উপর দৃশ্যপট ব্যবহার ও পরিবর্তন একেবারে তুলে দিয়েছিলেন।

কবির শেষ অভিনয় দেখবার সুযোগ হয় আমাদের 'নটীর পূজা' নাটকে বৌদ্ধ ভিক্ষু উপালির ভূমিকায়। যতদূর মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সপ্ততিতম জন্মোৎসবের পর দীর্ঘকাল আর কোনো নাটকের কোনো বিশেষ ভূমিকা অভিনয় করবার জন্য রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন

নি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে কবির সপ্ততিতম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে তাঁর নবরচিত 'শাপমোচন' নাটকের 'মূক-অভিনয়' হয়েছিল। রঙ্গজগতে এ আবার কবির আর এক নূতন কীর্তি। এই অভিনব নৃত্যনাট্য বাংলার রঙ্গমঞ্চে এক অভূতপূর্ব ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। কবি নাটকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন এবং তদনুসারে নাটকের পাত্র-পাত্রীরা নীরবে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে নাট্যোক্ত বিষয়টি পরিস্ফুট করে তোলেন।

এইভাবে 'বর্ষামঙ্গম', 'শেষবর্ষণ', 'সুন্দর', 'ঋতুরঙ্গ', 'নটরাজ', 'বসন্তোৎসব', 'নবীন' ও 'শারোদৎসব' প্রভৃতি ঋতুপূজার নৃত্য-গীতানুষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণ কবির নেতৃত্বেই পরিচালিত হত। কখনো অন্তরালে থেকে কখনো বা প্রকাশ্যভাবে রঙ্গমঞ্চে বসেই তিনি এগুলির পরিচালনা করতেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবির 'বসন্ত' গীতিনাট্যখানি। এও কবির এক নূতন সৃষ্টি। এই নাটকে কবি রঙ্গমঞ্চে নেমেছিলেন 'কবি'র ভূমিকাতেই। তাঁর সে অপূর্ব বাচনভঙ্গিমায় নব বসন্তের নবীর রূপ ফুটে উঠেছিল তরুণ নটনটীদের নৃত্য-গীতের মাধ্যমে, অভিনব রূপে রসে।

গোধূলি আকাশের অস্তাচলগামী রঙিন সূর্যের মতো তিনি যে 'নৃত্যনাট্য' নামে রঙ্গমঞ্চের পাদপীঠে অভাবিতপূর্ব অর্ঘ্য নিবেদন করে গেছেন তা আমাদের নাট্য-বৈভবকে চিরদিন গৌরবান্বিত করে রাখবে। 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা', 'তাসের দেশ', 'পরিশোধ' প্রভৃতির অভিনয়কালে কবি স্বয়ং অন্তরাল থেকে যোজনাবাণীগুলি (Commentaries) তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করতেন। এর ফলে প্রত্যেকটি নৃত্যনাট্য যেন অদ্ভুত প্রাণবন্ত হয়ে উঠত।

'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' কৌতুক নাটকখানি কবি আশ্রম-কন্যাদের দিয়ে অভিনয় করিয়েছিলেন। ভূমিকাগুলির অভিনয় অভ্যাস করিয়ে দেবার সময় ক্ষীরো ঝির চরিত্র তিনি যেভাবে বলে ও দেখিয়ে দিতেন তাতে মনে হত তিনি নারী ভূমিকাতেও অদ্ভুত পারদর্শী ছিলেন। একাধিক নাটকের পাঠ ও আবৃত্তি যাঁরা কবির মুখে শুনেছেন তাঁরা

জানেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের পাত্রপাত্রীর প্রত্যেকটি চরিত্রের কি সর্বাঙ্গ-সুন্দর রূপ দিতে পারতেন।

কবি তাঁর একাধিক নাটক অভিনয় করে যেতে পারেন নি, যেমন 'বাঁশরী', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' ইত্যাদি। চরিত্রের উপযোগী প্রধান ভূমিকা অভিনয়ের জন্য যোগ্য শিল্পীর অভাবই এর মুখ্য কারণ।

বিশ্বভারতীর নিঃস্ব অর্থকোষ কথঞ্চিৎ পূর্ণ করবার আশায় রবীন্দ্রনাথকে একাধিকবার সদলবলে কলকাতায় এসে 'নিউ এম্পায়ার' এবং 'কর্ণওয়ালিস রঙ্গমঞ্চে' কয়েকখানি নাটক ও নৃত্যনাট্য অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। এই সময়ে 'বিসর্জন' নাটকে একরাত্রি জয়সিংহের ভূমিকায় আর একরাত্রি রঘুপতির ভূমিকায় কবি অবতীর্ণ হবেন শোনা গিয়েছিল। তখন তাঁর বয়স সাতষট্টি বৎসর। এই প্রতিভার নট-কবি সেই প্রবীণ বয়সেও উক্ত নাটকের জটিল ভূমিকা জয়সিংহ চরিত্রের অভিনয়ে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, সে অসামান্য নট-নৈপুণ্যের তুলনা মেলে না। রঘুপতির ভূমিকায় তিনি আর নামতে পারেন নি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর নেমেছিলেন। একাধারে নট ও নাট্যকারের যে অদ্ভুত শক্তির সমন্বয় আমরা রবীন্দ্র-প্রতিভার মধ্যে পাই, পৃথিবীর আর কোনো কবির মধ্যে তার পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি নট ও নাট্যকার অমর কবি শেক্সপীয়রের জীবনেতেও দেখা যায় নাট্যকাররূপে তিনি যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন নটরূপে তিনি সে খ্যাতি লাভ করতে পারেন নি। কেউ কেউ 'লিয়োনার্দো ভিঞ্চি'র সঙ্গেও কবির তুলনা করেন। তাতে বোঝা যায় যে এ দু'জনের প্রতিভা সম্বন্ধে তাঁদের সম্যক্ ধারণা নেই।

'অরূপরতন' নাটকে ঠাকুর্দার ভূমিকায় কবি 'নিউ এম্পায়ার' রঙ্গমঞ্চে শেষ অভিনয় করেন। এ সময় তাঁর বয়স পঁচাত্তর বৎসরে এসে পৌঁচেছে। কিন্তু এই বয়সেও তাঁর সে অভিনয় দেখবার যাঁদের সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁদের স্মৃতিতে কবির সে অনবদ্য অভিনয় অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। চিরনবীন নটকবির দুরন্ত যৌবন শুধু বাণীকুঞ্জে নয়, রঙ্গমঞ্চেও অক্ষয় হয়ে আছে।

আজ যতক্ষণ কুয়াসা ছিল ততক্ষণ সবটা সঙ্গে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে কুয়াসার ওপারে কোটি সূর্যের শোভাযাত্রা চলছে, তারা সবাই মিলে এত আগুন জ্বালিয়েছে যে সেই আগুনের ধোঁয়ায় আকাশ হয়ে গেছে কালোয় কালো। ততক্ষণ আমার মনে হচ্ছিল আমার চোখে যেন কে একখানা globe protector চশমা পরিয়ে দিয়েছে, যেদিক তাকাই সেদিকেই ছাই রঙ।

সন্ধ্যাবেলা সে চশমা সরিয়ে নিলে। দেখলাম চাঁদ উঠেছে, জ্যোৎস্নার লহর ছুটেছে, আকাশ সরোবর এত নির্মল যে তল পর্যন্ত চোখ যায়। তখন মনে হলো আমি এই তুচ্ছ লণ্ডন শহরের বাসিন্দা নই, এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতেও আমাকে ধরছে না, ঐ যে আকাশ-সরোবরের তলে স্ফটিক নির্মিত স্তম্ভ, ওরি ভিতরে লুকানো একটি কৌটায় আমার প্রাণ স্পন্দিত হচ্ছে, সেই স্পন্দন আমি বুকে হাত রেখে শুনতে পারছি। তখন মনে হলো আমি কি বিরাট, আমি কি অমেয়! আমার বুকের সঙ্গে আমার হাতের ব্যবধান এক ইঞ্চি নয়, নিযুত নিযুত যোজন ; একের স্পন্দন আরেকের কাছে ধরা পড়তে এক-আধ সেকেণ্ড নয়, শত শত সহস্র বছর লাগে। আমি কালাতীত, আমি চিরন্তন।

নিজের এই বিশ্বরূপ-দর্শন জীবনে প্রতি দিন ঘটে না, লণ্ডনে যেমন কুয়াসা লেগেই থাকে জীবনেও তেমনি আত্মবিস্মৃতি লেগেই থাকে। কদাচ এক-আধ দিন আবছায়া মতন মনে হয়, আমি অমৃতস্য পুত্রাঃ, আমার দেহ মন আমার পৃথিবী আমার আকাশ— সবই যেন একখানা কুয়াসা মাত্র, এ সবকে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ করে আমি কোটি সূর্যের মুকুট পরে জ্বলছি, আমি দিব্য তেজাঃ, আমি চির যৌবন।

পরমুহূর্তেই অবিশ্বাসের ভারে নুয়ে পড়ি। তখন কিছুতেই ধারণা

হয় না যে আমি স্থান কালের কুয়াসায় বদ্ধ কত লোকের অনুগ্রহ-নির্ভর সামান্য একজন ছাড়া আর কিছু, এত অসহায় যে আমার জীবনটাই যেন একটা ঘটনাচক্রে ঘটে যাচ্ছে গোছের ব্যাপার, উপর দিয়ে একখানা মোটর চলে গেলে কিংবা ভিতরে গোটা কয়েক ব্যাসিলি বাসা বাঁধলেই সব শেষ। যেন আমি নিয়তির হাতের একটা কলের পুতুল, সেও যেমন অন্ধ, আমিও তেমনি মূক, সে যখন আমাকে ভুল করে ভেঙে ফেলে, আমি তখন তাকে নালিশটাও জানাতে পারিনে। এমন আত্ম-অবিশ্বাসের সময় ওমর খৈয়াম খুলে বসি, তাঁর রচনা এক পেয়ালা মদের মত সব গ্লানি ভুলিয়ে দেয়। কিংবা এইচ. জি. ওয়েলসের সঙ্গে আফিং খেতে বসে যাই, মন উড়তে থাকে সুদূর ভবিষ্যতে যেখানে সবই কেমন করে ঠিক হয়ে গেছে, মাটির উপরে স্বর্গ নেমে এসেছে, দুঃখ দ্বন্দ্ব দুর্ভাবনা চিরকালের মতো শেষ। কিংবা মদ বা আফিং খাবার মত বিলাসিতাও আমাদের সাজে না। আমাদের কুয়াসা-ঢাকা প্রাত্যহিক জীবনে আমরা কলুর চোখঢাকা বলদের মত ঘুরে মরি। উদরান্নের তাড়নায় উপরে একটু রংচং ফলিয়ে গাধা খাটুনির গাধার টুপির উপরে "dignity of labour" এঁকে, কাজের মানুষ আমরা কেবল কাজই করি, কাজের ঘণ্টা খেলা করি তো অমনি বিবেকে বাধে, সেজন্যও নিজের কাছে ও পরের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় যে সেটা নিছক সময় নাশ নয়, সেটা efficiencyরই অঙ্গ, সেটাও দরকারী। আমাদের জীবনের আগাগোড়াই যে দরকারী, আমরা যে অদরকারের ধার দিয়েও যাইনে, এই আমাদের প্রধান গর্ব, এবং অদরকারীর কিছু দৈবাৎ করে বসি তো আমাদের লজ্জার সীমা থাকে না।

এই যে দাস মৌমাছির মতো দরকারী হবার গর্ব, এ যে আসলে কত বড় একটা গ্লানি তা আবছায়া মতন মনে হয় যেদিন কুয়াসার ঠুলি খসে পড়ে, জগতের ঐশ্বর্যময় রূপ চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, সহসা আবিষ্কার করি আমরা রাজা, আমাদের এই সাতমহলা প্রাসাদের যেখানে চোখ পড়ে সেখানে কোহিনূর ময়ুর সিংহাসন। অলস একটি

মুহূর্তে আমরা নিরবধি কালের রাজত্ব ভোগ করে নিই, কোথায় ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যায় সমাজের দরকারী চাকর হবার ইতর গর্ব, তখন আমরা লীলাময়, লীলার আনন্দে কোটি মন্বন্তর কেটে যায়, ঘড়ি খুলে দেখি মাত্র একটা মিনিট কেটেছে।

আমরা কাজের মানুষ ; আমাদের জীবনের ঘড়িতে এহেন একটা মিনিট কদাচ বাজে কি-না সন্দেহ। কিন্তু মনে করা যাক এমন একজন মানুষ আছেন যাঁর ঘড়িই নেই যাঁর সময় মিনিট দিয়ে ভাগ করা যায় না। মিনিট তো পৃথিবীর অক্ষাবর্তনের ২৪ ভাগের ৬০ ভাগ। যাঁকে পৃথিবীতে ধরে না, যিনি অসীম জগতে বাস করেন তাঁর জীবনকে মিনিট দিয়ে ভাগ করাও যা, মন্বন্তর দিয়ে ভাগ করাও তাই। তিনি মহাকলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নিজের পরমায়ুটাকে কেবল অসংখ্য মুহূর্ত দিয়ে নয়, অসংখ্য মন্বন্তর দিয়ে গেঁথেছেন এবং অসামান্য মালাখানিকে স্বয়ং মহাকালের কণ্ঠে দিয়েছেন।

এমন মানুষকে আমরা ভাল বুঝতে পারিনে, আমাদের সঙ্গে এঁর এতই অমিল। ইনি স্কুলে কলেজে পড়তে যান নি, আপিসে আদালতে খাটতে যান নি, সামাজিকতা করতে পার্টিতে যান নি, অপথে বিপথে বেকার বেড়িয়েছেন, পথের শেষে যে কোথাও একটা পৌঁছাতে হবে এমন তাড়া ইনি একেবারেই বোধ করেন নি, এঁর জীবনটাই একটা খেলার ছুটি। লোকে ঘর বাঁধে আকাশ বাতাসকে বাইরে রাখতে, ইনি নদীতে নৌকায় নৌকায় ভেসেছেন আকাশ বাতাসকে অন্তরে রাখতে।

দিনের পর দিন এই বিশাল জগৎ-এর সূর্য নক্ষত্র, আলোক অন্ধকার, শরৎ বসন্ত, ফুল পাখী নিয়ে এঁর অণুতে অণুতে অনুপ্রবিষ্ট হলো এবং এঁকে আপনার মতো বিশাল করে তুললো। যে দেশে এঁর বাসা সে দেশের আকাশে রাত্রি দিন উৎসব চলে, যেন ইন্দ্রসভা।

জন্মক্ষণ থেকে সেই সভার নিমন্ত্রণ যিনি পেয়েছেন, তিনি কি সেখান থেকে নড়তে পেরেছেন, ফিরতে পেরেছেন ? সামান্য পৃথিবীর

সামান্য তর্কসভায় কি কেউ কোন দিন তাঁকে দেখতে পেয়েছে? তিনি ইন্দ্রসভার সভাসদ, তিনি তেত্রিশ কোটী অদিতি সন্তানের একতম, তিনি আদিত্য। আকাশের সূর্যদেবের সঙ্গে এক সারিতে তাঁর আসন। ঐশ্বর্যের অমৃত সেবন করতে তিনি মুহূর্তে মুহূর্তে অমর হলেন। সেই অমরত্বের কতক ধরা পড়লো তাঁর সৃষ্টিতে, কতক থেকে গেল দৃষ্টির অতীতে। ব্যক্ত করবার পক্ষে এত আনন্দ তিনি পেয়েছেন যে, কবিতায় প্রবন্ধে গল্প ও গানে লক্ষ বার ভাবে লক্ষ সঙ্গীতেও ব্যক্ত করে উঠতে পারেন নি, ব্যক্ত করবার আবেগে বাষ্পাকুল হয়েছেন। এই বাষ্পাকুলতা তাঁর রচনাকে চিত্র বিচিত্র করেছে আলোর সঙ্গে মরণের মত।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এই বিশ্ব সৃষ্টির মত। বিশ্বস্রষ্টার অন্তরে নিজেকে ব্যক্ত করবার যে প্রচণ্ড আবেগ আছে, সে আবেগের যতটুকু তিনি ব্যক্ত করেছেন, তার তুলনায় অনেক অনেক বেশী তিনি ব্যক্ত করতে চাইছেন; বিশ্বসৃষ্টি হচ্ছে যা হয়েছে ও যা হতে চাইছে দুইয়ের সমন্বয়; একাধারে মর্ত্য ও স্বর্গ, মাটি ও বাষ্প, বৃক্ষ ও বীজ। যারা নাস্তিক তারা স্রষ্টার সৃজনাবেগ সম্বন্ধেই নাস্তিক, তারা গানটুকু শোনে, রেশটুকু শোনে না। রূপটুকু দেখে, ইঙ্গিতটুকু দেখে না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গুরু বিশ্বকবির কাছে পাঠ নিয়েছেন, তাঁর সৃষ্টি বিশ্বসৃষ্টির মতই সৃজনের আবেগে পরিপূর, তাঁর রচনায় ব্যক্তির চেয়ে ব্যঞ্জনাই বেশি। সেইজন্য তাঁর রচনাকে একবার পড়ে শেষ করে দেবার উপায় নেই। লক্ষবার পড়তে হয়, লক্ষবার বুঝতে হয়। যাদের ধৈর্য অল্প তারাই নাস্তিক হয়ে এক রকম সস্তা শান্তি পায়, তারাই লেখা পড়ে' ঐ কাগজের আগুনে চায়ের জল গরম করতে বসে। তারা খোঁজে একটা হাতে হাতে পাবার মত অর্থ, একটা উপকার। এসব লোকের পক্ষে "গীতিমাল্য"র চেয়ে "কথামালা" বড়, "ফাল্গুনী"র চেয়ে "নীলদর্পণ" বড়। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বার্নাড শ বড়।

আর যারা অমৃত চায়, যাদের ধৈর্য অসীম, যারা ওঁ নামক একটি

মাত্র শব্দের জন্য একটা জীবন দিয়ে ফেলাকে সামান্য দান মনে করে, তাদেরি জন্য রবীন্দ্রনাথ। তারা তাঁর একটি রচনাকে এক একটি ফুল বা এক একটি তারার মতো ভোগ করে, গন্ধ থেকে রূপ থেকে বুঝতে পারে এর শিরায় শিরায় জীবন শিহরিত হচ্ছে, জীবনেরই মতো এ এক মরণাতীত রহস্য ; রসিকের জন্য এর সৃষ্টি, ক্ষুধার্তের জন্য এ নয়। যে মানুষ ক্ষুধার দাস, জরা ব্যাধির মৃত্যুর শাসনাধীন, কর্মচক্রের মৌমাছি, সে তো রাজা নয়, রাজভোগের মূল্য সে কি বুঝবে ? তাকে আকাশ ভরা তারার সঙ্গে ভোজে না বসিয়ে কাঙালী ভোজনে পাঠিয়ে দিলে সে খুশি হয়।

আমরা যখন খেলার আনন্দে খেলা করি তখনি আমরা মুক্ত, আমরা রাজা, আমাদের হাতে যুগ-যুগান্তকাল সময়, আমাদের হাতে জগৎ ভাণ্ডারের সোনার চাবী। আমাদের কিসের অভাব যে, অভাব করে কবির সম্মুখে দাঁড়াবো, বলবো—আমাদের ক্ষুধা মেটাবার মত কিছু ভিক্ষা দাও, কাজে লাগাবার মত কিছু পরামর্শ দাও। রবীন্দ্র-নাথের কাব্য-সাক্ষাৎকারের জন্য যখন যাই তখন আমাদের রাজবেশ বললাম বটে, কিন্তু কাঞ্চনমূল্য এর নেই, এ বেশ ধূলায় ধূসর শিশুর অঙ্গেও আছে। রবীন্দ্রনাথের খাঁটি সমজদার আমি অত্যন্ত অল্প-শিক্ষিত চাষার মধ্যেও দেখেছি। সে যেমন লাঙল ঠেলে, মৃদঙ্গ বাজায়, হা-ডু-ডু খেলে ও ধানে বোঝাই নৌকা চালিয়ে শহরে শহরে যায়, তেমনি রবীন্দ্রনাথের গান গায়, সেটাও তার পক্ষে একটা adventure। সে তো অভাবগ্রস্তের মতো অর্থ চায় না, সে চায়

যত বিপদ কেবল আমাদের মত Philistine-দের বেলা, আমরা যারা হক পয়সা দিয়ে 'valve' কিনি, কাগজের দর কালির দর হিসাব করে লেখার দর কষি, আমরা যারা রাজসাক্ষাৎকারে যাবার সময় তারা ঝলমল উন্মুখ আকাশের উদার রাজবেশখানি পরতে ভুলে যাই, আমরা যারা শ্রদ্ধার পাত্রকে শ্রদ্ধা দেখাতে কুণ্ঠিত হয়ে নিজেকে শ্রদ্ধেয় করে তুলতে পারিনে। আরো বিপদ আমরা যখন একেকজনা একেক রকম

দাবী নিয়ে কবিকে ব্যতিব্যস্ত করতে যাই ; যখন একজন বলি, তোমার লেখায় দেশের সুবিধা কতটুকু হলো ; একজন বলি, তোমার লেখায় দীন-দরিদ্রদের Proletarian-দের অভাব অভিযোগ ফুটে উঠলো না কেন ; একজন বলি তোমার লেখায় জীবনের বাস্তব প্রতিকৃতি কোথায় ? এত প্রশ্নের ঝাপটা সয়েও কবি নিরুত্তর থাকেন—থাকতে পারেন। এও তাঁর ক্ষমতার পরিচায়ক।

যে নারী নিজে মা হয়েছে যে কোন মায়ের ছেলের প্রতি তার একটি স্বাভাবিক দরদ আছে। যেন তার জন্য সেও দায়ী। কোন মতেই সে নিরপেক্ষ বিচারকের মতো আরেক মায়ের ছেলের দোষ গুণ তৌলে দেখতে পারে না, কেমন করে দোষগুলো তার চোখ এড়াতে চায় কিংবা তার হৃদয় থেকে সমর্থন টেনে আনে। আর সে যদি তার প্রিয় সখীর ছেলে হয়ে থাকে তো তার সাতখুন মাপ, সে নিজের ছেলেরও বাড়া।

রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টা। এই বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টির প্রতি তাঁর একটি অহেতুক দরদ আছে, এও যে আরেক স্রষ্টার বড় বেদনার সৃষ্টি। সেই আরেক স্রষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়তম বন্ধুর মতোই চেনেন, এবং ভালবাসেন, আজন্ম তিনি তারই সঙ্গে তো অপথে বিপথে ঘুরেছেন। আকাশে বাতাসে মাটিতে নদীতে, সকল আত্মীয়ের মধ্যে তিনিই তো তাঁর আত্মীয়তম। রবীন্দ্রনাথ জীবনে একটা দিনও ভাবেতে নাস্তিক হতে পারেন নি, সংশয়ী হতে পারেন নি,একটা দিনও ভাবতে পারেন নি যে জগৎ একটা মায়া কিংবা একটা প্রাণহীন আত্মহীন জড়পিণ্ড।

গানের বেদনা কণ্ঠে নিয়ে তাঁর জন্ম, প্রথম থেকেই উপলব্ধি করেছেন তাঁরই গানের মতো এই জগৎটিও কার একখানি গান, মমতায় দরদে দায়িত্বে তাঁর স্রষ্টা-হৃদয় একে একবারও বিচার করে নি, একে ভালবেসেছে, বিশ্বাস করেছে, সমর্থন করেছে। জীবন ভোরে তিনি অনেক দুঃখও পেয়েছেন, অনেক দুঃখই দেখেছেন, বন্ধুর উপরে অভিমানও বড় কম করেন নি, কিন্তু বন্ধুর সৃষ্টি তাঁর এত প্রিয় যে একবারও তিনি দূর দূর করে সংস্কারকের মতো ঝাঁটা

নিয়ে তাড়া করলেন না, কিংবা তার থেকে দূরে পালিয়ে বৈরাগীর মতো শবাসীন হলেন না।

তিনি তার সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করে নিলেন, তার অসংখ্য বন্ধন। সে যেন তাঁরই একখানি গান, তাঁরই একখানি কবিতা, তার কত ছন্দপতন, কত বেসুর, কত ত্রুটি, তবু সে সুন্দর, সে ভালো, সে সত্য।

নিখিল বিশ্বকে একান্ত আপনার করতে পেরেছেন বলে' রবীন্দ্রনাথ কোনদিন তথাকথিত realist হতে পারেন নি। তিনি ঠিক জেনেছেন কুয়াসার ওপারে কোটি সূর্যের শোভাযাত্রা, দুঃখের আড়ালে নরম আনন্দের আয়োজন, মৃত্যুর মুখোস পরে' নবজাত শিশুর হাসি। বৃহৎ জগতে ও বৃহৎ কালে বাস করতে করতে রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি দুই হয়েছে বৃহৎ। তিনি যা দেখেছেন তাই বৃহত্তর reality—তার "কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথাও বিচ্ছেদ নেই"। তিনি ঠিক জেনেছেন আমরা ছদ্মবেশী রাজা, আমাদের মধ্যে যে নিকৃষ্টতম সেও। আমাদের দোষগুলো রাজকীয় রকমের, আমাদের দুঃখগুলোও রাজকীয়। একবার যদি আমরা একে তাকে ওকে দোষ দিয়ে সমস্ত সৃষ্টির বিরুদ্ধে মূর্তিমান নালিশের মতো দাঁড়াই ; এর কাছে তার কাছে ওর কাছে হাত পেতে সমস্ত সৃষ্টির চোখে হেয় হই। আমাদের প্রত্যেকের যে আইডিয়াল দিকটা আছে, যেখানে আমরা সৃজনের আবেগ নিয়ে বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে বিশ্বসৃষ্টিতে রত, যেখানে আমরা যা হয়েছি তার অনেক হতে চাইছি সেই দিকটার ছবি আমাদের হ'য়ে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন। মানুষের প্রতি অসীম দয়া তো কত মহাত্মা জনের আছে, কিন্তু অসীম শ্রদ্ধা আছে রবীন্দ্রনাথের মতো জনকয়েক দ্রষ্টার। এতটা শ্রদ্ধা আছে বলেই তিনি মানুষের তুচ্ছ অভাব অভিযোগ ও তুচ্ছ আবেদন নিবেদনগুলোকে তুচ্ছ বলতে পেরেছেন। তাই নিয়ে মানুষকে দরিদ্র বা কুৎসিত বলতে তাঁর লেখনীতে বেধেছে, কোনদিন একটিও মানুষকে তিনি কাব্যে বা উপন্যাসে অপমান করেন নি, প্রত্যেকেরই

স্বপক্ষে কোন না কোন বক্তব্য খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর রচনায় "devil" নেই। কেন না বিশ্বসৃষ্টিতে devil নেই। সবাই ভালো, কেউ এক রকম, কেউ অন্য রকম। সবাই সুন্দর, কেউ এক রকম, কেউ অন্য রকম। এবং সবাই রাজা—আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে—রবীন্দ্রনাথের দেশ ও রবীন্দ্রনাথের কাল আমাদের দেশকালের সমর্থক না হয় তো ছোট একটি শতাব্দীতে থাক। তিনি এতবড় জগতেও এত বিস্তৃত কালে থাকেন যে তার কাছে একটা যুঁই ফুলের সুখ-দুঃখ ত্রিশ কোটি মানুষের সুখ-দুঃখকে ছাড়িয়ে যায়, আকাশের যতগুলি তারাকে তিনি চেনেন পৃথিবীর ততগুলি মানুষকে তিনি চেনেন না, এবং হাজার বছর পরে যে অমৃত-পিয়াসীরা জন্মাবে তাদের অমৃত দেবার দায়িত্ব তাঁর যত, আমাদের খাদ্য পানীয় দেবার দায়িত্ব তাঁর তত নয়। তাঁর পরিপ্রেক্ষিত সর্বদেশ ও সর্বকালব্যাপী, তাই তাঁর রচনায় কোন দেশ ও কোন কালের প্রতি অন্যায় পক্ষপাত নেই, তিনি তাঁর বন্ধু বিশ্ব-স্রষ্টার মত ন্যায়নিষ্ঠ।

রবীন্দ্রনাথের বাণী সর্বদেশের ও সর্বকালের মর্মের বাণী। এ বাণী যে আমাদেরও অন্তরতম বাণী এ আমরা ভুলে থাকতে পারি, কিন্তু যখনি শুনি তখনি হৃদয় দুলে ওঠে। এ বাণী যদি খুব ছোট হতো, যদি আমাদের উপস্থিতি সমস্যাগুলোকে এক নিঃশ্বাসে সমাধান ক'রে দিতো, তবে আমরা খুশি হতুম, কিন্তু আমাদের খুশির জন্য এই বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টির তেমন মাথাব্যথা নেই, তিনি সমধর্মার জন্য নিরবধিকাল অপেক্ষা করতে পারেন। আমাদের খুশি করা তো বিদূষকের কাজ, ইনি যে রাজা, এঁর আহ্বান আমাদের রাজ্যসভার গ্রহণ করতে বৃহৎ জগতে ও বৃহৎ কালে সকল আদিত্যের শ্রদ্ধাযোগ্য হ'য়ে সমান সারিতে বসতে, এঁর বাণী—

"আপন মাঝারে গোপন রাজারে প্রাণ যেন তোর পায় রে।"

মাতৃহারা হয়েছিলাম দেড় বছর বয়সে। সাত বছর বয়স পর্যন্ত দিদিমা ও বড়দির কোলেপিঠে মানুষ হয়েছি। তারপর এসে পড়লুম পিতৃ-ভবনের স্নেহবঞ্চিত কড়া শাসন নির্যাতনের রাজত্বে। সেখানে বিনা-দোষে বা অল্প-দোষে গুরু দণ্ডলাভ ছিল দৈনন্দিন বরাদ্দ। মায়ের ভয় গুছিয়ে গুছিয়ে মিথ্যা বলতে শেখালো, 'দুষ্টু-ছেলে' বলে আমার খ্যাতি রটলো চারদিকে।

দিদি, ভগ্নীপতি ও দিদিমার কাছে এই নির্যাতনের ইতিহাস অজ্ঞাত রইল না।

দিদিমা ও দিদির পুনঃ পুনঃ সকরুণ অনুরোধে বিচলিত হয়ে জামাইবাবু ক্রমাগত বাবার কাছে দরবার করে আমাকে বোলপুর শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। বাবার এক বন্ধু ও ভগ্নীপতির বিশেষ পরিচিত হিতকামী শশধর গাঙ্গুলি তখন ঠাকুর এস্টেটের অন্যতম সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্ ছিলেন; শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক অজিত চক্রবর্তীর স্বর্গত পিতা ছিলেন বাবার গুরুভাই। সুতরাং শশধরবাবু ও অজিতবাবুর উদ্যোগে আমি অতি সহজেই সেখানে ভর্তি হবার সুযোগ পেলুম। সেটা ১৯১০ সালের কোনো মাস। বয়স তখন আমার বছর বারো।

ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বোধ হয় আগেই সংক্ষেপে দুটি কথায় আমার পরিচয় পেয়েছিলেন—আমি শৈশবে মাতৃহারা, আমি দুরন্ত। এই দুটি ন্যূনতার মধ্যে যে কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে, সেটা তখনকার কালের অনেক শিক্ষক ও সমাজহিতৈষীর কাছে অজ্ঞাত ছিল। মাতৃস্নেহ বঞ্চিতরাই বিখ্যাত বা কুখ্যাত রাজদ্রোহী ও চিরাচরিত প্রথাভঙ্গকারী হয়; নতুবা প্রবল রকমের বাস্তবমূল্য-পরিবোধশূন্য ধ্যানধারণাপ্রবণ আদর্শবাদী বা মিষ্টিক হয়। বহুলোকের

জীবনী থেকে এই নির্বাচনকে প্রমাণিত করার মালমশলা পাওয়া যায়।

বোলপুর স্টেশন থেকে আড়াই মাইল দূরে শান্তিনিকেতনে পৌঁছুবার জন্য আমার সহগামী আত্মীয়টি ছয় আনা কি সাত আনা ভাড়ায় একখানা গরুর গাড়ি ঠিক করে আমায় নিয়ে চড়ে বসলেন। ঠিক সন্ধ্যার সময় আমরা গন্তব্যস্থানে পৌছুলুম। শান্তিনিকেতনের এলাকায় ঢোকবার কিছু আগে থেকেই ভুবনডাঙার অগভীর তালগাছ ঘেরা বিস্তৃত দীঘি সন্ধ্যার অভ্র-আবীর মেখে দূর থেকে চিক্ চিক্ করছিল ; তার পাড়ের অনতিদূরে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশাইয়ের উঁচু বাংলো দেখা যাচ্ছিল।

একদিকে আম্রকুঞ্জ, অন্যদিকে শালবীথি। তারি মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় অবিন্যস্তভাবে ছোটো-মাঝারি-লম্বা বারো-চৌদ্দখানি কুটীর বা চালাঘর ও খানকয়েক একতলা কোঠাঘর। ওর একপাশে বেশ নীচু গোছের একটি নাতিবৃহৎ কোঠাবাড়ি। পরে জানা গেল, সেটার নীচের তলায় দু'খানা ঘরে লাইব্রেরী ; একটা ঘরে বিধুশেখর শাস্ত্রী মশাই তাঁর বছর সাত-আটের একটি ছেলেকে নিয়ে এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাশি রাশি সংস্কৃত ও পালি পুস্তকপুঁথি পরিবৃত হয়ে বাস করেন। এই সংলগ্ন একটি একতলা দালানের নাতিদীর্ঘ কামরায় রাসায়নিক ও জড়-বিজ্ঞানিক পরীক্ষাগার। এই ঘরের একপাশে ছিল একটি ছোটো দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

পাশে আর একখানা কোঠাঘরে জনকয়েক অল্পবয়সী ছাত্র থাকত। দোতলা লাইব্রেরী বাড়ির ওপর তলায় উচ্চ শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্র বাস করত। ওইখানে সুধীরঞ্জনদা [বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য মহাশয়] থাকতেন, ফার্স্ট ক্লাসের ছাত্র।

ছোটো ছোটো কুঁড়ে ঘরগুলিতে কোনো কোনো শিক্ষক একাকী বা সপরিবারে থাকতেন। মাঝারি ও বড়ো চালাঘরগুলিতে ছাত্ররা থাকত ; প্রত্যেক ঘরে একজন শিক্ষক তত্ত্বাবধায়ক থাকতেন। ঘরগুলির মেঝে কোনোটা এক ফুট, কোনোটা তার চেয়ে কিছু বেশি

উঁচু, আগাগোড়া ইটবাঁধানো ও সিমেন্ট করা ; দেওয়ালগুলি বেশির ভাগ এক ইটের গাঁথুনি ও বালিচুণ ধরানো। এই রকম একখানা মাঝারি লম্বা চালাঘরে একখানি তক্তাপোষে আমার স্থান নির্দিষ্ট ছিল। এই ঘরে ঐ সময় পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত থাকতেন।

আমার সঙ্গী ভদ্রলোক অজিতবাবুর কাছে আমাকে পেশ করে ও তাঁর সঙ্গে পরিচিত করে দিয়ে পরদিন দুপুরে চলে গেলেন। প্রথম দিনকয়েক খুব মুখচোরা ও সংকোচশীল ছিলুম ; তারপর এক এক করে যখন সমবয়সী ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ হল ও ভাব জমল তখন মুখ বেশ বড়ো করেই খুলতে লাগলুম। কয়েকদিনের মধ্যে বুঝতে পারলুম যে, আমার চেয়ে বেশি দুষ্টু ছেলে এখানেও আছে। তাদের দুষ্টুমি নির্দোষ হলে কোনো সাজা দেওয়া হয় না। ক্ষতিকর কোনো দুষ্টুমির পরিচয় পেলে শিক্ষকরা মিষ্টি কথায় বোঝান-সোঝান, কচিৎ তিরস্কার করেন। হাতে পায়ের ডাং-পিটেপনাকে তাঁরা কতকটা পরিমাণে প্রশ্রয় দেন—অবশ্য যদি তাতে আশ্রমের কোনো আইন শৃঙ্খলার সঙ্গে বিরোধ না ঘটে। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

কিন্তু প্রথম প্রথম অন্ততঃ চারটি বিষয়ে আমি রীতিমত অসুবিধে বোধ করতে লাগলুম। কলকাতায় থাকতে পিত্রালয়ে যত লাঞ্ছনাই আমায় সহ্য করতে হোক না কেন, সপ্তাহে অন্ততঃ একটা দিনও দিদিমার স্নেহাঞ্চল বিছায়ে আরামে থাকতে পেতুম! তাঁকেই মা বলে জানতুম ও ডাকতুম, তাঁর আদরের স্নিগ্ধ হস্তাবলেপনে আমার সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে যেত। পাঁচ-ছ'দিন যেতে না যেতেই দিদিমা ও দিদির অভাব মর্মন্তুদভাবে অনুভব করেছিলুম এবং বোধ হয় দু'চারবার আমবাগানের এক নির্জন কোণে বসে হাপুস নয়নে কেঁদেছিলুম। তাঁদের অভাবের তীব্র বেদনাবোধ অচিরে অনেকখানি ভুলিয়ে দিলেন এক করুণার্দ্র চিত্তা মহিলা।

এই মহিলাটি ছিলেন অজিত চক্রবর্তী মশাইয়ের মহীয়সী জননী।

উনি ছিলেন আশ্রমের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত মেয়ে হোস্টেলের তত্ত্বাবধায়িকা। ওঁর অধীনে ১০।১২টি নানা বয়সী মেয়ে থাকত। এরা ছেলেদের সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করত। সহাধ্যয়ন-প্রথা প্রথম ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই বোধ হয় প্রতিষ্ঠিত হয়। যাহোক, অজিত-জননীও আমার পিতার গুরুভগ্নী ছিলেন ; তিনি আমার পিতাকে চিনতেন। আমার মাতৃহীনতাজনিত দুরবস্থার কথা তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রের মুখ থেকে বোধ হয় শুনেছিলেন। তাঁর ছোটো ছেলে সুশীল আমার সহপাঠী ছিল। সে একদিন মা'র কাছে আমায় ডেকে নিয়ে গেল ; সম্ভবতঃ তিনি ওকে বলেছিলেন আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে।

তাঁর ঘরে যাবামাত্র তিনি আমায় বুকে জড়িয়ে আদর করলেন। বললেন : 'যখনি দিদিমা-দিদিদের জন্যে মন কেমন করবে, তখনি আমার কাছে চলে আসবে। আমার তিনটি ছেলে আছে, আজ থেকে চারটি হল।'...তিনি আমাদের সংসারের সব তথ্য খুঁটিয়ে জেনে নিলেন এবং পিত্রালয়ে আমার দুঃখের কথা শুনে আঁচলে চোখ মুছলেন। তার পর হান্ট্‌লি পামারের টিনের কৌটো থেকে তিন চারখানি করে বিস্কুট আমার হাতে ও সুশীলের হাতে দিলেন, পরে পেয়ারার জেলি খেতে দিলেন। যতদিন শান্তিনিকেতনে ছিলাম, ততদিন সপ্তাহে একবার কি দু'বার করে আমার এই পাতানো মায়ের কাছে গিয়ে তাঁর প্রাণভরা আদরাপ্যায়ন কুড়িয়ে নিয়ে এসেছি। সুশীলকে তিনি দুষ্টু বলে মাঝে মাঝে তিরস্কার করলেও আমাকে লক্ষ্মী বলেই সম্ভাষণ করতেন।

আমার প্রথম অসুবিধার মেঘ অনেকটা কেটে গেল এইভাবে। দ্বিতীয় অসুবিধার কথা এই বলি। আমি আশৈশব রুগ্ন ছিলাম বলে দিদিমা আমায় খুব ভোরে কখনো উঠতে দিতেন না। শীতকালে সূর্যদেব দিক্‌চক্রবাল অতিক্রম না করলে—উঠানে রোদ্দুর এসে ছড়িয়ে না পড়লে, তিনি আমাকে কোনোমতে ঘরের বার হতে দিতেন না। পিত্রালয়ে এসেও গ্রীষ্মকালে ছ'টা ও শীতকালে সাতটা নাগাদ

উঠলে অভিভাবকরা বড়ো একটা বেত্রদণ্ড আস্ফালন করতেন না। কিন্তু ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভোর ৪-৪৫ মিনিটের সময় মিনিট দু'তিন ধরে পেটাঘড়িতে হাতুড়ির ঘা পড়তে থাকে। তার আওয়াজ শুনলে স্বয়ং কুম্ভকর্ণের কর্ণপটহ বিদীর্ণ হবার উপক্রম করে এবং তিনিও নিদ্রা বিসর্জন দিয়ে সক্রোধে হুঙ্কার ছাড়েন। শীতকালে অবশ্য শয্যাত্যাগের সময় পৌনে এক ঘণ্টা পেছিয়ে দেওয়া হত। প্রথম মাসখানেক এতে আমি রীতিমত বিরক্তি বোধ করতুম। তারপর আস্তে আস্তে এই কঠোর বিধি বরদাস্ত হয়ে গেল।

গ্রীষ্মকালে যখনই শয়নভঙ্গ করতুম, তখনই বাইরে তারকাবিকীর্ণ অন্ধকার আকাশ দেখেছি—পূর্ব দিগন্তে উষার আভাসমাত্র দেখতে পেতুম না। সেই অন্ধকারের মধ্যেই আমাদের জলপাত্র হাতে করে আশ্রম সীমান্তের বাইরে একটা ফলফসলহীন উষর উচ্চাবচ মাঠে ছুটতে হত। সেটা ছিল আশ্রমের পশ্চিম দিকে। এরই উত্তর একাংশে এখন উত্তরায়ণ অবস্থিত। সে মাঠের অনেকখানি এখন আশ্রম-এলাকার অন্তভুক্ত, সেখানে এখন অনেক বাড়ি উঠেছে। বর্তমান মেয়েদের হোস্টেল, মীরাদি-র বাড়ি, 'প্রাক্তনী' প্রভৃতি তখনকার সেই অশোচ কলঙ্কব্রণগুলিকে মুছে দিয়েছে, তাদের স্মৃতির সম্ভাবনীয়তাকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে দিয়েছে।

ঐ সময় আশ্রমের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে চারটি মাত্র মধ্যযুগীয় মেথর-খাটা খুপরি ছিল। অসুস্থ ও নিতান্ত অল্প-বয়স্ক ছাত্ররা ছাড়া অন্য কেউ এদের ভিতর প্রবেশাধিকার পেত না। তখন প্রাতঃকালে প্রাকৃতিক বেগরর্জনের আশ্রমিক পরিভাষাই ছিল 'মাঠে যাওয়া'। মাঠে যাওয়া ও দাঁত-মাজা মুখ-ধোওয়ার জন্যে আধ ঘণ্টার বেশি সময় দেওয়া হত না। এরপর আর একপ্রস্থ ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রশস্ত মাঠে হাজির হতে হত ব্যায়াম-চর্চা ও ড্রিলের নিমিত্ত। ঐ সময় কিছুদিন আমাদের ঘরের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন সেনহাটিনিবাসী হীরালাল সেন মহাশয়। 'হুঙ্কার' নামে একখানা জাতীয়তাভাবোদ্দীপক বই লিখে তিনি তদানীন্তন ইংরাজ শাসকদের

বিষ-নজরে পড়েছিলেন। এই বই লেখার জন্যে তিনি বোধ হয় বছর দেড়েক কি দুই সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন।

হীরালালবাবু কারামুক্তির কিছুদিন পরেই শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন। প্রধানতঃ তিনি আমাদের ব্যায়াম ও ড্রিল শিক্ষা দিতেন এবং নীচের ক্লাসগুলিতে বাংলা, ইতিহাস প্রভৃতি পড়াতেন। রীতিমত সামরিম কায়দায় তিনি আমাদের ড্রিল করাতে শেখাতেন। তাছাড়া লাঠি, ছোরা, ঢাল-তরোয়াল খেলা, গুলতি ছোড়া প্রভৃতির তিনি শিক্ষা দিতেন। সেনমহাশয় উৎকট রকমের ইংরেজবিদ্বেষী ছিলেন, তা তাঁর ভাবে-ভঙ্গিতে কথাবার্তায় মাঝে মাঝে প্রকাশ পেত। অথচ তিনি লাইব্রেরী থেকে প্রায়ই নানারকম ইংরিজি বই এনে নিবিষ্টচিত্তে পড়তেন। তাঁর শয্যার ওপর গীতা, চণ্ডী ও স্বামী বিবেকানন্দের লেখা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'কর্মযোগ,' 'জ্ঞানযোগ' প্রভৃতি বই ছড়ানো রয়েছে দেখতে পেতুম।

ভদ্রলোকের চেহারাখানি একান্ন বছর পরেও স্পষ্ট মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। উচ্চতায় ছ'ফুট নিশ্চয়ই হবেন। রং অনেকটা পুরানো তামার মতো, কালো বলতে বাধো-বাধো ঠেকে। তাতে তেজ-সাহস-তীক্ষ্ণবুদ্ধির জৌলুস মাখানো ছিল। মহাভারতে ভীমের বর্ণনা পড়েছি, কিন্তু সেই বর্ণনার জীবন্ত প্রতিরূপ চর্মচক্ষে দেখার সুযোগ বোধ হয় হীরালালবাবু করে দিয়েছিলেন। তাঁর বাহু সম্মুখের সংকুচিত দ্বিশিরস্কা পেশীপিণ্ড লৌহ গোলকের মতো শক্ত ছিল; আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ বলবান ছাত্ররা তাতে সজোরে আঙুলের টিপ দিয়ে এক ফোঁটা টোল খাওয়াতে পারত না। তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, স্কন্ধে তাঁর শুভ্রোজ্জ্বল যজ্ঞোপবীত ছিল; নিষ্ঠার সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে দু'বেলা সন্ধ্যাহ্নিক করতে দেখতুম। গলার স্বর ছিল উদাত্ত গম্ভীর—অদূরাগত জলদমন্দ্রের মতো। তিনি দু'চারখানা স্বদেশী গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন আমাদের। শুনে সেই বয়সেই আমাদের প্রাণ নেচে উঠেছিল, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল।

হীরালালবাবু কয়েকমাস পরেই আশ্রম ছাড়তে বাধ্য হলেন।

তিনি ওখানে যোগ দেওয়ার পর থেকেই শুনেছি মাঝে মাঝে টিকটিকিরা এসে তাঁর খোঁজ খবর করত, তাঁর কার্যকলাপের ওপর আড়াল থেকে নজর রাখত। উনি যুগান্তর পার্টির গোপন সন্ত্রাসমন্ত্রে দীক্ষিত হিংসাবাদী কর্মী, বৃটিশ রাজ-সরকারের কোপভাজন ব্যক্তি এবং শান্তিনিকেতনের শান্তিময় পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার একান্ত অনুপযুক্ত এই কথা কবিগুরুকে বারবার শুনিয়ে তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলছিল ওরা। একদিন সকালে উঠে দেখি হীরালালবাবু তাঁর বাক্স বিছানা নিয়ে অন্তর্হিত হয়েছেন।

যাক্, ব্যায়ামচর্চার সময় আমরা প্রভাতের প্রথম পদধ্বনি শুনতে পেতুম, পূর্বাচলে তার রক্তিমাভ আগমনী-চিহ্ন দেখতে পেতুম। এর পর ছিল স্নানের পালা। সেইটে ছিল আমার তৃতীয় অসুবিধা, বিশেষভাবে হেমন্ত ও শীত ঋতুতে। আশ্রমের একটিমাত্র ইঁদারা থেকে বড়ো ছেলেরা টিনের ক্যানেস্তারা করে জল তুলে এক এক ক্যানেস্তারা ভর্তি হিমশীতল জল হাঁটু ছুম্‌ড়ে বসা বেপথুমান ছোটদের শিরে ঢেলে দিত। সত্যি, সেটা ছিল শীতল সলিল-সংকুল একটা প্রাত্যহিক অগ্নিপরীক্ষা। নিরুপায় হয়ে সেটাও সয়ে নিতে হল।

স্নানের পর আর একবার ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কম্বলের আসন নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হত মাঠে বাগানে বিজন উপাসনা করতে। অনেক সময় আমরা চার হাত পাঁচ হাত অন্তর বসে চোখ বুজে থাকতুম। কেউ কেউ চোখ মেলে চুপচাপ বসে থাকত, কেউ কেউ বিড় বিড় করে হয়তো কোনো কিছু কবিতা বা শ্লোক আওড়াতো, কেউ কেউ খড়কুটো ধুলো নিয়ে খেলা করত; যাদের পৈতে হয়ে গিয়েছিল তারা গায়ত্রী জপ করত।

কখনো কখনো কোনো দুষ্টু ছেলে অদূরবর্তী কোনো সমবয়সী বা বয়ঃকনিষ্ঠ ছেলের গায়ে একটি ছোট্ট মাটির ড্যালা ছুঁড়ে মেরে পরম ভক্তিভরে সজোরে চোখের পাতা বন্ধ করে ফেলত। রূপে বা অরূপে আমি কোনো দেবতা বা ঈশ্বরের উপাসনা যতবারই করতে গিয়েছি ততবারই দিদি, মেজদিদি, দিদিমা, বহুদিন পরলোকপ্রাপ্ত

বুড়ো দাদার চেহারাখানা নিমীলিত চোখের পর্দায় আপনা আপনি ভেসে উঠতে দেখেছি। এইভাবে সেই বয়সে 'প্রিয়রে দেবতা' জ্ঞান করতে শিখেছিলুম।

উপাসনা বোধ হয় মিনিট দশেক চলার প্রথা ছিল। তার পর আশ্রমের সমস্ত শিক্ষক ও ছাত্র শালবীথির দক্ষিণের মাঠে একত্র ও পূর্বাস্য হয়ে সমবেত প্রার্থনা করতেন। এক বৈদিক মন্ত্র ছিল এই প্রার্থনার উপজীব্য —'ওঁ পিতা নোহসি পিতা নো বোধি নমস্তে স্তু। মা মা হিংসী। বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব'...ইত্যাদি।

সমবেত প্রার্থনা সমাপনান্তে আমরা সবাই হুড়োহুড়ি করে রান্নাবাড়ির হাতায় গিয়ে হাজির হতুম। জলখাবারের লোভনীয় উদ্দেশ্যতাড়িত হয়ে। কোনোদিন মোহনভোগ, কোনোদিন রুটি আলু-চচ্চড়ি, কোনোদিন বোঁদে, কোনোদিন গজা, কোনোদিন মিহিদানা। আশ্রমে চায়ের পর্ব তখন ভবিষ্যতের গর্ভে নিহত ছিল। বেশ মনে আছে চৌদ্দ বছর বয়সের সময় প্রবল সর্দিতে দু'দিন আদামিশ্রিত চা পান করেছিলুম—জীবনে সেই প্রথম।

জলখাবারের ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী ছুটত তার বই খাতা পেন্সিল আর কম্বলাসন নিয়ে নির্দিষ্ট গাছতলাটিতে ক্লাস করার জন্যে। তখন নিয়ম ছিল যে ছেলে বা মেয়ে যে বিষয়ে যে ক্লাসের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হত, সেই বিষয়ে সেই ক্লাসে পড়বে। আমি গিয়ে ফিফত ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলুম। কিন্তু অঙ্কে বেজায় কাঁচা বলে আমাকে দিন কয়েক পরে সিক্স্‌থ্‌ ক্লাসে নামিয়ে দেওয়া হল। মাসখানেক পরে একটা পরীক্ষার ফল দেখে আমাকে ইংরেজি বিষয়টি ফোর্থ ক্লাসে পড়বার অনুজ্ঞা দেওয়া হল। এইভাবে মেধানুযায়ী ক্লাসের ইতরবিশেষ করার বিধি কিছুকাল পরে তুলে দেওয়া হয়।

ঋতু অনুযায়ী সকালের দিকে তিন ঘণ্টা থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা ক্লাস চলত। তার পর ছুটি হয়ে গেলে আমরা কলরব করতে করতে

নিজের নিজের ঘরে ও সীটে ফিরতুম। খাতা বই গুছিয়ে রাখতে না রাখতেই মাধ্যাহ্নিক ভোজনের ঘণ্টা পড়ত। ঋতু হিসেবে এই ঘণ্টা বাজার তারতম্য ঘটত। মোট কথা এগারটা থেকে বারোটার মধ্যে আমাদের আহার সমাধা হত।

এইখানেই চতুর্থ অসুবিধার প্রসঙ্গ আসছে। খাওয়াটা ছিল নিছক ও নিতান্ত নিরামিষ রকমের। মাছ-মাংস-ডিমের প্রবেশ নিষেধ ছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। মাছের বিরহে বেশ কিছুদিন গোপনে ছটফট করেছি। নিরামিষ আহারের পদগুলি সংখ্যায় অতি সংক্ষিপ্ত, অত্যন্ত মামুলি ধরনের এবং তাতে বৈচিত্র্য সাধনের উদারতা কদাচিৎ পরিলক্ষিত হত। ঋতুজাত একাধিক তরকারির একটা ঘণ্ট বা চচ্চড়ি, অড়হর, কাঁচামুগ বা মুসুরির ডাল ও আলু বা আলু পটোলের ফটিক-ঝোল ; ক্বচিৎ ভাজা, ক্বচিৎ অম্বল বা চাটনি। রাত্রিতে ছটাক তিনেক করে দুধ প্রত্যেকের বরাদ্দ ছিল, কিন্তু অম্বল থাকত না। দুধ আমার প্রিয় খাদ্য ছিল বটে, কিন্তু তবু নিরামিষ রুচিনিষ্ঠ হতে আমাকে বহুদিন ধরে মনের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ করতে হয়েছে। ছ'মাসের মধ্যেও আমিষের প্রলোভন জয় করতে পারিনি এবং তার প্রলোভনে পড়ে কি দুষ্ক্রিয়া করেছিলুম তা পরে বলছি।

দুপুর বেলা আমাদের কারুর ঘুমোবার জো ছিল না, নিয়মও ছিল না। এই সময় প্রত্যেককে পড়া মুখস্থ করতে ও লেখার কাজ করতে হত। শীতকালে বিছানাপত্র রোদ্দুরে দিতে হত, স্নানের পর মেলে দেওয়া কাপড় তুলে কুঁচিয়ে ও গুছিয়ে রাখতে হত। প্রত্যেক ঘরে প্রতি মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে ছাত্রদের ভিতর থেকে ভোটের দ্বারা একজন মনিটর নিযুক্ত হতো। তার নির্দেশে একজনকে এক এক বেলা ঘরদ্বারবারান্দা ঝাঁট দিতে ও কুঁজোয় জল ভরে রাখতে হত।

প্রায় প্রতি ঘরের সামনে পিছনে সুবিধামত খালি জায়গায় ছেলেরা ফুলের সব্জীর চাষ করত। মূলো কপি শিম বরবটি বেগুন প্রভৃতি

আমরা ছোটো ছোটো জমিখণ্ডে ফলাতুম। তা ছাড়া নানারকম দেশি বিদেশী ফুলের কারকিৎও করতুম। কবিগুরু মাঝে মাঝে এইসব শিশুবাগিচায় বেড়িয়ে আমোদ পেতেন এবং সক্রিয় উৎসাহী ছাত্রদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতেন।

আশ্রমে আর একটা কঠোর নিয়ম ছিল কেউ কোনো রকমের জুতো ব্যবহার করতে পারবে না। আমরা সবাই বাড়ি-থেকে-পরে-আসা জুতো জোড়া কাগজে জড়িয়ে রেখে দিতুম, দীর্ঘ অবকাশ প্রাক্কালে বাড়ি ফেরবার সময় আশ্রম এলাকার বাইরে গিয়ে পায়ের লাল রেলে মাটি ঝেড়েঝুড়ে পুনরায় জুতো পরতুম। খালি পায়ে শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে কাঁকুরে মাটির ওপর দিয়ে চলাফেরা বা দৌড়োদৌড়ি করা রীতিমত কষ্টসাধ্য ছিল। শিক্ষকদের কেউ কেউ ক্যাম্বিসের জুতো, কেউ কেউ খড়ম ব্যবহার করতেন; দু'একজনকে বোধহয় মখমলের চটিও পরতে দেখেছি। কবিগুরু জরির পাড় দেওয়া সাদা রংয়ের শুঁড়তোলা চটি পরতেন মনে পড়ে; তা কিড লেদারের ছিল কিনা জানি না।

একবার মুর্শিদাবাদ কিংবা বীরভূমের এক জমিদারেরর ছেলে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বাস করতে এল—একজন গৃহশিক্ষক, একজন গৃহভৃত্য, চারটি বড়ো বড়ো ষ্টীলট্রাঙ্ক, একটি ফল ও খাবার-ঠাসা বেতের বাক্স, একটি হরিণের চামড়ামোড়া হাতলওয়ালা চেয়ার এবং প্রকাণ্ড এক শয্যাশৈল পরিবৃত হয়ে। আমার চেয়ে বয়সে সে বছর দুয়েকের বড়ো হবে। বেশ নাদুস-নুদুস পোলাও-কালিয়া ঘি-দুধ-খাওয়া চেহারা, এবং রঙ সিঁদুরে মেঘের মতো, দাঁতগুলো দাড়িম বীজের মতো, কিন্তু চোখ দুটি ঈষৎ কটা ও ছোটো, চুলগুলিও গাঢ় রকমের কটা ছিল।

একটা ছোটো কোঠাঘরে গুটি পাঁচ-সাত ছেলের মধ্যে তার সিট নির্দিষ্ট হল। অন্য কারো সঙ্গে সে থাকতে নারাজ, তার পৃথক ঘর চাই বলে বায়না শুরু করল। কিন্তু বায়না মেটার আশা নেই দেখে, সে খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। তারপর যখন সেই ঘরের তত্ত্বাবধায়ক

মাস্টারমশাই তাকে জুতো ছাড়তে ও মাথায় সযত্নে কাটা অ্যালবার্ট টেড়ি ভেঙে ফেলতে বললেন, তখন সে প্রথমটা খাপ্পা হয়ে মাস্টার-মশাইকে দু'চারটে শক্ত কথা শোনাল। তারপর সঙ্গে আগত গৃহশিক্ষক মহাশয় তাকে মৃদু ধমক দেওয়ায় সে চুপ করে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি এখানে খালি পায়ে রুক্ষু মাথায় নিরামিষ খেয়ে একদিনও থাকতে পারব না। এ ব্রহ্মচর্যাশ্রম, না কয়েদখানা? বাবা কি আমায় মুনি ঋষি করবার ষড়যন্ত্র করছে?'

আমি তখন পাশের একটা ঘরে থাকি। পরদিনই তার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। প্রায় সব বিষয়েই সে আমার ক্লাসে ভর্তি হল। ক্লাস ভাঙার পর সে আমাকে বললে, 'তোমরা এত কষ্ট সয়ে কি করে থাক ভাই। আমি ভাই আজই ঠাক্‌মাকে বেশ কড়া করে একটা চিঠি লিখছি। তারপর রোজ একখানা টেলিগ্রাম ছাড়ব বাবাকে। রোসো, একবার ফিরে যাই দেশে, তারপর বাবারই একদিন কি আমারই একদিন।'...ছেলেটি কোনোমতে চোখ-কান বুজে বোধ হয় দিন আষ্টেক আশ্রমে ছিল। তারপর জমিদারির ম্যানেজার এসে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। সে যে ক'দিন ছিল, সেই ক'দিন আমার পাঁচ-ছ'টি সহানুভূতিশীল বন্ধুকে সমস্ত পাত্রগুলি খালি করে বিস্কুট, লজেঞ্জুস, মার্মালেড, জেলি, মোটা আমসত্ত, গোলাপী ও আনারসের সরবৎ প্রভৃতি আশ মিটিয়ে খাইয়েছিল। তাছাড়া সে তিন শিশি এসেন্স, এক শিশি গন্ধ তেল ও এক শিশি লোশন সঙ্গে এনেছিল, তার প্রায় সমস্তটাই আমাদের গায়ে কাপড় জামায় ও মাথায় ছিটিয়ে দিয়েছিল। ছেলেটি চলে যাবার পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত তার বিতরিত গন্ধসারের সুবাস তার ঘরের বাতাসে ও আমাদের পরিচ্ছদে অনুলিপ্ত ছিল। জীবনে তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

ঋতুবিশেষে আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে আবার আমাদের বৈকালিক ক্লাস শুরু হত। ঘণ্টা দুই ক্লাস চলার পর ছুটি হয়ে যেত। জলখাবার খেয়ে আমরা খেলতে মাঠে ছুটতুম। ফুটবল, ক্রিকেট, হা-ডু-ডু, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি উন্মুক্ত ক্ষেত্রের খেলা। কবিগুরু এক-

একদিন এসে আমাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতেন ; ছোটো ছোটো ছেলেদের দৌড়ের বাজিতে আহ্বান করতেন।

সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে খেলা ভঙ্গ করে সকলে যে-যার সীটে বসে আর একবারের জন্যে অল্পক্ষণ ধরে উপাসনা করত, তারপর শিক্ষকদের ঘিরে গল্প-গাছা ও গানের আসর বসত। ফার্স্ট ক্লাস ও সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া আর কাউকে রাত্রিকালে পড়তে দেওয়া হত না। শিক্ষকমশাইরা বড়ো বড়ো হলঘরের মাঝখানে বসে ছোটো ছেলেদের নানা দেশের প্রবাদ-ছড়া-রূপকথা-ভ্রমণকাহিনী শোনাতেন ; মধ্যবয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের স্বদেশী বিদেশী নানা বিখ্যাত গল্প ও উপন্যাসের সার সংগ্রহ করে মনোরম ভাষায় কথকতার মতো বর্ণনা করে যেতেন।

প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান-শিক্ষক জগদানন্দ রায় মশাই বোধ হয় পনেরো ষোলোদিন ধরে Ivanhoe উপন্যাসের আখ্যানভাগ সরস রূপকথার মতো করে কিস্তিতে কিস্তিতে আমাদের শুনিয়েছিলেন। তারপর তিনি প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীদের জীবনকাহিনী, গ্রহনক্ষত্র-পৃথিবীর জন্মকথা সরস আর কৌতূহলোদ্দীপক ভাষায় বিবৃত করতেন।

যতদূর মনে পড়ে, তিনিই ধারাবাহিকভাবে David Copperfield, Oliver Twist, Rob Roy, Kenilworth, Vicar of Wakefield প্রভৃতি খ্যাতনামা গ্রন্থকারদের উপন্যাসগুলি গল্প করে আমাদের অবকাশ-বিনোদন করেছিলেন। কোন্ মাস্টারমশাই মনে নেই—Pilgrim's Progress-এর গল্প ঐভাবে কিস্তিবন্দী হারে শুনিয়েছিলেন। জ্ঞানবাবু ও বঙ্কিমবাবু টডের রাজস্থান থেকে ও কার্লাইলের History of the French Revolution থেকে গল্প বলে শুধু আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন নি, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

রাত্রি আটটার সময় ছ'বছর বয়স থেকে দশ বছর বয়সের ছেলেরা খেয়ে নিত ; তারপর আমাদের ডাক পড়ত সাড়ে আটটা নাগাদ। ন'টার মধ্যে শিক্ষক-ছাত্র সকলের খাওয়া খতম হয়ে যেত। সাড়ে

ন'টার মধ্যে উপরের দুটি ক্লাসের ছেলেরা ছাড়া বাকি সকলকে শয্যাগ্রহণ করতে হত।...এই ছিল আমাদের নিত্যকৃত্যের নির্ঘণ্ট।

সাধারণত আমাদের ইংরিজি বিষয়ের ক্লাস নিতেন জ্ঞানবাবু। আমার ওখানে যোগ দেবার পাঁচ-ছ'দিন পরে জ্ঞানবাবু কলকাতায় চোখের অসুখের চিকিৎসা করাতে চলে যাওয়ায় বিশ্বকবি নিজে এলেন আমাদের ইংরিজি পড়াতে। তখন আমাদের পাঠ্য ছিল ম্যাকমিলান কোম্পানির সায়েন্স রীডারের একটি খণ্ড, যেখানিকে আজ পর্যন্ত আমি সংরক্ষণ করে এসেছি। চিড়িয়াখানায় সিংহ দেখার একটি গল্প তিনি পড়ালেন। পড়ানো আর গল্প শোনানোর মধ্যে যে কোন পার্থক্য নেই তা সেদিন চমৎকার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। প্রত্যেক শব্দের যে একটি রূপ বা মূর্তি আছে, তার ধ্বনির পেছন থেকে যে একটি অর্থ বাহু বিস্তার করে প্রকাশের পথে আপনি বেরিয়ে আসে, তা তিনি প্রথম জানতে দিলেন সেদিন।

তারপর বোধ হয় ক্লাসে পনেরো-ষোলোবার তাঁর কাছে ইংরিজি পড়বার সুযোগ হয়েছে আমার। অর্থ ও ভাব অনুযায়ী বিভিন্ন স্বরগ্রামে সুস্পষ্ট উচ্চারণ করার শৈলীটি তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর এলোকিউশন ও অভিনয়ের অনন্যসাধারণ পারগামিতা দেখে আমরা সেই অপরিণত বয়সেই বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি; আজ স্মৃতিপটে তার প্রতিফলন দেখে শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে পড়ি। Indefatigable শব্দটি প্রসঙ্গক্রমে তিনিই শিখিয়েছিলেন, তা আজও মনে রেখেছি।

ঐ সময় আমাদের সংস্কৃত-শিক্ষক ছিলেন হরিচরণবাবু। তখন থেকেই তিনি কবিগুরুর উৎসাহ ও আশীর্বাদে অনুপ্রাণিত হয়ে শব্দকোষ প্রনয়ণের ভিত্তি নির্মাণ শুরু করেছিলেন। বাংলা পড়াতেন প্রভাতবাবু ও কালীমোহনবাবু। ইতিহাস শরৎবাবু। ভূগোল বঙ্কিমবাবু ও নেপালবাবু। শিক্ষকের অনুপস্থিতে গুরুদেব এক একদিন আমাদের সংস্কৃত ও বাংলা ক্লাস নিতেন। তাঁর কিন্নরনিন্দিত সুমিষ্ট গলায় সংস্কৃত শ্লোকগুলি যখন উচ্চারিত হত,

তখন মনে হত তারা প্রাণস্ফুলিঙ্গ পেয়ে যেন আনন্দে নৃত্য করছে। তাঁর কাছে আমরা কথা ও কাহিনীর কোনো কোনো কবিতার পাঠ নিয়েছি। তিনি 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' ও 'নরকবাসের' কতকাংশ পড়িয়েছেন। বোধ হয় 'গান্ধারীর আবেদন' সমস্তটাই আমাদের টীকা-টিপ্পনী দিয়ে পাঁচ-ছ'দিন ধরে পড়িয়ে বুঝিয়েছিলেন। আম্রকুঞ্জে তিনি ক্লাস নিতেন। শেষোক্ত কাব্যনাটিকাটি আমরা কাপড় টানিয়ে অভিনয় করেছিলুম। কবিগুরু নিজে তুপুরবেলা ক'দিন ধরে আমাদের ক'জন অভিনেতাকে আবৃত্তি ও অভিনয়ের অঙ্গভঙ্গি শিক্ষা দিয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ছে প্রবোধ বলে একটি ছেলে ধৃতরাষ্ট্র, প্রদ্যোৎ (সেনগুপ্ত) গান্ধারী ও আমি তুর্যোধনের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলুম।

কবি তখন 'দেহলী' নামক পুরনো দোতলা গৃহের উপরের তলায় বাস করতেন। 'উদয়ন-উদীচী-শ্যামলী-পুনশ্চ'রা তখন রাজমিস্ত্রীদের কর্ণিকের স্পর্শ থেকে বহুদূরে কল্পলোকেরও উর্ধ্বে ছিল। হাস্যকৌতুক ও 'ব্যঙ্গকৌতুক' থেকেও আমরা তুখানি নাটিকা অভিনয় করেছিলুম। প্রত্যেকটাতেই আমি একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলুম। রোজ তুলুরবেলা একটা-দেড়টার সময় কবিগুরুর ফরাসপাতা বড়ো ঘরখানাতে আমরা সসংকোচে গিয়ে হাজির হতুম এবং মহলা দেবার সময় তাঁর সুখশ্রাব্য বকুনি খাবার জন্যে প্রস্তুত থাকতুম।

তুপুরবেলা কখনো তাঁকে নিদ্রাগত হতে দেখিনি; আজীবন তিনি সংযতনিদ্র ছিলেন। রাত্রিতে তিনি শুতেন বারোটার সময় এবং শয্যাত্যাগ করতেন চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে। সারাদিন তিনি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সহস্র কাজের মধ্যে নিজেকে নিযুক্ত রাখতেন। জগতের শ্রুতকীর্তি শ্রেষ্ঠ পত্রলেখকদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। শুনেছি নেপোলিয়ন তাঁর স্বল্লায়ু ক্ষমতাকালের মধ্যে ছোটো বড়ো প্রায় চল্লিশ হাজার চিঠি, সন্ধিপত্র ও দলিলদস্তাবেজ কর্মচারীদের দ্বারা লিখিয়ে নিজে সংশোধন ও সই করে গেছেন। আমার ধারণা, কবির আকৈশোর স্বহস্তলিখিত পত্রসংখ্যা চল্লিশ হাজারের কম হবে

না। দুপুরবেলার বেশির ভাগ সময়ই তিনি পত্র লেখায় ব্যয় করতেন। নতুবা পড়াশুনায় ডুবে থাকতেন। কোনো কোনদিন তাঁকে নিজের হাতে কাপড় কোঁচাতে ও জামা পাট করে নিপুণ হস্তে ইস্ত্রি করতে দেখেছি। চাকরবাকরদের অনেক কাজই তাঁর মনোমতো হত না বলে তিনি সেগুলো নিজে করে তৃপ্তিবোধ করতেন।

আশ্রমে আসার তিন-চারদিন বাদে একটা ছুটির দিন সকাল ন'টা নাগাদ অজিতবাবু আমায় সঙ্গে করে কবির কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। কবি তখন দেহলীর দক্ষিণের গাড়িবারান্দার ওপর একখানা ইজিচেয়ারে প্রায় পূর্বাস্য হয়ে বসে আছেন। সামনে একটা ছোটো টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে গান কিংবা কবিতা লিখছেন। শিরীষ ও আমলকি গাছের পত্রচ্ছদের ছাঁকনি দিয়ে হিমেল প্রভাতের অংশুল আভা বেরিয়ে এসে তাঁর মুখখানিকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছে তখন, কিন্তু পরিশ্রুত সূর্যালোকে তাঁর আগাগোড়াই রুপোলী দেখাচ্ছিল; সমস্ত মুখমণ্ডলে যেন একটা অস্পষ্ট ভঙ্গিল পেলব দ্যুতির বাহ্যরেখা জড়ানো রয়েছে দেখলুম।

অজিতবাবু কবির দৃষ্টিপথে পড়ামাত্র আমাকে সামনে এগিয়ে দিলেন—কবির দিকে। আমি সলজ্জ শঙ্কায় প্রণাম করে একটু পেছিয়ে দাঁড়াতেই অজিতবাবু বললেন: 'এই ছেলেটির কথাই শশধরবাবু আপনাকে লিখেছিলেন।'

আমার বাবা-মায়ের গুরুভাই কলকাতার প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশক এস্. সি, বোসের ছেলে—ক'দিন আগে আশ্রমে এসেছে। কবি বললেন: 'হ্যাঁ, মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য-শিষ্যা ওঁরা, তা জানি। শশধরবাবু এর কথা লিখেছিলেন বটে।'

সোনার ফ্রেমে আঁটা পাঁস্‌নে জোড়া নাকে লাগিয়ে আমার দিকে অতুল স্নেহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন; তারপর শুধালেন: 'কত বছর বয়সে মা হারিয়েছে?' উত্তর শুনে বললেন: 'বিমাতা আছেন বুঝি? ওহে অজিত, তোমার মাকে বোলো মাঝে মাঝে এই ছেলেটির একটু খোঁজ-খবর নিতে।'

স্বপ্নসুষমামাখা আয়ত চোখ দুটি তাঁর অশ্রুজলে ছল ছল করে উঠল। অল্প বয়সে মা হারানোর ব্যথা তিনি মর্মে মর্মে জানতেন; তাঁর ছেলে-মেয়েরাও কিছু জানত।

একটু-আধটু গান গাইতে পারি শুনে বললেন: 'সন্ধের পর আমি কিংবা দিনু যখন ছেলে-মেয়েদের গান শেখাই তখন মাঝে মাঝে গল্পের আসর ছেড়ে এসে দু-একখানা করে গান তুলে নিও গলায়।'...সংগীতভবন কলাভবন প্রভৃতির সৃষ্টি হয়নি তখনো। হারমোনিয়ম্‌, সেতার প্রভৃতির সঙ্গে বিভিন্ন রাগরাগিণীর অনুক্রমে সা-রে-গা-ম্‌ সেধে গলা তৈরি করার ঐতিহ্যগত প্রথা ছাত্র-ছাত্রীরা মেনে চলত না তখন। তবে মেয়েদের হোস্টেলে দু'তিনজন ছাত্রী সেতার ও এস্রাজ নিয়ে কসরৎ করত শুনেছি।

নৃত্য আমরা সাঁওতাল ও বাউরিদের কিংবা পৌষমেলায় কবি ঝুমুর দলের আসরে অসম্পৃক্ত কৌতূহলে দর্শন করেছি; কিন্তু আশ্রম বালক-বালিকাদের পায়ে কখনো সে তার ছন্দ হিল্লোল জাগায় নি। জাগিয়েছিল প্রায় দশ বছর পরে বিশ্বভারতীর ক্ষুধিত অন্তর্দেবতা। পাঠ-ভবনের প্রশস্ত প্রোজ্জ্বল সৌধগরিমা ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের কণ্ঠরোধ করেছে তখন।

স্বভাবগতভাবে যাদের সুরজ্ঞান, মিষ্টস্বর, মোটামুটি তাল ও মাত্রাজ্ঞান ছিল, তাদেরই কবিগুরু ও তাঁর সুরধর পৌত্র তাঁদের মামুলি অর্গ্যানের চারপাশে টেনে এনে, ঐকালে লেখা প্রায় সমস্ত গানই টাটকা-টাটকা গলায় বসিয়ে দিতেন। একমাত্র ক্লাসে ও খাওয়ার সময় ছাড়া আর কোথাও গুঞ্জন করে বা গলা ছেড়ে আপন মনে বা পাঁচজনে মিলে গান গাওয়ার কোনো মানা ছিল না, বাধা ছিল না। আমরা তখন অনেকেই সুরের সুরধনীতে শিশু সুলভ চপল উল্লাসে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তীরের ধার ঘেঁষে সাঁতার খেলেছি। অনেকেই আমরা গানের ওস্তাদ হইনি বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে সুরজ্ঞ ও সুররসিক হয়েছি, গান দিয়ে নিজের বিচ্ছেদ-বঞ্চনা-ব্যর্থতা-বেদনার তীক্ষ্ণতাকে খর্ব

করতে পেরেছি—ভুবনের গায়ে হাত বুলিয়ে সুখে বেড়াতে পেরেছি।

আমার অবস্থানের সময় গীতাঞ্জলির শ্রেষ্ঠ গানগুলি কবি লিখছেন ও তাতে সুর সংযোজন করছেন। শান্তিনিকেতনে বসে যে গানগুলি তিনি লিখতেন, সেগুলি সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম দিনুবাবুকে ও তারপর একদল বাছা (দশ বারো জনের বেশি নয়) ছাত্র-ছাত্রীর গলায় তুলে দিতেন। দিনুবাবু কবির প্রত্যেক গানের নোটেশন রাখতেন। মাঝে মাঝে কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ও ভাগিনেয়ী সরলা দেবী চৌধুরাণী বেড়াতে এসে কবির নিকট থেকে নয় দিনুবাবুর নিকট থেকে মধ্যবর্তী সময়ে লেখা কবির অধিকাংশ গানের সুর তুলে নিয়ে যেতেন। কবি ও দিনুবাবুর কাছ থেকে শেখা অন্ততঃ খান ষাটেক গানের মধ্য থেকে যেগুলোর সুর আজো মোটামুটি মনে রেখেছি এবং সভায়-মজলিসে-তারে-বেতারে যাদের নির্যাতনজনিত আর্তনাদ প্রায়ই শুনতে পাই, সেগুলো থেকে কয়েকটি উল্লেখ এখানে বোধ হয় অশোভন হবে না। যেমন—'জগৎ জুড়ে উদার সুরে', 'তুমি কেমন করে গান কর', 'যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু', 'এসো হে সজল ঘন','পারবি না কি যোগ দিতে,' 'শরতে আজ কোন্ অতিথি', 'গায়ে আমার পুলক লাগে', 'আসনতলের মাটির পরে', 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে', 'বিশ্ব যখন নিদ্রামগন', 'আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে', 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি', 'ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা', 'এই করেছো ভালো নিঠুর', 'যাবার দিনে এই কথাটি', 'জীবনে যত পূজা হল না সারা'…ইত্যাদি।

কবির প্রৌঢ় বয়সের অভিনয় দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। একবার প্রায়শ্চিত্তে ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায়, আর একবার কিসে কোন্ ভূমিকায় মনে করতে পারছি না। গেরুয়া আলখাল্লা-পরা মাথায় পাগড়ি-জড়ানো শালশিশুর মতো তাঁর সুদীর্ঘ দেহ এখনো স্পষ্ট চোখের সামনে ভেসে ওঠে। 'ওরে আগুন আমার ভাই আমি তোমারি জয় গাই', 'বল ভাই ধন্য হরি',

'আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়'—এই তিনখানা গানে কবি মনোহরণ ভাবচঞ্চল তাণ্ডব দেখিয়ে দর্শক-প্রাণে পুলক শিহরণ জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর অপ্সরলাঞ্ছিত কণ্ঠে 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' এখনো হৃৎকন্দরে প্রতিধ্বনি তোলে। কোথাও রাঙা মাটির পথ দেখলে তার দূরতম প্রান্তসীমায় ধনঞ্জয়রূপী কবিগুরুর ছায়ামূর্তি যেন দেখতে পাই। প্রায়শ্চিত্তে জামাতা রামচন্দ্রের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন জগদানন্দবাবু ও বিভার চরিত্রে অবতরণ করেছিলেন শিক্ষক শ্রীযতীন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

আমি তখন নাট্যঘরের এক-ফুট-উঁচু-করে-গাঁথা পাকা মঞ্চের ওপর একটা সীটে থাকি। আমার পাশেই পরবর্তী কালের প্রথিত-যশা চিত্রশিল্পী মুকুল দে থাকত। বয়সে কিছু বড়ো হলেও ও প্রায় সকল বিষয়েই আমার সহপাঠিত্ব করত। তখন থেকেই ও ছবি আঁকায় মন দিয়ে পড়াশুনোয় অবহেলা করত বলে কবিগুরু ও ক্ষিতিমোহনবাবু ওকে মাঝে মাঝে তিরস্কার করতেন। নাট্যঘরে যে রাত্রিতে অভিনয় হত, সেদিন বিকাল বেলায়ই অধিবাসী ছাত্রদের তক্তাপোষগুলি বাইরে বের করে দেওয়া হত ; খাতা বই বিছানা বাক্স অন্য ঘরে সরিয়ে রাখা হত।

একবার উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা কবির লেখা 'বিসর্জন' অভিনয় করেছিল। এতে জয়সিংহের ভূমিকা নেন মনোরঞ্জন রায়চৌধুরী (সরোজরঞ্জনের দাদা), রঘুপতির ভূমিকা নেন জগদানন্দবাবুর পুত্র ত্রিগুণানন্দ রায় (পটলদা) অপর্ণা করেছিলেন শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ, নক্ষত্রমাণিক্য করেছিলেন কাশীনাথ দেবল। গোবিন্দমাণিক্য যিনি করেছিলেন তাঁর মুখখানি স্পষ্ট মনে আছে, নাম ভুলে গেছি।

কবি যখন অভিনয় শিক্ষা দিতেন, তখন আমি সুশীল প্রবোধ সন্তোষ প্রভৃতি জনকয়েক দুষ্টু ছেলে জানলার বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে দেখতুম ও শুনতুম। শিক্ষকদের তাড়া খেলে পালিয়ে আসতুম। মনে পড়ে—সুধীদার গেয় দু'ছত্রের গান 'আমি একলা চলেছি এই ভবে' গুরুদেব বারে বার নিজে গেয়ে ওঁর ত্রুটি শুধরে দিয়েছিলেন।

সুধীদা তখন খুব রোগা ছিলেন ; ঢেউ খেলানো একগাদা মাথাভরা চুল ছিল যা অদৃষ্ট নিতান্ত অবিচার করে প্রৌঢ়ত্বের সূচনায় নির্মম-হস্তে মুছে দিয়েছেন। অভিনয়ের দিন আমি আর সুশীল স্টেজের ভেতরে থেকে অভিনেতা দাদাদের ফাই-ফরমাস খাটবার অধিকার পেয়েছিলুম। হঠাৎ অভিনেতাদের পেণ্ট করতে করতে ষ্টিক পেণ্ট ফুরিয়ে গেল। সুধীদার তখন আধখানা অর্থাৎ মুখের একদিক পেণ্ট হয়ে গেছে।

আমাদের ওপর হুকুম হল দেহলীতে ছুটে গিয়ে গুরুদেবের কাছ থেকে অন্ততঃ আর একটা ষ্টিক পেণ্ট চেয়ে নিয়ে আসতে। সন্ধ্যা সাতটা, আকাশে মেঘ থম থম করছে, দূর থেকে মাঝে মাঝে গুড়্ গুড়্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। গুরুদেব দেহলীর গাড়ি-বারান্দায় তখন বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন আর অর্ধোচ্চ স্বরে গাইছেন—'একটি নমস্কারে প্রভু, একটি মমস্কারে।' আমাদের দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়তেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাই রে তোদের ?' আমি বললাম : 'গুরুদেব, আর একটা ষ্টিক পেণ্ট চাই। সুধীদার মুখের এক দিক এখনো পেণ্ট হতে বাকি রয়েছে।' শুনে কৃত্রিম কোপের ঝাঁজ দিয়ে বললেন : 'সুধী কি মেম সাহেব সাজতে চায় ? করছে তো ভিখিরি মেয়ের পার্ট, দামী পেণ্ট এত খরচ করলে চলে না। যা, তাকে চাঁদ হয়ে অভিনয় করতে বল্‌গে যা।'...কথার অর্থ না বুঝে আমরা দুজন হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। একটু সুর নামিয়ে বললেন : 'মুখের যে দিকটা পেণ্ট করা সেই দিকটা দর্শকদের দিকে ফিরিয়ে ওকে অভিনয় করতে বল্‌গে যা'—বলেই ঘরের ভেতর গিয়ে গা-আলমারি থেকে একটা ষ্টিক পেণ্ট বের করে এনে সুশীলের হাতে দিলেন। সুশীল গুরুদেবকে চেঁচিয়ে বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল—'আপনি শীগ্‌গির আসুন, অভিনয় এখনি আরম্ভ হবে।' সে রাত্রিতে পটলদার রঘুপতি সকলের অভিনয়কে ম্লান করে দিয়েছিল। 'এ জগৎ মহা হত্যাশালা...হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে'—এই নির্দয় সত্যবাণী আজো কানে বাজে।

কবির Witticism ও bon mots এক এক সময় অপাত্রে বর্ষিত হত। এই সূত্রে বহুদিন পরে একটা ছোটো ঘটনার কথা উল্লেখ করি; এটা কবির নিকট্ সম্পর্কীয় আমার এক বন্ধুর নিকট শোনা। বনমালী ছিল কবির বহুকালের বিশ্বাসভাজন শ্রদ্ধাবান ভৃত্য; কবি তাকে আদর করে নীলমণি বলে ডাকতেন। তখন কবি ছিয়াত্তর বছর বয়স উত্তরণ করেছেন, শরীর একটু একটু করে অপটু হয়ে পড়ছে, কোমর বাঁকছে, মাঝে মাঝে ছোটখাট অসুখে ভুগছেন, তবু একদণ্ড চুপ করে বসে নেই তিনি। তখন উনি বোধ হয় উদয়নে থাকেন। ভোর রাত্রেই প্রবল কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে। সকালে উঠে পুত্রবধূকে কিছু বলেন নি। কিছু ফল ও দুধ খেয়েছেন। বারান্দায় একটা আরাম-কেদারায় একখানা কাশ্মিরী শালপোষে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় চোখ বুজে চুপচাপ পড়ে আছেন।

বেলা আটটা নাগাদ বনমালী একটি শ্বেতপাথরের রেকাবিতে করে খান-চারেক সিঙ্গাড়া এনে একটা ছোট তেপায়ায় রেখে তাঁর কেদারার কাছে টেনে আনল। কবি চোখ মেললেন না দেখে সে সবিনয়ে নিবেদন করল: 'কর্তাবাবুমশাই, গরম গরম সিঙ্গাড়া এনেছি ক'খান, তাড়াতাড়ি ইচ্ছে করুন দয়া করে।' মিনিটখানেক পরে আর একটা সন্ত্রস্ত তাগাদা দিতেই কবি নিমীলিত নেত্রেই বেশ গম্ভীর গলায় ধীরে ধীরে বললেন: 'নীলমণি, তোমার গরম সিঙ্গাড়ার চেয়ে অনেক বেশি গরম শরীর নিয়ে বসে আছি। সুধাকান্তবাবুর তাপ যদি সিঙ্গাড়ার চেয়ে কম থাকে তো তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পার।'...

প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় কাচমন্দিরে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের উপাসনা ও উপদেশ-শ্রবণ হত। শান্তিনিকেতনে থাকলে কবি নিজে আচার্যের কাজ করতেন; না থাকলে কখনো অজিতবাবু কখনো জ্ঞানবাবু কখনো কালীমোহনবাবু কখনো বা বিধুশেখরবাবু নতুবা ক্ষিতিমোহনবাবু আচার্যের আসনে বসতেন। মন্দিরের ভেতর আলো জ্বলত না; যারা লণ্ঠন নিয়ে আসত, তারা পলতে খাটো করে দরজার কাছে রেখে দিত। গুরুদেবের বক্তৃতার দিন বড়ো ও মাঝারি বয়সের

জনকয়েক ছাত্র বা ছাত্রী দরজার ধারে স্তিমিত লণ্ঠনের আলোর কাছে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বসে তাঁর উপদেশবাণী যথাসাধ্য টুকে নিত। আমিও মাঝে মাঝে এ কাজে ব্রতী হতুম। আমাদের দলে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ছিল প্রদ্যোৎ আর নরেনদা (নন্দী)। অতঃপর এই অনুলিখিত উপদেশগুলিকে কেন্দ্র করে 'শান্তিনিকেতন' নামক প্রবন্ধাবলী দানা বাঁধে।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে মাত্র ছ'বছর অবস্থানের নানা রঙের দিনগুলি পঞ্চাশ বৎসরোর্ধ্বেও স্মৃতির পরতে পরতে অক্ষয় হয়ে আছে। চলতে ফিরতে বা নিশ্চিন্ত বিরামের ছিদ্রপথ দিয়ে কতদিনের কত টুকরো টুকরো কথা কতো হাস্যমধুর ঘটনার ছবি সংজ্ঞাত মনের পটে প্রতি-ফলিত হয়ে ওঠে।

শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ আইচ ও তাঁর আগে ছ'জন সহকর্মী আশ্রমটি একেবারে বৈদিক যুগের আদর্শে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তিনি সারা সকালবেলাটা তসরের কাপড় চাদর পরে খড়ম পায়ে দিয়ে ঘুরতেন। আশ্রমে চিত্রমূর্তি পূজার বিধি ছিল না বলে তিনি ফুল তুলে একান্তে কুশাসনে বসে বিড়বিড় করে মন্ত্রপাঠ করতেন এবং ইষ্ট-দেবতার উদ্দেশে ফুল নিবেদন করতেন। গুরুদেব ও ক্ষিতিমোহনবাবুকে ক্রমাগত তাগাদায় অস্থির করে তিনি একদিন আশ্রমে একটা পুরুষ-জাতীয় হরিণ-শিশু আনিয়ে পোষার ব্যবস্থা করলেন।

জগদানন্দবাবুর দশমবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আলুর (সচ্চিদানন্দের) সাপ মারার যেমন বাতিক ছিল, তেমনি জীবজন্তু পোষারও দারুণ সখ ছিল। মাঝে মাঝে বেড়াল, কুকুর, বেজি, পাখি প্রভৃতি পুষত ও বিস্ময়কর-ভাবে তাদের বাধ্য করাত। সাহসও ছিল তার অসাধারণ রকমের। যথেষ্ট সাপের ভয় আছে জেনেও সে অদূরের কেয়াবনে ঢুকে কেয়াফুল তুলে আনত। হরিণ-শিশুটি দিনেরবেলা সকলের চোখের ওপরে থেকে মাঠে চরত। সন্ধ্যার সময় আলু ও তাদের ভৃত্যের তত্ত্বাবধানে থাকার জন্যে তাদের গৃহপ্রাচীরের অন্তরালে অন্তরায়িত হত। মাস দুয়েকের মধ্যে সে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে পড়ল এবং শিং

ছুটিও বেশ খানিকটা লম্বিত হল। মাঝে মাঝে সে শিং দিয়ে এ-গাছ ও-গাছের বাকল চিরে ফেলত। নগেনবাবু সকালবেলায় দূরের মাঠ থেকে কচি ঘাস সংগ্রহ করে এনে স্বহস্তে সযত্নে খাওয়াতেন। হরিণটি আইচ মশাইয়ের খুব বাধ্য হয়েছিল; অনেক সময় তাঁর পেছনে পেছনে ঘুরত, এক একদিন তাঁর ক্লাসে গিয়ে তাঁর পাশটিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত। একদিন কিশোর হরিণটি তাঁর চাদরের খানিকটা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছিল। অবোধ শিশু বলে তার এই প্রগল্‌ভ অনিষ্টসাধন তিনি ক্ষমাসুন্দর চক্ষে দেখেছিলেন।

একদিন সকালে জলখাবার খেয়ে আমরা ক'জন ক্লাসে যাচ্ছি, এমন সময় জগদানন্দবাবুর বাড়ির দক্ষিণ দিকটাতে নগেনবাবুর করুণ আর্তনাদ শুনতে পেয়ে সেইদিকে দৌড়ে গেলুম। গিয়ে দেখি নগেনবাবু মাটিতে বসে সজলচক্ষে কাতরাচ্ছেন আর কাপড়-চাদরের ধুলো ঝাড়ছেন। নগেনবাবু পুষ্পচয়ন করেছিলেন, এমন সময় ওঁর আদরের হরিণ আচম্বিতে পেছনে এসে রহস্য করে কোমরের কাছাকাছি জায়গায় বেশ সজোরে ঢুঁ মেরেছে। পরক্ষণেই তিনি ভূতলশায়ী হন এবং চীৎকার করতে থাকেন। জগদানন্দবাবু হুঁকা হাতে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসেন, আলু বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে এসে হরিণটাকে আচ্ছা-মতো লগুড়াঘাত করে। হরিণটা তখন অদূরের মাঠে পালিয়ে গিয়ে নির্বিকারচিত্তে মরা ঘাস চিবিয়ে প্রাতঃরাশ করছিল। নগেনবাবুর দাঁড়াবার শক্তি ছিল না; বড়ো ছেলেদের চারজন তাঁকে চ্যাঙ্‌দোলা করে তুলে ঘরে পৌঁছে দিল। তিনি পথে সকরুণ কণ্ঠে উষ্মার অগ্নিস্রাব মিশিয়ে বলতে লাগলেন: 'বেইমান্‌, বেইমান্‌, পাজী, বদমায়েস! কত ঘাস খাইয়েছি, শেষটা আমাকেই—? কালিদাস এই সব্বনেশে জাতকে মহারাজ দুষ্মন্তের বাণের আঘাত থেকে বাঁচিয়ে গেছেন! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!' দিনকয়েক পরে হরিণটিকে কোথায় নির্বাসনে পাঠানো হল আমরা জানতে পারলুম না।...

খুব রগড় হবে।' তর্কসংশয়ের অবসর ছিল না। সন্তোষ ভালো ফুটবল খেলত, সার্কাসী কসরৎ জানত, আমাকে বুনো কুল খাওয়াতো। কাজেই যথাসময়ে শাস্ত্রীমশাই চেঁচিয়ে ডিসমিস্ বলার সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষপ্রদত্ত শর নিক্ষেপ করলুম এবং দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে আম্রকুঞ্জের দিকে ছুটে পালালুম। পেছনে একটা হাসির হুল্লোড় উঠেছে এবং আমায় গ্রেপ্তার করতে একদল বড়ো ছেলে ছুটেছে—শুনতে পেলুম। দু'মিনিটের মধ্যে ধরা পড়ে বিচারকের সম্মুখে আনীত হলুম। ক্ষিতিবাবু 'বেজায় অসভ্যতা শিখেছ—না?' বলে বাঁ হাতে আমার চুলের মুঠি ধরে অন্য হাতে এক বিরাশী-শিক্কা ওজনের জগদ্দলী ঘুষি মারলেন পৃষ্ঠদেশে। পিঠের ব্যথা ভুলতে অনেকদিন লেগেছিল।

পূর্ব-দক্ষিণ দিকের চালাঘরটিতে সেই রাত্রেই ক্ষিতিবাবুর সীটের পাশে স্থানান্তরিত হলুম। মুকুল কিছুদিন আগেই সেই ঘরে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানেই আমার শাস্তির সমাপ্তি হয়নি। ক্ষিতিবাবুর খাটের নীচে ঘণ্টা-পেটা একটা কাঠের হাতুড়ি থাকত। ভোর রাত্রে তিনি সজোরে নাড়া দিয়ে আমাকে তুলে দিতেন। এক হাতে লণ্ঠন আর এক হাতে হাতুড়ি নিয়ে ঘুমজড়িত চক্ষে ঘুরঘুট্টি নিশুতি অন্ধকারের বুক চিরে আমাকে প্রত্যহ আমবাগানের প্রান্তে ভাঁড়ার ঘরের সামনে আসতে হত। সেখানে একটি আমগাছের নিচু ডালে পেটাঘড়ি টানানো থাকত। আমাকে দু'মিনিট ধরে দ্রুত লয়ে জাগরণী ঘণ্টা বাজাতে হত।...সেই থেকে আজীবন পরের জন্যে অনেক ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছি, নিজের ঘণ্টা বোধ হয় এযাত্রা স্তব্ধ হয়েই রইলো।

মফঃস্বল স্কুলে যাওয়া আসা করতাম ; মনের মধ্যে সেটা বিশেষ কোনো সাড়া দিত না। শুধু মনে পড়ে অবকাশের আধঘন্টা সঙ্গীদের সঙ্গে মন খুলে খেলা যেত, তাতে শরীরের জড়তা কেটে মনটা একটু সতেজ ও প্রফুল্ল বোধ করতাম। এটুকুর জন্যে স্কুলের প্রতি টান ছিল। দিনান্তে বাড়ি যখন ফিরতাম তখন মনের 'পরে একটা প্রচণ্ড বোঝা, তাতে মনে হত মায়ের কোলে নিদ্রার আশ্রয় পেলে যেন একটু শান্তি পাওয়া যায়।

এমনি সময় যখন শুনলাম শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে পড়তে আসব তখন আনন্দ আর ধরে না। খুব বাল্যকাল থেকেই তাঁর গান গাইতাম দাদাদের কাছ থেকে শুনে শুনে। কথার অর্থবোধ হত না তেমন, তবে সুরে দোলা লাগত প্রাণে। শীতের এক শেষরাতে বোলপুর স্টেশনের মিট্‌মিটে আলোতে এসে যখন পৌঁছলাম, তখন সবটাই কেমন যেন রহস্যাবৃত মনে হতে লাগল। ক্ষিতিমোহনবাবু যখন পূর্ববঙ্গে ছুটি কাটাতে যেতেন, তখন প্রায় প্রতিবারই তাঁকে দেখেছি। তিনি আমার ঠাকুমার কাছ থেকে স্ত্রীআচার, কনে সাজানো, জলভরা এমন-কি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার গান ইত্যাদি শুনে লিখে নিতেন। গুরুজনরা তাঁর কবীর, দাদু, ও বাউল সম্প্রদায় সম্বন্ধে কথকতা শুনে মুগ্ধ হতেন। দাদারা তাঁর কাছ থেকে যে সব গান শিখতেন, তখন আমারও শেখা হয়ে যেত সঙ্গে সঙ্গে। তাঁরা তাঁর আগমন প্রত্যাশা করে থাকতেন। তাঁকে আমারও খুব ভালো লাগত, মজার মজার গল্প বলতেন কথাচ্ছলে। তাঁর মতো বহু লোক এখানে আছেন ভেবে সোয়াস্তি বোধ করলাম।

অসমান মাটির রাস্তা ভেঙে হেঁটে রাতের অন্ধকারে কুলির সঙ্গে একটা দোতালা বাড়ির বারান্দায় উঠলাম আমরা। চতুর্দিক অন্ধকার, তাই কিছুই বুঝতে পারিনি তখন। ভোরের আভাস পেয়ে পাশের

বকুলগাছ থেকে অজস্র পাখি কলকল করে জেগে উঠল, একটি ঘণ্টাধ্বনিও কানে এসে পৌঁছল। আলো হতেই বাইরে এসে দাদার সঙ্গে মন্দিরের পাশের রাস্তাটিতে পায়চারি করতে লাগলাম। আশ্রম নিঃস্তব্ধ, শুধুই পাখির কাকলি, একটি শান্ত পরিবেশ। একটু বাদেই পাশের বাড়ি থেকে গেস্ট হাউসের ম্যানেজার গাঙ্গুলীমশাই এসে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন ও আমাদের নিয়ে চললেন ক্ষিতিমোহন-বাবুর বাড়ি। পথে তাঁর সঙ্গে দেখা, তিনি বৈতালিকে আসছেন। আমরা তাঁর সঙ্গে এগোলাম।—'ধ্বনিলরে ধ্বনিলরে ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর' গানটি ছেলেমেয়েরা মিলে গাইলেন। আমার সব ব্যাপারটা মিলে ভালো লাগল। এখনও চোখে ভেসে আছে—লাইব্রেরির সামনে দুই সারিতে ছাত্রছাত্রীরা আর শালবীথিকার তলায় অধ্যাপক ও কর্মীরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে এক একজন দাঁড়িয়ে। এমন শান্তভাব দিনের কাজের শুরু, মনের 'পরে সেটি একটি রেখাপাত করে গেল।

সকলে বৈতালিক শেষে একে অন্যকে প্রাতঃনমস্কার জানালেন। ছেলেরা দলে দলে ভাগ হয়ে গাছতলায় গিয়ে বসল আসন পেতে। বোর্ডিং-এ এলেন নুটুদি, স্নিগ্ধমধুর হাসি নিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। বিকেলে বই-খাতা, পেন্সিল, আসন কিনে এনে তৈরি করে দিলেন পরের দিনের জন্য। শ্রীভবনের দিদিরা ছোটো বোনের মতো সঙ্গে নিয়ে সব নিয়মকানুন বুঝিয়ে দিলেন। খাওয়া, শোওয়া, বসা সবটাই বেশ সহজে হয়ে গেল।

পরদিন স্কুলের পালা। মাস্টারমশাইরা প্রত্যেকে নাম, বাবা মা কোথায় থাকেন, কোথায় পড়তাম, কেমন স্কুল ইত্যাদি সব জিজ্ঞেস করে নিলেন। এই আত্মীয়তার স্পর্শটুকু ঘরে টেনে নেবার মতো। অন্য স্কুলের সঙ্গে প্রথমেই পার্থক্যটুকু ধরা দিল। সেখানে দেখেছি নাম ডাকার পরই সোজাসুজি পড়াশুনার সম্পর্ক।

এখানে এসে দেখলাম, কাজের ঠাস্ বুনানিতে দিনগুলো ভরা, কোথাও ফাঁক নেই, কিন্তু তবু ক্লান্তিও যেন নেই কোথাও। প্রতিদিন

একটির পর একটি বিষয়ের ক্লাস, সকালে বিকেলে মিলিয়ে হাতের কাজ, গান, নাচ, লাঠি ছোরা খেলা ও যুযুৎসু ইত্যাদিও আছে। এই বিষয়গত বৈচিত্র্য মনকে বেশ জাগিয়ে রাখে। দিনান্তে উপাসনার ঘণ্টায় যখন চুপ করে বসি, তখন আর কিছু বুঝি বা না বুঝি, চুপ করে বসে দিনটির দিকে তাকালে দেখি মন ভরে আছে। পড়াশুনা করে নিই দুপুরে ও রাত্তিরে ; দিদিরা সাহায্য করে দেন, না বুঝলে। তাড়াহুড়ো লাগলে কখনও বিছানা ঢেকে দেন, কখনও চুল বেঁধে দেন। তাঁদের হয়তো সেসব কথা মনেও নেই। বাড়ি ছেড়ে এসে নতুন পরিস্থিতিতে এরকম খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো মনের 'পরে দাগ কেটে যায়। এখনও মনে পড়ে ; সংস্কৃত যুক্তাক্ষর পড়তে গিয়ে ঠেকে যেতাম। কুন্দদি বলতেন, 'যখন বিকেলে চুল বাঁধি তখন বই নিয়ে এসে এক-দুবার পড়ে নিয়ো, তা হলেই জানা হয়ে যাবে।' রাতে যখন বিছানায় যাই তখন শুতে না শুতেই ঘুম এসে যায়। বাড়ির কথা ভাববার আর সময়ই হয় না। ভোরে দিদিরা ডেকে তোলেন। এমনি করে কখন দিন কেটে যায় বুঝি না।

বুধবার মন্দির—সকলের সঙ্গে এসে মন্দিরে বসলাম। মন্দিরের গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি ; সঙ্গে সঙ্গে সকলের নিঃশব্দে শ্রদ্ধাবনত মস্তকে মন্দিরে প্রবেশ, গেটের দু'পাশের আকাশ-নিমগাছ থেকে ঝরে-পড়া অজস্র ফুলের গন্ধ কেমন একটা অন্য জগতের আমেজ এনে দিল। তেজেশদার বারান্দা থেকে আস্তে আস্তে গুরুদেব এসে দাঁড়ালেন— তাঁর পরনে কোঁচানো ধুতি, গায়ে ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবির ওপর গরদের চাদর। 'ওঁ পিতা নোঽসি' মন্ত্র পাঠের পর গান হল, 'প্রথম আলোর চরণধ্বনি উঠল বেজে যেই।'

এরপর গুরুদেব কিছু বললেন। পর পর কয়েকটি গান হল। মন্দির শেষে সবাই আমরা একে একে গুরুদেবকে প্রণাম করলাম। তাঁর শান্তমূর্তি দর্শনে মুগ্ধ হলাম।

বোর্ডিং-এ ফিরে এসে ছুটির দিনের কাজকর্ম চলতে লাগল, তার মধ্যে ধোপাকে কাপড় দেওয়া প্রধান, কিন্তু ঘুরেফিরে সেই সকালটির

কথাই মনে হতে লাগল। এমনি করে দিন কাটে। নূতন গান শিখলে সেটি গুন্ গুন্ ক'রে, কখনও জোরে জোরে করি অবসর মত। নেশায় পেয়ে বসে যেন। প্রত্যেক ঋতু অনুযায়ী দুটুদি গান শেখান—শালবীথিকা দিয়ে যাবার সময় বিকেলে সন্ধ্যেতে সে সব গান গেয়ে চলি দল বেঁধে—কী নেশায় মেতে বলতে পারি না।

সেদিন শুনলাম United Information Bureau থেকে শান্তিনিকেতনের পরিচয় জগৎকে জানাবার জন্য টেপ রেকর্ড করতে এসে তারা প্রথমেই রেকর্ড করেছে শেষরাতে আমবাগানে গিয়ে ভোরে-জাগা পাখির কাকলী। শুনেই মনে পড়ল আমার সেই আশ্রমের প্রথম প্রত্যুষটির কথা। তারপরই তারা তুলেছে শিশুদের বৈতালিক—ভোরে জাগা পাখির মতো তারাও জেগে উঠল মধুর কণ্ঠ নিয়ে পরম পিতার আরাধনা করতে করতে প্রকৃতির এই জাগরণের সঙ্গে।

এরপর এল এক সাহিত্যসভার দিন। ছেলেমেয়েদের সভা সাজাবার সে কী ধূম। শালবীথিকায় হবে সাহিত্যসভা, বীথিকা ঘর থেকে ছেলেরা তার এনে একটি আলো ঝোলালো সভাপতির আসনের কাছে আর একটি টেবিলের কাছে। শালফুল ফুটেছে তখন, তাই দিয়ে আর পলাশ, কাঞ্চন ও পাতা দিয়ে সাজানো হল ইচ্ছে মতো। গুরুদেব হবেন সভাপতি। আমার এখনও ভাবতে ভালো লাগে, তাঁকে মধ্যস্থ করে সে সভার কী রূপ খুলেছিল। চারপাশে অজস্র ফুলের মধ্যে তিনি বসে আছেন, অল্প আলোয় তাঁকে শুধু দেখা যাচ্ছে—পেছনে অন্ধকারে আচ্ছন্ন আম্রকুঞ্জ। প্রতিবেদন, রচনা, গল্প, কবিতা পড়া হলে পর, গানও হল কয়টি। সবশেষে ছেলেমেয়েরা সাধারণের বক্তব্যের অত্যন্ত সহজ ও সুন্দর সমালোচনা করতে লাগল—গুরুদেবের উপস্থিতিতে তাদের কোনোই সংকোচের কারণ নেই দেখলাম। তিনি যেন আমাদেরই একজন। ছেলেরা যেখানে মজার মজার কথা লিখেছে সেখানে গুরুদেব বেশ উপভোগ করছেন মনে হল। সভাপতির বক্তব্যে তিনি লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দিয়ে নানা কথা বললেন, তাতে মনে হল ইচ্ছা করলে নানা বিষয় নিয়ে আমিও একসময় লিখতে পারব।

এরপর একদিন সকালে দ্বিতীয় পর্বে হবে অঙ্কের ক্লাস। ক্লাস হচ্ছে শালবীথিকায় বিশ্বনাথদার কাছে। হঠাৎ দেখি কখন গুরুদেব পায়চারি করতে করতে এসে পেছনে দাঁড়িয়েছেন। আমার ভয় পাওয়া দূরে থাক্ দ্বিগুণ উৎসাহে বিশ্বনাথদার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলাম। তিনি আস্তে আস্তে অন্য ক্লাসের দিকে এগোলেন। আমরা আশা করে থাকলাম তিনি অবসর মতো এরকমভাবে আশ্রমে আসবেন। সকালের দিকে এলে তিনি হেঁটে আসতেন—ছাতিমতলা হয়ে আমবাগানের ভিতর দিয়ে।

বিকেলে একদিন মুড়ি, দুধ, কলা খাবার হয়েছে। শ্রীভবন তখন 'দ্বারিকে'—কিছু কলার খোসা অসাবধানতাবশতঃ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে পাশের খেলার মাঠে (এখন যেখানে শিক্ষাভবনের ছাত্রদের বাসভবন)। হঠাৎ দেখি মেয়েরা সবাই মিলে কলার খোসা কুড়োতে লেগে গেছে—বলাবলি করছে গুরুদেবের গাড়ির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। তখন সেই একটি মাত্র গাড়িই আছে। সমস্ত মাঠে মেয়েরা তখনও কলার খোসা হাতে দাঁড়িয়ে আছে; এরি মধ্যে গুরুদেবের গাড়ি এসে দাঁড়াল দরজায়। তিনি মেয়েদের দেখে একটু স্মিত হেসে এগিয়ে গেলেন পরিদর্শিকা হেমবালাদির ঘরের দিকে। এ নিয়ে আর কোনো আলোচনা হল না। মেয়েরা একজনার উপস্থিতিতে সচেতন হয়ে উঠল এটাই যথেষ্ট। তারপর একদিন শুনলাম দিদিদের কাছে—তিনি পছন্দ করেন যে মেয়েরা নিজেরা যেমন পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকবে তেমনি আশপাশও গুছিয়ে সুন্দর করে রাখবে। তাই এক-একদিন তিনি আগে খবর দিয়েই আসতেন শ্রীভবনে। আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের ঘর গুছিয়ে ফুল দিয়ে সাজিয়ে আল্পনা দিয়ে রাখতাম। গুরুদেব এসে দেখে খুশি হবেন তাই কী উৎসাহ।

বোর্ডিং-এ থেকে মেয়েরা পাছে সংসারের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে তাই সেদিকেও তাঁর নজর এড়াত না।

নতুন 'শ্রীভবন' তৈরী হওয়ার পর গুরুদেব 'শ্রীভবন সম্বন্ধে আমার

আদর্শ' বিষয়ে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে আশ্রমে ছাত্রীদের শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মতামত ও অভিপ্রায় বিশদভাবেই ব্যক্ত করেছিলেন। সে সময় তাঁর সম্পূর্ণ তাৎপর্য যে বুঝেছিলাম বা বুঝে মনে রাখতে পেরেছিলাম, তা নয়। আজ জীবনের বহু অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে এবং য়ুরোপীয় সমাজজীবন ও শিক্ষাব্যবস্থার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করে বুঝতে পেরেছি যে, গুরুদেব তাঁর সেই উচ্চ আদর্শ ও সুদূরপ্রসারী অভিপ্রায়গুলিকে আমাদের জীবনে বাস্তবভাবে প্রতিফলিত করে তোলবার জন্য কিরূপ সর্বাঙ্গীন ব্যবস্থার সুত্রপাত করেছিলেন। উপদেশ দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু তাকে অন্যের জীবনে অলক্ষ্যে অথচ পাকাপাকিভাবে সঞ্চারিত ও ফলপ্রসূ করে তোলাই প্রকৃত শিক্ষাগুরুর কাজ। আমাদের আশ্রমগুরু সেই কঠিন কাজ কিরূপ সহজ ও স্বাভাবিক ধারাতে আমাদের জীবনে নিষ্পন্ন করেছিলেন, তা ভাবলে উপলব্ধি করতে পারি যে গুরুদেবের আশ্রমে ছাত্রীজীবন কাটাবার সৌভাগ্য না হলে জীবনে অনেক সম্পদ থেকেই বঞ্চিত থাকতে হতো।

একদিন গুরুদেব জানালেন, মেয়েরা যেন মাঝে মাঝে জনকয়েক অতিথিকে ঘরে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবার জন্যে তৈরি থাকে। নিজেরা খাবার তৈরী করে, এটাই তাঁর ইচ্ছা। আমার বয়স তখন বারো। খাবার তো করতে জানি না ভালো, ঘরের সঙ্গীরাও একই বয়সী তাই সরোজিনীদিকে গিয়ে ধরে পড়লাম। তিনি স্বপাক খেতেন, ছোট্ট একটি উনুন। ছানা করে গুটিকয়েক সন্দেশ করা হল থালায় ঢেলে। সবই ঠিক, এখন অতিথিরা এলে কী করে তাঁদের অভ্যর্থনা করে বসাই। সরোজিনীদি, হিরণদি তো বলে দিলেন কেমন করে এগিয়ে গিয়ে নিয়ে আসতে হয়, কেমন করে আসন দেখিয়ে বসতে বলতে হয়, তারপর অত্যন্ত নীরবে সহজভাবে বিশেষ ব্যস্ততা না দেখিয়ে কেমন করে থাকতে হয়—খাবার সময় কেমন করে একটু কাছাকাছিই দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ইত্যাদি। সব তালিম দেবার পর সময় যতই এগিয়ে আসছে সঙ্গীরা

এ ওকে বলছি এগিয়ে প্রস্তুত থাকতে। গুরুদেবের কাছে শিশুসুলভ চপলতা ও ত্রুটি নিয়ে এগোতে কারো সংকোচ নেই। তাঁর দৃষ্টির মধ্যে একটি এমন স্নেহ ও প্রীতি মাখানো প্রসন্নতা ছিল যে সকলেরই ভালো লাগত তাঁর সান্নিধ্য। কিন্তু সঙ্গে যে মাস্টারমশাইরা আসবেন দু-তিনজন, সেই ভাবনা। ধীরেনদা, আরিয়েমদা, ডাঃ আলী এবং দাদামশাই ছিলেন মনে আছে। ধীরেনদা, আরিয়েমদার সঙ্গে বেশ ভাব, একসঙ্গে খেলার মাঠে খেলি, All Quiet on the Western Front পড়ি, রান্নাঘরে একসঙ্গে পরিবেশন করি, বাসন ধুই আবার আরিয়েমদার ঘরে গিয়ে আব্দার করে ডিমসিদ্ধ রুটি খাই, কখনো গল্প শুনি। কিন্তু ঘরে ঢুকবার সময় ওঁরা যে সবটাই লক্ষ্য করবেন এবং কিছু কিছু সমালোচনা এড়াতে পারব না এই ভেবেই সংকোচ। যাক্ ওঁরা তো এলেন, এগিয়ে নিয়ে এলাম যথারীতি। বসিয়ে খাবার দিলে গুরুদেব শুধু একটি ছানার সন্দেশ থেকে এক টুকরো ভেঙে নিলেন। অন্যেরাও খেলেন সামান্যই। এবার গুরুদেব একটি গান করতে বললেন। শুধু খাইয়ে নয়, অতিথি আপ্যায়নের এটুকুও এক অঙ্গবিশেষ বিবেচনায় তিনি সেটুকু করিয়ে নিলেন ; একটি মেয়েকে একটি আবৃত্তি করতে বললেন। যাবার সময় আমরা তাঁদের পাশের ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। ধীরেনদা বেরোবার সময় বললেন, 'বেশ হয়েছে, এবার সন্দেশ থেকে থাকলে ভাগ করে খেয়ে নাওগে যাও।' পরীক্ষায় তো উত্তীর্ণ হওয়া গেল, এখন আনন্দ দেখে কে! একদিনের একটি ব্যাপার, কিন্তু অনেক চিন্তা ও সংকোচ কাটিয়ে সেটুকু পার হতে পেরে নিজের 'পরে ভরসা এলো অনেক।

এমনিতরো খুঁটিনাটি আরো অনেক ব্যাপার। রান্নাঘরে তত্ত্বাবধানের ভার পড়ত এক-একদিন একটি করে ছেলে ও মেয়ের উপর। মেয়েদের কিছুদিন কাজ হল জনা-পনেরো লোকের মতো রান্না করা। যার পালা সেদিন সে প্রথম দুই পর্ব ক্লাস করে চলে আসত। হিরণদি তাকে দিয়ে তাঁর ইচ্ছামতো কখনো ছানার

পোলাও ; কখনোও কপি-ডাঁটা-চচ্চড়ি, কখনোও মাছের মাথা দিয়ে মুগডাল, কখনোও সরষেবাটা দিয়ে মাছসেদ্ধ, দই-মাছ, চিংড়িমাছ সেদ্ধ এসব রাঁধতেন। ক্লাসের ছেলেরা তো খোসামোদ করে, 'ভাই, আমাকে কিন্তু নেমন্তন্ন কোরো।' এদিকে সুবিধে পেলে আগে তারাই কত আসনের ধুলো ঝেড়েছে মুখের উপর—বই খাতা লুকিয়ে রেখে কত মুস্কিলেই ফেলেছে, তখন কিন্তু একেবারে ভালো মানুষটি। তনয়দা, বিশ্বনাথদাদের নেমন্তন্ন করতাম, খেয়ে খুব তারিফ করে বলতেন, 'আবার আরেকদিন আরো ভালো করে বেঁধে ডেকো।' এসবই গুরুদেবেরই নির্দেশমত হত। আজ তা বুঝি। ছেলে ও মাস্টারমশাইদেরও মাঝে মাঝে একটু মুখবদল হত।

শ্রীভবনে একটি মেয়ের অসুখ হল। দোলের দিন একসঙ্গে দোল খেলেছি, শ্রীনিকেতনের পুকুরে গিয়ে ইচ্ছেমতো ডুবিয়ে স্নান করেছি ; বোর্ডিং-এ ফিরে রাতেই মেয়েটির জ্বর। জ্বর ক্রমেই বাড়তে লাগল, বাড়তে বাড়তে সে অজ্ঞান হয়ে গেল। সারারাত দু-তিনজনা মিলে অজ্ঞান বন্ধুর পাশে বসে আছি, মাথায় জলপটি দিই, বাতাস করি, হেমবালাদি বলেন,'শুতে যাও; কাল ক্লাস আছে।' বন্ধুপ্রীতি তাই বসেই থাকি, কানের কাছে মুখ নিয়ে কতবার ডাকি, সাড়া নেই। অজ্ঞান হতে সেই প্রথম দেখি। পরের দিন ক্লাসে যাই, অবসরমত আবার বসি এসে তার কাছে, হেমবালাদি কিছুতেই সরাতে পারেন না আমাদের। মেয়েটির বাবা নেই, মা থাকেন বম্বেতে—মনে পড়তেই আমাদের কেমন যেন সমবেদনা-মিশ্রিত একটা আশঙ্কা জাগে। গুরুদেব আসেন মেয়েটিকে দেখতে দু'বেলা ; সঙ্গে ফুল নিয়ে আসেন আর দিয়ে যান বাইওকেমিক ওষুধ। সে-সময় গুরুদেবকে তার লেখার টেবিলের পাশে বসে থাকতে দেখেছি, সামনে সেই টেবিলের ওপর থাকে মোটা মোটা বাইওকেমিক ওষুধের বোতল। শুনেছি, কারুর শরীর একটু খারাপ শুনলেই তিনি ওষুধ দিতেন এবং পরে আবার খোঁজ করে তার জন্যে ওষুধ পাল্টাতেন। হেমবালাদির চিন্তা—মেয়েরা সবাই মিলে রাত জাগে—শরীর খারাপ

হয়ে অসুখ করবে। দেখি সরোজিনীদি আমাদের কয়জনাকে সকালে একটা করে কমলা আর এক গ্লাস Ovaltine দিচ্ছেন। গুরুদেব নাকি বলেছেন যারা শুশ্রূষা করছে তারা ওরকম খেলে সুস্থ থেকে সেবা করতে পারবে। রুগীর কাছে থাকতে দিতে মোটেই তাঁর আপত্তি নেই, তবে সুস্থ যাতে থাকে সেজন্য সেদিকে নজরেরও তাঁর অভাব নেই। এমনি করে রাতও জাগি দিনে ক্লাসও করি, পড়া তেমন তৈরি হয় না, মাস্টারমশাই সমবেদনার সঙ্গে সেটাকে গ্রহণ করেন।

শিশুবিভাগের ছেলেদের নিয়ে থাকেন আরিয়েমদা। ছেলেরা বেশ ছোটোখাটোই আছে। বুধবারে পালা করে যাই ছেলেদের ডেস্ক গুছিয়ে দিতে। ধোপার কাপড় মিলিয়ে নিয়ে ধোপাকে দিতে সাহায্য করি, ট্রাঙ্ক গুছিয়ে দিই, বিছানার চাদর, ওয়াড় বদলে দিই। পরে ধোপার বাড়ি থেকে যে-সব জামা প্যাণ্ট এসেছে তার ভাঙা বোতাম বদলে লাগাই। ছেলেরা গা ঘেঁষে বসে কত গল্প বলে। এর মধ্যে ঠিক হল কলাভবনের ছেলেমেয়েরা ফ্রেস্‌কো করবে শিশুবিভাগে। ছেলেরা তখন থাকবে কোথায়? গুরুদেব বললেন, একেবারে ছোটদের মধ্যে জনা-বারো থাকবে শ্রীভবনে দিদিদের কাছে। আমাদের এক একজনার খাটের পাশে একটি করে খাট ও ডেস্ক পড়ল। সব দায়িত্বই আমাদের—ক্লাসে যাবার আগে তৈরি করা থেকে শুরু করে খাবার ঘরের পাশে বসে খাওয়ানো, খেলার মাঠে নিয়ে যাওয়া। সন্ধ্যেবেলা তারা বিছানায় শুয়ে বলে 'ঘুম আসছে না, গল্প বলো।' ইতিমধ্যে আরিয়েমদার বিয়ে হল। আমি তখন খাদ্যবিভাগের সম্পাদিকা—রান্নাঘরে বেশ ঘোরাফেরা করে দেখাশোনা করি। ভাঁড়ারের চাবিও থাকে কাছেই। সেই ভোজের খাবার খেয়ে বাচ্চাদের বাড়ে লোভ। কিছু করতে বললেই বলে—মিষ্টি খাওয়াও। হিরণদি বলেন, এই তিন টিন ল্যাংচা তো আশাদির মা বাচ্চাদেরই দিয়ে গেছেন। শুনে অবধি তারা পেছন ছাড়ে না। একদিন তো ক্লাসে ঢুকছি, বিনুনি ধরে একটি ছেলে ঝুলছে, তখনই তাকে দিতে হবে। অধ্যাপক শুনে খানিক বোঝাতে চেষ্টা করলেন।

সে তো নাচার। পরে বললেন : 'এখন বোস ওর পাশে ক্লাসে, পরে ক্লাস শেষে গিয়ে ও দেবে।' মনে পড়ে তখন কাজও করতাম আর কনুই ডুবিয়ে টিন থেকে নিজেরাও একটু-আধটু ল্যাংচা খেতাম। সেই ছেলেটি বছর দশেক আগে এখানে এসে আমাকে দেখতে এল বিনয়ভবনে, বলে : 'পুতুলদি, এখন মানুষ হয়ে গেছি। ছোটোবেলায় কত চুল ছিঁড়েছি।' এখন সে বম্বেতে ডাক্তার। এখন দেখি এই যে প্রয়োজনবোধে নিজের কাজের সঙ্গে অন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়টিও চালিয়ে নেওয়া—এও শিক্ষার একটি অঙ্গ বিশেষ। ছোটো বয়েস থেকেই কিছু না কিছু দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার অভ্যাস থাকা ভালো।

শরীর মজবুত করার দিকেও গুরুদেবের যথেষ্ট নজর ছিল। জাপানী যুযুৎসু শিক্ষক তাকাগাকি এলেন জাপান থেকে সস্ত্রীক। গুরুদেব একদিন শ্রীভবন থেকে আমাদের ডেকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন ও তিনি যে বিদ্যা জানেন সে সম্বন্ধে কিছু বললেন। জাপানে অধিকাংশ মেয়ে যুযুৎসু জানে এবং তাদের স্বাস্থ্য ও এই আত্মরক্ষার উপায় তাদের মনে কেমন সবলতা এনে দিয়েছে সে নিয়েও একটু বললেন। আর বেশি বলার প্রয়োজন ছিল না। আমরা তখন বিশ্বনাথদার কাছে লাঠি ছোরা খেলা শিখতাম, মনে মনে আশা—ভালো করে শিখতে পারলে একটি ছোরা সঙ্গে থাকলেই নির্ভাবনায় চলাফেরা করা যাবে। কাগজে দেখা যায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় শহরের শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হয় এবং মেয়েদের রক্ষা করা বিষয়ে সকলে চিন্তান্বিত থাকেন; এ আমার ভালো লাগত না। তাই মনে মনে ভাবলাম এ শিখলে দুর্বৃত্তকে আরো সহজে ঘায়েল করা যাবে। তখন সকলেরই আমার 'পরে আস্থা আসবে। গুরুজনরা এসব শেখার পর আমার সম্বন্ধে কতদূর আশা পোষণ করেছেন জানি না, কিন্তু সরল মন নিয়ে চলাফেরা করার মতো নিজের শক্তির উপর যথেষ্ট ভরসা পেলাম। পরিণততর জীবনে দেশবিদেশে কাটাবার সময় মনোভাবে এর প্রভাব বিশেষভাবে অনুভব করেছি।

বছরখানেক যুযুৎসু শেখার পর ঠিক হল এই কসরৎ কলকাতায় New Empire-এ দেখানো হবে। সেটা ১৯৩১ সন, তখন 'নবীন'ও অভিনীত হয়। আমরা কয়জন উভয় দলের সঙ্গেই যুক্ত ছিলাম। নাটকের রিহার্সেল দেবার সময় তিনি যেমন এতটুকু সুরের গাফিলতি বা অপূর্ণতাকে ক্ষমা করতেন না, তেমনি ড্রিলের সময় কোথাও—angle-এর এতটুকু তফাৎ হলে অত্যন্ত বিরক্তিভরে তাকাতেন। কোনো অসুন্দর জিনিস তাঁর ভালো লাগত না। তিনি মানতেন শৃঙ্খলার মধ্যে আসতে গেলে সজাগ থাকা দরকার প্রতিক্ষণ। তিনি স্টেজের এক পাশে ব'সে থাকবেন মনে করে আমাদের ভাবনা; কিন্তু এও জানতাম প্রদর্শনী বা নাটক ভালো হলে সেদিন ফিরবার পথে ভালো আইসক্রীম আর ছানার সন্দেশ খাওয়া যাবে। এই যুযুৎসু দেখানোর পিছনে অন্য যে উদ্দেশ্য ছিল সে বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যার তাঁর রবীন্দ্রজীবনীর ৩য় খণ্ডে লিখেছেন (পৃ. ২৯০): "এ যেন শক্তি ও সুন্দরের মিলন উৎসব—'এক হাতে তার কৃপাণ আছে আর এক হাতে হার'—একদিকে শক্তির সাধনা অপরদিকে সৌন্দর্যের প্রসাধন।"

একসময় মনে পড়ে—সকালের দিকে রিহার্সেল হয়ে গেছে, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই নিদ্রায় মগ্ন; আমাদের দু-তিনজনার চোখে ঘুম নেই। কি করি, একবার জোড়াসাঁকো বাড়ির তেতলার ছাদে উঠে পাশের বাড়ির বাগানটি দেখি, আবার ফেরিওয়ালার ডাক শুনে নেমে তাদের দেখি। একবার এ বারান্দা, একবার ও বারান্দা করি, সেই গলির ভেতরে দেখবার মতো তেমন কিছু নেই। সময় আর কাটে না, কখনও সেই জাভার থেকে দেওয়া রিবাট দোলনাটিতে শুয়ে দুলি। এমনি সময় দেখি গুরুদেব তাঁর ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসেছেন। বলেন, 'ঘুম আসছে না চোখে, দুপুরটাও তো কাটছে না, খুট খুট করিসনে, হেমবালা উঠে বকবে। ঐ ঘরে গিয়ে ছাখ অনেক কমলা কোণায় জড়ো করা আছে, চুপ করে বসে খা গে যা।' গিয়ে দেখি পর্বতপ্রমাণ কমলা স্তূপীকৃত পড়ে রয়েছে। আমরা

তো মহা আনন্দে খেতে লেগে গেলাম। যারা ঘুমোচ্ছিলো তারা ঠকে গেল ভেবে মহা আনন্দ। কাজের সময় এতটুকু গাফিলতি তাঁর পক্ষে অসহ্য ছিল, কিন্তু অন্য সময় এই কিশোর বয়স্কদের প্রাণপ্রাচুর্যের দাবিকে তিনি সযত্নে রক্ষা করেছেন।

উত্তরায়ণের দক্ষিণদিকের তারের বেড়ার ধার ঘেঁষে তখন মস্ত বড়ো একটি বেলফুলের বাগান ছিল। এই গ্রীষ্মকালেও তাতে প্রচুর জল দিয়ে তাকে তাজা রাখা হত। বিকেলে আমরা আধফোটা বেল কুঁড়ি কোঁচড় ভরে পেড়ে নিতাম। রথীদার নজর এড়াত বলে মনে হয় না, তবে কেউ কিছু বলতেন না। ভোরে সেই কুঁড়ি দিয়ে গড়ে মালা করে গুরুদেবকে প্রণাম করে পরিয়ে দিলাম একদিন। আরো দুটি মেয়ে ছিল সঙ্গে। আশীর্বাদ পেয়ে খুশি মনে ফিরে এসে ক্লাসে বসলাম। বিকেলে তখন নবীনের রিহার্সেল হচ্ছে। দিন্‌দা আমাদের মতো বাল্যদল নিয়ে ঘিরে বসে আছেন। সব সময়ে কোলের কাছাকাছি ও সামনে বসাতেন তিনি ছোটোদের; বলতেন, 'সামনে বোস্ তোরা, হাত পা নাড়লে রবিদা এখন রাগ করবেন, চুপ করে বসবি।' আমরা ঐ বিরাট দিন্‌দাকে ঠিক দাদুর মতোই মনে করতাম, তাঁর আশ্রয়ে বসে নিশ্চিন্তে গলা ছেড়ে দিতাম। এমনি সময়ে গুরুদেব এলেন ঘরের রিহার্সেল নিতে। আমরা তো নিশ্চিন্তে সামনেই বসে আছি, দেখে হেসে বললেন: 'দীনু জানিস, এরা আমার বাগানের ফুল তুলে আমাকেই মালা পরায়।' দিন্‌দা বললেন: 'ওরা আর ফুল পাবে কোথায়।' শ্রীভবন থেকে এসে 'সুরপুরী'তে (দিনেন্দ্রনাথের বাড়ি) তখন গান শিখি, বড়ো ছোট মিলিয়েই ক্লাস হয়। শৈলজাদা, শৈলেশদারাও যান সেই ক্লাসে। দুই পর্ব গান হয়, এক সঙ্গে দুটো করে গান শিখি। শেখা হলেই বলেন: 'কমল, এদের গলা শুকিয়ে গেছে, একটু সরবৎ আর কেক্ যে করেছিলে দাও না।' তাঁরা তো দুটি মাত্র প্রাণী, এ আমাদের জন্যই করা। দিন্‌দার জন্য বিরাট একটি পেয়ালায় করে চা আসে, তিনি সেটি সামনে নিয়ে মজার মজার গল্প বলেন। বড়ো আত্মীয়তার স্পর্শ ও ঘরোয়া একটি ভাব।

এরকম তো রিহার্সেল চলে—জয়ন্তী উপলক্ষে 'শাপমোচন' অভিনয় কলকাতায় হবে। প্রতিদিন খাবার ঘণ্টা পড়ে যায়, দ্বিতীয় দলের সঙ্গে খাই। রাতে ঘুম পেয়ে যায়, পড়া আর হয় না। সেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষার বছর মনে মনে আশঙ্কা—এবার পরীক্ষা পাশ করা কঠিন হবে। মাস্টারমশাইরা ঘন ঘন সতর্ক করছেন: 'ওহে, এবার কলকাতা ইউনিভারসিটির পরীক্ষা, এরকম হলে চলবে না।' মনে মনে ভয়, মা-বাবা কী বলবেন। কোন্‌দিক সামলাই। দু'দিন তো রিহার্সেলে গেলাম না, ভাবলাম পার পাওয়া গেল। বিকেলে যেই ফুলের আশায় উত্তরায়ণের বাগানে ঘুরছি; লক্ষ্য করিনি যে, গুরুদেব মেহেদি বেড়ার আড়ালে পায়চারি করছেন। জিজ্ঞেস করলেন: 'কে রে বেড়ার আড়ালে?' সামনে যেতেই বললেন: 'রিহার্সেলে আসিস না কেন?' বললাম ধীরে ধীরে: 'এবার তো পরীক্ষা।' বলেন: 'এখানে তো শুধু পরীক্ষা পাস করার জন্য আসিস নি, আজ থেকে রিহার্সেলে আসবি। পরীক্ষার ব্যাপার তনয়রা বুঝে নেবে।' যাক্‌ তখন থেকে মনের আনন্দে রিহার্সেলে আসতে লাগলাম। পরে সব চুকে গেলে যখন কলকাতা থেকে আশ্রমে ফিরে এলাম, তখন জগদানন্দবাবু বিকেলেও খেলার ঘণ্টায় Matric Test Paper করান, আর রাতে তনয়দা Cabin-এর উপর ইংরাজি অনুবাদ আর appropriate preposition মুখস্থ করান। রাত হয়ে আলো নিবে গেলে, লণ্ঠন নিয়ে বসেন: তারপর রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে একসঙ্গে বসে খাওয়ান। হিরণদিকে বলেন: 'দুটো করে ডিম-সেদ্ধ ঠাকুরদের করে দিতে বলুন, অনেক কষ্ট করে এতক্ষণ মুখস্থ করেছে।' ঘুম এসে গেলে বকতেন, বলতেন: 'এখন ঘুম এলে চলবে না, ঐ পরীক্ষার দরজাটি তো পেরোতে হবে। নইলে মা বাবা কী বলবেন।'

একবার গুরুদেবের খেয়াল হল পাঠভবনের ইংরাজি ভাষা শিখবার ক্লাস নেবেন। ডাক পড়ল আমাদের উদয়নে। প্রথম পর্বেই ক্লাস। আরিয়েমদা, তনয়দা আমাদের নিয়ে এলেন। গুরুদেব

বললেন : 'তোমরা যাও, তোমাদের দেখলে ছেলেমেয়েরা ভয় পাবে, যা জানে তাও বলতে পারবে না।' তাঁদের ইচ্ছে—জেনে নেন কী করে পড়ালে ভালো হয়। ঘর ছেড়ে চলে গেলেন তাঁরা, তবে আশ-পাশের ঘরের ছাদের কোণায় বসেছিলেন শুনলাম পরে। অনুবাদের ক্লাস নিলেন তিনি। আমাদের দিয়েই প্রতিশব্দ বলিয়ে এক একটা বাক্যাংশ করিয়ে নিয়ে পুরো বাক্যটি তৈরি করিয়ে দিলেন। এমনি করে অনেকগুলি বাক্যই হয়ে গেল। ক্লাস থেকে বেরিয়ে মনে হল, ইংরাজি একেবারে জানি না কে বলে, বেশ তো বলা গেল। মনে সাহস এল, ভাবলাম এমন কিছু একটা অনুবাদ করতে দিলে একরকম মানানসই তৈরি করা যাবে। তিনি পাঠভবন সম্বন্ধে চিন্তা করতেন ও অবসরমত অধ্যাপকদের এক সঙ্গে ডেকে সে নিয়ে আলোচনা করতেন। সেখানে আমাদের প্রবেশ নিষেধ ছিল, তবে বুঝতে পারতাম সেই আলেচেনার ফল আমাদের অনুকূলেই থাকবে। মনের আনন্দে তাই চলে ফিরে বেড়াতাম। স্বাধীনতা ছিল প্রচুর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকারের দায়িত্ব দিয়ে তিনি ছোটোদের প্রতি অগাধ বিশ্বাস পোষণ করতেন।

আর একটি ব্যাপার ভালো লাগত—বাগানের ক্লাস। এখনকার রান্নাঘরের পেছনে যেখানে জলের ট্যাঙ্ক আছে সেখানে বেশ বড়ো সব্জীর বাগান ছিল। জগদানন্দবাবু ও তেজেশদা মিলে সেই বাগান তদারক করতেন। আমরা ক্লাসের সময় সেখানে কোদাল খুরপি দিয়ে ক্লাস করতাম। সব থেকে ভালো লাগত কাজ করতে শীতকালে যখন বাগানে মটরশুটি আর টমাটো থাকত। ক্লাস শেষে জগদানন্দবাবু বলতেন : 'রান্নাঘর থেকে একজন একটু নুন নিয়ে এসো আর প্রত্যেকে দুটো করে পাকা টমেটো তুলে নাও, কয়টা করে মটরও।' হিরণদির কাছে শুনেছি ঐ বাগানের বাকি তরকারি রান্নাঘরে আসত ঠেকা বেঠোকা চালিয়ে নেবার জন্য। তখন বোলপুরে এত বড়ো হাট জমত না, আর হাট-বার ছাড়া অন্যদিন কিছু সব্জী পাওয়াই যেত

না। আমরা মনে মনে খুশি হতাম, আমাদের পরিশ্রমে তৈরি সব্জী অতিথি অভ্যাগতদের জন্য কাজে লাগে জেনে। তখন অতিথি এলে তাঁকে নিয়ে আশ্রম দেখানো, তাঁর সুখসুবিধা দেখা, রান্নাঘরে যত্ন করে ব'সে খাওয়ানো এসব আমদের উপরেই ভার ছিল পালা করে। আমরা এই কাজ বেশ আনন্দেই করে চলতাম, আমাদের আশ্রম ও পরিবেশ দেখে খুশি হলে গর্ব অনুভব করতাম। কখনও ভাঙা ইংরাজিতে কখনও ভাঙা হিন্দিতে কাজ চালিয়ে নিতাম, অতিথিরা স্নেহভরে ক্ষমা করতেন নিশ্চয়ই। অনেকে কত কত বিস্কিট, লজেন্স দিয়ে যেতেন, সবাই মিলে ভাগ করে খেতাম। মানুষ শুধু পেলেই খুশি হয় না, দিতে পারার মতো তৈরি মনও কিছু সম্বল থাকলে তবেই সে তৃপ্তি পায় গ্রহণে, নইলে সেই পাওয়াটা অসম্পূর্ণ। শিশুকাল থেকে তাই আশ্রমে তার নানা আয়োজন।

এই সূত্রে মনে পড়ে একবার ক্লাস পড়ল শ্রীনিকেতনে। মাঝে মাঝে গুটিপোকার চাষ, আখের ক্ষেত এসব দেখাতে নিয়ে যেতেন মাস্টারমশাইরা—সেখানে সে-বিষয়ে বোঝানো হত, সারাদিন সেখানেই থাকতাম। সন্তোষদার (মিত্র) কাছ থেকে চেয়ে আখ খেতাম। পরে খুব ভালো কৈ মাছের ঝোল, মাছের টক্ খেতে পেতাম, কখনোও মুরগীর মাংস হত। এই বৈচিত্র্য বেশ লাগত। পিঁড়ি পেতে তারকদার তত্ত্বাবধানে ভিজে ঘরে বসে খাওয়া মোটেই ভালো লাগত না। একবার—তখন বর্ষাকাল, আমাদের ধান পুঁততে নিয়ে চললেন মাঠে। মনে ভাবলাম খুব একটা মজা হবে—এক-হাঁটু জল ক্ষেতে, তার মধ্যে তিনজন মেঝেন ধানের চারার আঁটি হাতে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। নেমে পড়লাম, শাড়ি খানিক উঁচু করে কোমরে কাপড় বেঁধে, সবাই মিলে গান ধরলাম 'সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই।' মেঝেন দেখিয়ে দিল কী করে একটি দুটি করে দূরে দূরে পুঁততে হবে। মনে ভাবি খুব সোজা, নিচু হতে গিয়ে দেখি মুখে জল লেগে যাচ্ছে, একটার

বেশি চারা একবারে পোঁতা যায় না। আর ঘোলা জল মুখে লাগতেই একটু ঘেন্নাও করল। তখন চারা আরেকজনার হাতে দিয়ে আঁচলে মুখ মুছি। মেয়েনরা কাণ্ড দেখে খিলখিল করে হাসতে থাকে—ভাবে, এমন মুখ মুছতে গেলে আর ধান পোঁতা শেষ হবে না। বলে 'তাড়াতাড়ি কর কেনে, নইলে এই এতোটা জমি এবেলা শেষ হবে না।' বই পড়া বিদ্যের লুক্কায়িত অহংকার তখন ম্লান হয়ে আসে, মনে ভাবি এই ধান পুঁতে ভাত খেতে গেলেই হয়েছে, কিন্তু ছাড়ি না, সুর ধরি সঙ্গে, 'পারি নাই বা পারি আমরা জিতি কিম্বা হারি, যদি অমনিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই।' মনে করি অনেকদিন লাগবে এ অভ্যেস হতে। চারা খানিক পোঁতা হলে বলল, 'হয়নি, এধার হেলিয়ে পুঁত্তে হবে, নইলে হাওয়ার দোলায় ধানের শীষ যখন ভারি হবে তখন ভেঙে পড়বে জলে।' তাই তো বাতাস সাধারণত সে-সময়ে কোন্‌দিক থেকে বয়ে আসে সেও তো জানা চাই। গুরুদেব তখন শ্রীনিকেতনে তেতলা বাড়ির উপরের ঘরে থাকেন, চারপাশে দিগন্তবিস্তৃত বর্ষার ধানক্ষেত। এখন বুঝি এ তাঁরই ইচ্ছায়। ছেলেরা নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করছে পাঠভবনে, কিন্তু নিজের আশপাশ ও গ্রামের জীবনধারার সঙ্গে পরিচয়ও যাতে থাকে এ তারই চেষ্টা। বিদ্যায়তনে শিক্ষা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকে, যাতে দেশের প্রাণের সঙ্গে তার সমস্যার সঙ্গে যোগস্থাপন করে চলে এ তারই প্রস্তুতি। একদিকে অভিমান ত্যাগ, অন্যদিকে যোগসূত্র স্থাপন। দেশের প্রাণের খোরাক যারা জোগায় তাদের জন্য চিন্তা ও মমত্ববোধ জাগানো।

সেবার ডেনমার্কে গিয়ে দেখি আমাদের নানা পর্ব উপলক্ষে স্কুল ও ইউনিভার্সিটি যেমন ছুটি থাকে তাদেরও তেমনি থাকে। কিন্তু একটি বড়ো ছুটি থাকে শস্য তোলার জন্য। বিজ্ঞানের ছাত্র থেকে আরম্ভ করে ডাক্তারি পড়া ছাত্র অবধি তখন গ্রামে চলে যায় গম, আলু ও বিট-এর ফসল তুলতে।

শুনলাম শিক্ষিত সমাজের কাছে চাষীরা এই সহযোগ ও সহকর্ম

দাবি করে থাকে। আধুনিক নগর পত্তনের সমস্ত সুযোগ সুবিধা শিক্ষিত সমাজই ভোগ করে আর তার জোগান দেয় চাষীদের অক্লান্ত পরিশ্রম। প্রতিদানে চাষীরা চায় সভ্যতার আরামবিরাম ; সংস্কৃতির ভিত্তিকে যে তারাই টিঁকিয়ে রাখছে, ভবিষ্যৎ নাগরিকরা যেন সে সম্বন্ধে সচেতন থাকে। বৎসরান্তে একবার যেন তারাও এসে চাষীদের কাজে হাত মিলিয়ে কাজ করে। কলেজের ছাত্ররা যখন এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ছুটিতে গ্রামে যায় তখন চাষীরা তাদের নিজের ঘরে রেখে যত্ন করে খাওয়ায়। ছাত্ররা খুশি হয়েই তাদের টানে গ্রামে গিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে। ভাল খেয়ে ও পরিশ্রম করে তারা সুস্থ শরীর সতেজ মন নিয়ে সহরে ফিরে আসে। চাষীদের সমস্যাগুলো তাদের মনে ক্রিয়া করতে থাকে—তার থেকেই এই জাগরোন্মুখ ছাত্রদের দ্বারা নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবনও হয় বিজ্ঞানের জগতে। এই যোগস্থাপনের চিন্তাকে ভিত্তি করে তাদের গণ-মহাবিদ্যালয়ের পত্তন। আজ আমাদের দেশেও জনসাধারণের যোগ-স্থাপনের চেষ্টা চলেছে নানাভাবে।

এইসব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আজ বুঝতে পারি গুরুদেবের দূরদৃষ্টি ও শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারা ও বাস্তবক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ব্যবস্থার কথা। যখন ছাত্রী ছিলাম, তখন কিছুই বুঝতে পারিনি, কিন্তু আশ্রমজীবনে অজ্ঞাতসারে নানারকমের কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হতে থাকত। যেন, হাসিখেলার ভিতর দিয়েই সহজভাবে এইসব শিক্ষা ঘটেছে। কখনো জরুরি কাজে ডাক পড়লে ইতস্তত করা দূরে থাক, খুশি মনে সকলে মিলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তাম সেখানে।

একবার ৭ই পৌষের মেলায়—৬ই পৌষই হবে—আত্মীয়দের মধ্যে কয়েকজন এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে বন্ধুদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর এটা-সেটা কিনছি—এমন সময় দুটি মেয়ে এসে বলল : 'রান্নাঘরে এক্ষুনি হিরণদি ডাকছেন, খুব জরুরী দরকার।' আত্মীয়দের রেখে তখনই চললাম সেখানে। গিয়ে শুনি ভুবনডাঙার ঝি'রা ধর্মঘট করে কেউ কাজে আসেনি। আগের দিনের রাত্তিরের

স্তূপীকৃত বাসন পড়ে আছে—ওগুলো মাজা না হলে ঠাকুররা কাজ আরম্ভ করতে পারছে না। ইতিমধ্যে ধীরেনদা (সেন) খবর পেয়ে চলে এলেন জনা ৬।৭ ছেলে নিয়ে। তারাও প্রায় আমাদের সমবয়সী। হিরণদি দেখিয়ে দিলেন কী করে ঝি'রা বাসন মাজে। শাড়ি, ধুতি বেশ উঁচু করে নিলেও ছাইমাখা হয়ে গেল সে সব। ধীরেনদা বললেন: 'চারপাশে অতিথি, তাঁরা যেন টের না পান আমাদের এমন অসুবিধার অবস্থা এখন, তা হলে তাঁরা অপ্রস্তুত বোধ করবেন; স্নান করে এসে আবার পরিবেশন করি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে সুনাম যাতে রক্ষা হয়। দ্বিতীয় দিনে ধীরেনদা এক সহজ উপায় বের করে নিলেন বাসন ধোবার। প্রথম ঠাণ্ডা জল, পরে সাবান গরমজল আর তার পরে শুধু গরমজলে ডুবিয়ে সব মুছে রাখা থাকল টেবিলের উপর। আটজন ছেলেমেয়ে হলে ৫০০ থালা গ্লাস বাটী ৪৫ মিনিটের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যেত আর আমাদের কাপড়-চোপড়ও পরিষ্কার থাকত। এমনি করে তিনদিন চালাবার পর ঝি'রা বুঝল এদের ঠেকা নেই তত; তাই পরের দিন থেকে বিনা অপত্তিতে এসে কাজে যোগ দিল। ঝি'রা আসতে থাকলেও আমরা পালা করে সেই কাজ বহুদিন চালিয়ে নিয়ে চলেছিলাম।

এতে করে ঝি'রা আর গোলমাল করার সুযোগ পেল না। আমরাও বুঝলাম আত্মনির্ভরশীল থাকার মতো ইচ্ছা ও অভ্যাস থাকা মস্তবড় বল। এই প্রসঙ্গে আর একটি ছোট্ট কথা মনে পড়ল—আমরা যে কয়জনা আত্মীয়দের সঙ্গে নানাপ্রকারের জিনিসপত্র কিনে ও মিষ্টি খেয়ে বেড়াচ্ছিলাম তারাই যখন রান্নাঘরে কাজের সময় অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ব্যস্ততার সঙ্গে দায়িত্ব নিয়ে পরিবেশন ইত্যাদি কাজ করছিলাম তখন আত্মীয়দের মধ্যে একজন আস্তে বলে উঠলেন: 'এখন এদের দেখলে কি বলবে, সকালে এরাই ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে মিষ্টি খেয়ে বেড়াচ্ছিল।' সময়বিশেষে ও কার্যক্ষেত্রে এই গাম্ভীর্য ও দায়িত্বজ্ঞানটুকু মাস্টারমশাইরা আমাদের কাছ থেকে আশা করতেন যথেষ্ট প্রীতি ও মর্যাদা দিয়ে। অক্লান্ত পরিশ্রম ও

সহায়তা তাঁরা পেতেন। আশ্রমের মর্যাদা রক্ষার জন্য ছোটো-বড়ো সকলেরই একান্ত আগ্রহ।

আশ্রমের দৈনন্দিন কাজকর্মে স্বাবলম্বন শিক্ষা দেবার যে অভিপ্রায় গুরুদেবের আদর্শ ছিল, তাতে কিভাবে তিনি আমাদের দীক্ষিত করে তুলছিলেন, ভাবলে অবাক হতে হয়। এখন বুঝতে পারি 'আশ্রমের শিক্ষা' সম্বন্ধে তাঁর লেখার তাৎপর্য।

তারপরে আশ্রমে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কথা। মনে পড়ছে কাদম্বরীতে একটি বর্ণনা—তপোবনে আসছে সন্ধ্যা, গোষ্ঠে ফিরে আসা পাটল হোমধেনুটির মতো। শুনে মনে জাগে, সেখানে গরু চরানো গো-দোহন, সমিধকুশ-আহরণ, অতিথি পরিচর্যা, যজ্ঞবেদী রচনা—আশ্রম বালকবালিকাদের নিত্যকৃত্য। এইসব কর্মপর্যায়ের দ্বারা তপোবনের সঙ্গে নিরন্তর মিলে যায় তাদের নিত্যপ্রবাহিত জীবনের ধারা। সহকারিতার সখ্য বিস্তারে আশ্রম হতে থাকে প্রতিক্ষণে আশ্রমবাসীদের নিজহাতে রচনা। আমাদের আশ্রমে সতত উদ্যমশীল এই কর্মসহযোগিতা কামনা করছি।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও বিচিত্র কর্মধারার ফাঁকে ফাঁকে ঋতু-উৎসব সংবর্ধনা-উৎসব, ৭ই পৌষ. শ্রীনিকেতনের উৎসব ইত্যাদি উপলক্ষে তার আয়োজন ও নূতন নূতন নাটকের রিহার্সেলগুলি আনন্দের ধারা বয়ে আনত। আমরা উৎসবের অমৃতরসধারা পান করে নূতন উদ্দীপনা নিয়ে আবার নিত্যকর্মের মধ্যে প্রবেশ করতাম। প্রত্যেকটি উৎসবে মাস্টার মশাই (নন্দলাল বসু) ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সাজসজ্জা ও আয়োজনের ব্যবস্থা করতেন। তাঁরা নেশায় মেতে সারাদিন ধরে আনন্দের সঙ্গে তাকে নূতন রূপ দিতেন। আমরা সঙ্গে মালা ইত্যাদি গেঁথে দিয়ে সাহায্য করতাম উৎসব-সমারোহে। উৎসব শেষে এই মাস্টার মশাই ক্ষিতিমোহনবাবু ও শাস্ত্রীমশাইকে দেখেছি বার বার নিজের কাজে মগ্ন হয়ে বসে আছেন। এতে করে আনন্দ উপভোগ ও কর্তব্য পালন দুইয়ে মিলিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখার দৃষ্টান্ত দেখেছি। মানুষের জীবনে কাজের মধ্যে আনন্দের জোগান না থাকলে সেটি

নীরস হয়ে সজীবতা ও প্রাণের আবেগকে হারিয়ে ফেলে। গুরুদেব তাঁর বিচিত্র কাব্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে নাচ গান ও সমগ্র শিল্পকলাকে নূতন সৃষ্টির নূতন সম্ভাবনার পথে প্রেরণা জুগিয়েছেন। তিনি মানতেন, মানুষের সুরুচিবোধ ও সূক্ষ্ম রসানুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে নৃত্য, গীত প্রধান সহায়, তাই ব্যক্তিত্ব স্ফূরণের প্রথম ধাপে তিনি এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী পরিচয় সাধনের ক্ষেত্র রচনা করেন নানা প্রকারে। আশ্রমের উৎসবগুলি ছিল তার কেন্দ্র। অবনীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁর প্রথম অভিভাষণে বলেছিলেন ঃ 'আমি প্রথম কথাই বলেছি আশ্রমের উৎসবগুলি যেন বন্ধ না হয়। অমৃত পরিবেশন করে গেছেন তিনি এখানে, এই জেনে নির্ভর হও—আনন্দে থাকো। এই আনন্দলোক হচ্ছে আশ্রমেরই প্রাণলোক।'

চালচলন, বেশভূষা, কথাবার্তা—সব দিক থেকেই যাতে একটা সুরুচিসম্পন্ন শালীনতার প্রকাশ পায় এদিকে মেয়েদের সযত্ন দৃষ্টি ছিল। কোথাও যেন আতিশয্য এসে না পড়ে সে কথা সকলেই মনে রাখতেন। উৎসব ছাড়া আমরা সর্বদা সাদা শাড়িই পরেছি। সাজের মধ্যে ছিল বিকেলে স্নান করে বেড়াতে যাবার সময় মাথায় ফুল ও কপালে টিপ দেওয়া। অহেতুক সাজ পোশাকের উগ্রতা মানুষের মধ্যে মাদকতার দোষ এনে দেয় এবং তাকে বর্জন করে চলাই যে যথার্থ সংস্কৃতির পরিচায়ক, একথা গুরুদেবের আশ্রম থেকে আমরা মনের রুচি ও সহজ অভ্যাসের ভিতর দিয়েই জেনেছি।

স্কুলে পড়াশুনার ব্যাপারে ছেলেদের সঙ্গে একই বিষয় শিখেছি ও আলোচনা করেছি। কাজের বেলায়ও বহু ক্ষেত্রে এরকম ছেলেদের মতো একই সঙ্গে কাজ করে গিয়েছি। মেয়েরা অধিকাংশ কাজেই সমানভাবে এগিয়ে চলতে পারে এ ধারণা উভয়পক্ষের মনে অত্যন্ত সহজ ছিল। স্বাধীনভাবে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে চলতে চলতে স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা গড়ে ওঠে ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে চলার মতো শক্তি সঞ্চয় হয়ে থাকে। এমনি করে একে অন্যকে ভালবাসা দিয়ে, মমতা দিয়ে,

দায়িত্ব ও শ্রদ্ধা দিয়ে বেড়ে ওঠাতে পরিবেশটি ছিল অত্যন্ত সহজ সুন্দর ও আনন্দে পরিপূর্ণ। স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে ভাবনা গুরুদেবের মনে ছিল সর্বদাই। তিনি বলেছেন যে, জ্ঞানার্জনে স্ত্রী-পুরুর উভয়েরই সমান অধিকার ও দাবি আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও চিন্তা করেছেন যে বিধাতা গোড়াতেই মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক যে স্বাতন্ত্র্যটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাকে জীবনের ক্ষেত্রে উপযুক্তরূপে কাজে লাগানোর মতো শিক্ষার প্রয়োজন আছে। তাই সেই সঙ্গে তিনি কারুশিল্প, গান, নাচ, চিত্রকলা এসব শেখানোর ব্যবস্থা করলেন। আজ সে-সব সংগীতভবন, কলাভবন, শ্রীনিকেতন কারিগরী বিভাগে নানা চারু ও কারুকলা চর্চায় সুনিয়মিত রূপ নিয়েছে। মেয়েদের স্বভাবের মধ্যে ভালবাসার অংশ বেশি আছে, তাই সে সন্তানকে স্নেহ দিয়ে মানুষ করে ; সংসারকে ভালবাসা ও প্রীতি দিয়ে মধুর করে একটি জগতের সৃষ্টি করে রাখে। সেই জগতে যাতে দীনতা না আসে, মনের গ্লানি এসে যাতে তাকে মলিন না করে, সেখানে যাতে সর্বদাই একটি প্রীতিময় প্রাণের স্পর্শ থাকে এবং আবেষ্টনটি মধুর হতে মধুময় হয়ে ওঠে সে জন্যই এই নানা শিক্ষার আয়োজন। যেখানে উদার দৃষ্টি ও ক্ষমা আছে, সেখানে শান্তি বিরাজ করে। জ্ঞান দ্বারা জগতের মহান আদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ পেয়ে মেয়েরা উদার মনোভাব নিয়ে সংসারে যা কল্যাণকর তাকেই বরণ করে নেবে এই ছিল তাঁর আশা। স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়ে সে 'তার পুরুষের সংকটের সহায়, দুরূহ চিন্তার অংশী এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারে তাহার সহযাত্রী হইবে।'

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়   হিমাংশুপ্রকাশ রায়

ব্রহ্মচর্যাশ্রম ছিল রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের গোড়াকার নাম। সেই প্রথম যুগে আমি সেখানকার শিক্ষাদানের কার্যে ভর্তি হই। ছাত্রদের সংখ্যা একশো পাঁচ (১০৫), আর শিক্ষকদের সংখ্যা পঁচিশ—এই মতো। দু-চারজন শিক্ষক মোটা বেতন পেতেন। এ ভিন্ন অন্য সবাই ছিলেন বিশ-পঁচিশ টাকার মধ্যে। আমি পড়েছিলাম দ্বিতীয় শ্রেণীতে, কিন্তু এতে আমার ক্ষোভ ছিল না, যেহেতু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকাটাকেই আমার পক্ষে আমি পরম সম্পদের বস্তু বলে মনে করতাম। আর যাঁরা ছিলেন আমারই দলের তাঁরাও তাই মনে করতেন।

শিক্ষাদানের কোনো গৃহ ছিল না সে সকলেই জানেন। বিদ্যালয় বসত গাছের তলায় মুক্ত মাঠে, খোলা আকাশের নীচে। থাকার মধ্যে ছিল কেবল প্রত্যেকটি ছাত্রের একটি করে নিজস্ব কম্বলাসন, শিক্ষক মহাশয়দেরও তাই। ঘণ্টা পড়লে আসন হাতে ক্লাসে গিয়ে বসা হত। ক্লাসকে বলা হত গ্রুপ (Group), লিখবার বোর্ড (Board) দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হত বৃক্ষকাণ্ডে, স্থূল পেরেক বিদ্ধ করে। গ্রুপ বসত দু'বেলা—সকালে ও বিকালে। দুপুরবেলা ছিল বিশ্রামের বেলা—নিদ্রার নয়। সকালে বিকালে যে পড়া হত, তাতেই হত পড়ার শেষ। ঘরে কেউ পড়ার বই পড়ত না, পড়ত গল্পের বই। খবরের কাগজ। দেখত ছবির বই। লিখত হাতের লেখা।

সন্ধ্যার পর হত যে সব ক্লাস তাতে হত গান-বাজনা, গল্প, আবৃত্তি, অভিনয় এই সব। তর্ক-বিতর্ক সভাও চলত, তারও ছিল ক্লাস (Class)। বাইরে থেকে কোনো ছেলে আসত না পড়তে। যারা পড়ত তাদের ওখানেই থাকতে হত প্রত্যেক ঘরে যেমন ছাত্ররা থাকত ;

সেই সঙ্গে শিক্ষক মহাশয়রাও থাকতেন। তাঁরাও কেউ বাইরে থেকে আসতেন না পড়াতে। কোনো ছাত্রী পড়ত না তখনকার দিনে, কোনো শিক্ষয়িত্রী ছিলেন না। দশ বৎসরের উর্ধ্বে কোনো ছাত্রকে ভর্তি করা হত না। সবাইকে উঠতে হত রাত না পোহাতে রাতের শেষভাগে ঘণ্টার ধ্বনিতে।

শিক্ষায়তনে পায়খানা ছিল না দুই একটি ভিন্ন, কিন্তু তা ব্যবহৃত হত অসুস্থ হলেই—নইলে সবাইকে যেতে হত মাঠে, ঝোপে ঝাড়ে খোয়াইয়ে। সেই ছিল প্রথা। এই প্রথাই পালন করতে হত শিক্ষক মহাশয়দেরও। অন্ধকার থাকতে থাকতেই প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে স্নান হত ইঁদারার জলে খুব ভোরে, শীত ঋতুতেও। গরম জল মোটেই ব্যবহার হত না। ছেলেরা নিজেই জল তুলত, ভৃত্য ছিল বটে; কিন্তু ছেলেরা নিজেরাই জল তুলত, ভৃত্যরা এ কাজে আসত না নেহাৎ প্রয়োজন না হলে। ছোটো ছেলে যারা জল তুলতে বল পেত না তাদের জল বড়োরাই তুলে দিত। যেমন জল তোলা তেমনই কাপড় কাচা—নিজেদের হাতেই সব। শিক্ষক মহাশয়গণও করতেন তাই।

স্নানের পরই জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। সকাল বেলায় কোনদিন ভেজান ছোলা (গ্যাজ উঠা) কিম্বা ভেজান কাঁচা মুগের ডাল, এখো গুড় কিম্বা আদা নুন দিয়ে খেতে হত। কখনো বা মোহনভোগ, কোনদিন বোঁদে, কোনদিন জিবে গজা, সব শেষে দুধ।

বিকালেও জলখাবার ছিল বোঁদে কি গজা কি মোহনভোগ। এদের যদি কোনটাই না হত তবে হত লুচি—সঙ্গে কিছু একটা ভাজি। দুধ থাকত না বিকেলে। দুবেলা দুধের জোগাড় করা কঠিন।

বুধবার বিদ্যালয় বসত না—থাকত বন্ধ। এখনো থাকে তাই। এ তো সবারই জানা কথা। কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে মন্দিরে প্রবেশের দরজার উপরকার লৌহ খিলানের মধ্যস্থলে একটা বৃহৎ ঘণ্টা ছিল (Gong) একথা অনেকেই জানেন না। গুরুদেব শিক্ষক

ও ছাত্রদের আহ্বান করতেন উপাসনায় যোগ দিতে Gong-টিকে নিজের বলিষ্ঠ হাতের জোরে টেনে বাজিয়ে পাঁচ সাত মিনিট ধরে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি গ্রুপ-পদ্ধতির কথা। এখনো কিঞ্চিৎ এর ব্যাখ্যা দিই। ধরা যাক পঞ্চম গ্রুপের কোনো একটি ছেলে বেশ এগিয়ে চলেছে ইংরাজিতে, উপযুক্ত রকমের পাকা। কিন্তু অঙ্কের বেলায় দেখা গেল বড়ো বেশি রকমের পিছিয়ে আছে সে। তাই অন্যদের সঙ্গে পা ফেলে চলা তার পক্ষে মহা একটা দায়। সুতরাং এর বেলায় তাকে গিয়ে বসতে হত নীচের গ্রুপ-এ।

তাকেই, ইংরাজীতে অত্যন্ত পাকা বলে ঠিক করায় ঐ পঞ্চম গ্রুপ-এ, তাকে তুলে দেওয়া হত ইংরাজির বেলায় ষষ্ঠ গ্রুপ-এ। এই ওঠা-নামার ব্যবস্থা ছিল ছাত্রদের—যাযাবরের বৃত্তি ছিল তাদের। কেবল তারাই স্থির হয়ে থাকত গ্রুপ-এ যারা সকল বিষয়গুলিতেই সহজে চালিয়ে নিতে পারত নিজেদের।

এইভাবে গ্রুপ থাকার দরুণ এই সুবিধা ছিল যে, ছাত্ররা অক্লেশে দৈনন্দিন পাঠ শিখে অগ্রসর হতে পারত। আর যারা পড়াতেন, শিক্ষক মহাশয়গণ তাঁরাও পড়িয়ে বেশ আনন্দ ও তৃপ্তি পেতেন—এই ধরনের ছাত্রদের একত্র পেয়ে।

অন্য সকল বিদ্যালয় হতে এখানকার এই গ্রুপ বিদ্যালয়ে আর একটি প্রভেদ ছিল যা পূর্ণ মাত্রায় ভিন্ন। পড়া বলতে না পারলে, পড়ায় মন না দিলে, অমনোযোগী হলে, কোনো প্রকার দুষ্টুমি করলে শাস্তিটা হত মহা আশ্চর্য রকমের। একটি অপরাধীকে মিষ্টি কথায় তার অন্যায়টা বুঝিয়ে দেওয়া হত। ধীরভাবে বলা হত—দেখ, তোমার কাজটা ভালো হচ্ছে না।

বেত মারা তো ছিলই না; কোনো প্রকার মারধোর কান মলামলি, এমন-কি বকুনিটুকু পর্যন্ত ছিল না।

তবে শাস্তি ছিল অন্য ধরনের—সে এক অভিনব শাস্তি। প্রত্যেক বাসগৃহে একটি করে প্রধান ছাত্র (Monitor) থাকত অপর সকল ছাত্রদের নায়ক হয়ে। সব রকম নালিশ তাকেই শুনাতে হত এবং

সে-ই মীমাংসা করত। তার মীমাংসাটাকেই সবাইকে মাথা পেতে নিতে হত। Monitor বলত—একবেলা ঝাঁট না দিয়ে আজ তোমাকে দুবেলাই ঘরখানিকে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। শিক্ষক মহাশয়ের স্নানের কাপড়খানা আজ তুমিই কেচে দেবে—উনি কাচবেন না। ধোপা এলে এবারে তোমাকেই কাপড়গুলি গুনে মিলিয়ে নিতে হবে। এতে আমি হাত দেব না। এই রকম আরো কত কি ভার চাপত ঘাড়ে।

ঘরের যা কিছু উপদ্রব—ঝগড়া-ঝাঁটি, নালিশ তা এসে সহজে পৌঁছত না শিক্ষক মহাশয়দের কাছে, তাঁরা আরামে থাকতেন অনেকটা। প্রতি মাসেই পরিবর্তন ঘটত Monitor-এর; নির্বাচন করত ছাত্রগণই নূতন নায়ককে (Monitor) অধিকাংশের মতে।

সকালে বিকালে জলযোগের পর আসন হাতে এখানে ওখানে সেখানে মাঠে গাছতলায় সবাই গিয়ে বসত। স্থির হয়ে থাকত কোনো কিছু কথা না বলে অর্ধঘণ্টা কাল। তারপর ঘণ্টা পড়লে সবাই মিলে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সমস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করত, সময় সময় সকালে গুরুদেব দাঁড়াতেন শ্রেণীর শীর্ষদেশে। উচ্চারণ করে যেতেন মধুর উদাত্ত কণ্ঠে 'ওঁ পিতা নোঽসি। পিতা নো বোধি।' আর সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিয়ে চলত ছাত্রগণ। বিদ্যালয়ের কোনো গৃহ না থাকায় অল্পসল্প বৃষ্টিতে ক্লাস বসত ঘরের বারান্দায়। কিন্তু যখন বেশি হয়ে মূষলধারে নাবত, তখন ক্লাস হত বন্ধ। তখন সবাই মিলে গুরুদেবের বর্ষার গান গাইতে গাইতে আর নাচতে নাচতে ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে খেলা করতে করতে চলত মাঠের মধ্য দিয়ে, কখনো বা সবাই মিলে ঠেকত গিয়ে কোপাই নদীর উঁচু ডাঙায়। কী স্ফূর্তি! কী স্ফূর্তি! সঙ্গে শিক্ষক মহাশয়রাও কেউ কেউ থাকতেন।

সময় সময় স্বয়ং গুরুদেবও ঐ ঝড় বৃষ্টি, এই ভেজার খেলায় যোগ দিয়ে চলতেন নৃত্যে মত্ত হয়ে কণ্ঠে গান নিয়ে :

আজ বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে
আকাশ ভাঙা আকুল ধারা কোথাও না ধরে।

একদিন আমি একাকী তাঁর দ্বিতল ঘরে বসেছিলাম, গুরুদেব আমাকে কথায় কথায় ছেলেদের উপাসনায় বসা সম্বন্ধে একটি গল্প বললেন, সেইটি বলি।

কোনো একদিন কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক এসে এখানে কাটিয়ে যান কিছুদিন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: 'ছেলেরা যে উপাসনায় বসে দু'বেলা, এর কি সার্থকতা হতে পারে? ছেলেরা তো তখন কত কি ভাবতে পারে। কত খেলার কথা, কত কি দুষ্টুমির কথা। উপাসনার তারা কি বোঝে?'

গুরুদেব তাঁকে উত্তরে বললেন: 'হ্যাঁ, তা হতে পারে আপনি যা বললেন, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি—এই অনন্ত আকাশের মাধুর্য, এই বিস্তীর্ণ প্রভাত সন্ধ্যার গাম্ভীর্য একদিন না একদিন তাদের মনকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করে নেবেই নেবে। তারা দুষ্টু মানুষ হয়ে বেড়ে উঠতে থাকবে না। উঠবে তারা—সত্য ন্যায়ে ও ধর্মে একটি সমগ্র পরিপুষ্ট মানুষ হয়ে।'

পনেরো দিন অন্তর অন্তর আমরা সমবেত হতাম শান্তিনিকেতনের দ্বিতল গৃহে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে। তিনি একে একে আমাদের প্রত্যেকটি ছাত্রের প্রতিটি বিষয়ে কে কেমন চলছে, তাদের চাল চলনই বা কেমন দেখছি আশ্রম মধ্যে, এই সব জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়ে তারপর এসবের সংশোধনের পথ নির্দেশ করে দিতেন।

জগদানন্দ রায় মহাশয় ছিলেন শিক্ষায়তনের প্রধান শিক্ষক। সেদিন তিনি বসেছিলেন গুরুগম্ভীর মুখ নিয়ে, তাই না দেখে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন: 'জগদানন্দ, তোমার কি বক্তব্য আছে বল তো, শুনি। আজ এত গম্ভীর যে?'

—'আর কি বলব গুরুদেব; ছেলেদের বড্ডই বাড়াবাড়ি হয়েছে। তারা অঙ্ক কষে না—কষতে চায় না, কেবল আপনার সাহিত্য নিয়েই মত্ত। আমি যেই না বলেছি গণিতে মন দাও, ও শাস্ত্র না শিখলে কি মানুষ হওয়া যায়? আর অমনি ওরা সবাই অবাক করে লাফিয়ে উঠে

উত্তর দেয় কি—কেন, আমাদের গুরুদেব? তিনি কী আর মানুষ হন নি? আমি পড়াচ্ছিলাম প্রথম শ্রেণীতে তখন।'

—'কী। এমন কথা তোমার মুখের উপর বলতে সাহস পেল ছেলেরা? বল কী? জগদানন্দ, আচ্ছা তুমি এক কাজ কর। তোমায় একটা কথা বলি শোন—

—'আমার যে এত বয়স হয়েছে, যে বিষয়ে আমি রস পাই না সেদিকে আমার মন যায় না, রসই মনকে আকর্ষণ করে। আমার সাহিত্যে যে রস আছে তা অপেক্ষা বৃহত্তর রস তুমি সৃষ্টি করে যাও দেখি তোমার গণিতশাস্ত্রে? যদি পার তবেই দেখবে আমার সাহিত্যকে কোপাই নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওরা তোমার পণ্ডিতশাস্ত্রকেই আঁকড়ে ধরবে।'

শুনে তো আমরা অবাক। সবাই একেবারে থ হয়ে রইলাম। একে অন্যের মুখের দিকে তাকাই। আর মনে মনে বলি কবিজনোচিত উত্তরই বটে। জগদানন্দবাবুর নালিশ শুনে আমরা অপেক্ষা করছিলাম খুব বড়ো রকমের একটা শাস্তি দেবার কথা উনি নির্দেশ করবেন। কিন্তু তা হল না।

সেদিন বসেছিলাম শান্তিনিকেতন গৃহের দ্বিতল কক্ষে। নিম্ন-শ্রেণীর এক শিক্ষক মহাশয় বললেন: 'গুরুদেব, আমগাছে, জামগাছে, শালগাছে মহা এক দৌরাত্ম্য চলেছে ছেলেদের। প্রচণ্ড রকমের একটা শাস্তির প্রয়োজন।'—উত্তরে শোনা গেল—'ভাঙুক গাছের ডাল-পালা। আশ্রম ভাণ্ডারে আমার এত গাছ আছে যে সে সবার ডাল-পালা ভাঙতে ভাঙতে হয়রাণ হয়ে পড়বে শেষকালটায়। তখন নিজেরাই জব্দ হয়ে ক্লান্ত হবে। অন্য হাতের শাস্তির প্রয়োজন হবে না। ছেলেরা তো লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি কুঁদোকুঁদি করবেই। স্বভাব যাবে কোথায়! ওটা যে ওদের চরিত্রগত ধর্ম। ওরা তো আর বুড়ো হয়নি আপনাদের মতো। ওরা যে ছেলেমানুষ তা ভুললে চলবে কেন?'

আমরা হলাম অবাক। কেমন সরল সহজ সহনীয় কথা মুখ দিয়ে বার করলেন তিনি!

একদিন আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ জানায় মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য ছাত্ররা। তাতে তিনি প্রসন্ন মনে সম্মতি দেন। সেদিন ছাত্ররা মনে করল আজ আর শালপত্রে আহার নয়—আহার হবে গুরুদেবের সঙ্গে বসে পদ্মপত্রে। কেবল তাঁকেই ঐ পত্র দিলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন, এই ভেবে ছেলেরা দলবদ্ধ হয়ে রওনা হল কোপাই নদীতে পদ্মপত্র সংগ্রহ করতে। পাচক ব্রাহ্মণ এবং ভৃত্যদের জানিয়ে দিয়ে গেল নিমন্ত্রণের কথা। বলেছিল পরিশ্রম করে নানাবিধ পদ রাঁধবার দরকার নেই, সাধারণ রান্না হবে, যেমন প্রতিদিন হয়ে থাকে আমাদের সেই মতোই হবে। এর অন্যথা হলে খাবেন না, আসবেন না—বলেছেন গুরুদেব।

আহারের ঘণ্টা পড়লে গুরুদেব তাঁর দ্বিতল কক্ষ হতে যথা সময়ে নেবে আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়েই গোল স্প্রিং আঁটা চশমার ভিতর দিয়ে ছুটি ডাগর ডাগর উজ্জ্বল জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে বলে উঠলেন: 'একি, এ কেন? শালপাতা কোথায়? শালপাতা পদচ্যুত হয়েছে দেখছি আজ পদ্মপাতার ঠেলায়, কেন? তোমাদের গুরুদেব কি আর শালপাতায় খেতে পারেন না?'

গুরুদেবের মধুর কণ্ঠের ভর্ৎসনাটুকু সবার মনে বড়ই মিষ্টি লাগল—সম্ভোগের সামগ্রী হল।

ছুটি মোড়ল ছাত্র উত্তরে বলেছিল—'গুরুদেব, ঐ পদ্মপত্রই যা করেছি বিশেষ। কিন্তু, কোনো বিশেষ করিনি আহার সামগ্রীতে।' শুনে গুরুদেব বললেন: 'তা বেশ করেছ। ভালোই করেছ। তোমরা বাহাদুর বটে! বাহাদুর নম্বর 'ওয়ান'—চিন্তাটিকে দৌড় করিয়েছ কোপাই তক্। আর বাহাদুর নম্বর 'টু' আহার্যটিকে অভিন্ন করেছ, গুরুশিষ্যের একই আহার—সহজ পথে গেছ।'

ঐ দিনের অপরাহ্ণে গুরুদেব আমাদের কাছে বলেন কবি 'সত্য'কে জানেন। দার্শনিকও সত্যকে জানেন। তিনি যুক্তি দ্বারা সেই সত্যকে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হন, যুক্তিকে আঁকড়ে ধরেন। কিন্তু কবির কোন যুক্তি নেই। তাঁর কাছে অন্তর্দৃষ্টি সত্যকে দেখার। সেই দৃষ্টিতে

দার্শনিক আসেন যখন, তখন তিনিও হন কবি। সেই সত্যকে দেখাই আদিকে দেখা, জগৎকারণ ব্রহ্মকে দেখা।

পৌষের দুরন্ত হাড়ভাঙা শীত। মোজা নেই, চটি পায়ে, সাদা পাঞ্জাবীর উপর সাদা চাদর জড়িয়ে, লণ্ঠন হাতে, রাত তিনটে সাড়ে-তিনটেয় গুরুদেব চলেছেন মন্দির অভিমুখে ধীর পদক্ষেপে, বসলেন গিয়ে পুব বারান্দায়। ভোর হয় হয় এমন সময় তাঁর ডানে বাঁয়ে দুই সার দিয়ে বসলে পর গুরুদেব তাঁর স্বাভাবিক অনর্গল কবিত্বপূর্ণ অলিখিত ভাষায় তত্ত্বকথা ব্যক্ত করে যেতেন, দিনের পর দিন। সেই সব ধর্ম-কথাই পরে নানা খণ্ডে প্রকাশ পায় শান্তিনিকেতন নাম নিয়ে।

. যে সব রোগী অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ খেতে নারাজ, তাদের গুরুদেব তাঁরই হাসপাতালে তাঁরই নিযুক্ত ডাক্তারবাবুর অনুমতি নিয়ে হোমিওপ্যাথি বাক্স থেকে ঔষধ বেছে খেতে দিতেন।

একবার দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ সাহেবের আশ্রমে Asiatic cholera হয়। তাতে গুরুদেব এক ডোজ ঔষধ দিয়েই দ্বিজেন্দ্রলাল মৈত্র মহাশয়কে তার করে পাঠালেন—Come sharp with your necessary instruments and medicines, Andrews is seriously ill being attacked with Asiatic cholera.

দ্বিজেন্দ্র মৈত্র এলেন, এসেই জিজ্ঞেস করে সব জানলেন এবং রোগীকে দেখে বললেন : 'গুরুদেব, আপনার ওষুধ ধরেছে, এখানে থাকার আর কোনো প্রয়োজন নেই। আমার বিস্তর কাজ রয়েছে হাসপাতালে, আমি ছুট দিই এই এর পরের ট্রেনে।'

কলকাতায় আমি আমার বন্ধুর বাটীতে অনেক হোমিওপ্যাথি ঔষধের মোটা মোটা বই দেখেছি গুরুদেবের দেওয়া।

বেশ বেলায় একদিন বসে আছি গুরুদেবের ঘরে। তিনি গল্প করছেন আমার সঙ্গে, এমন সময় সিঁড়ি বেয়ে হুড়হুড় শব্দে উঠে এল একদল ছেলে। গুরুদেব তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—'কি চাও তোমরা ?'—'আমাদের মাসিক পত্রিকার সমস্ত লেখা হয়ে

গেছে, প্রথম পৃষ্ঠাখানি রেখে দিয়েছি আপনার জন্যে, একটা ছোটো কবিতা নেব বলে।'—'কবিতা নেবে? বেশ তো। ভালো কথা, একটি ছোটো কবিতা? আরো ভালো।'

এই না বলে তাদের হাত থেকে পত্রিকাখানি টান দিয়ে নিয়ে ফস্ ফস্ ফস্ করে লিখেই বললেন: 'ধর, এই নাও।'

আমি তো অবাক। একি কাণ্ড গুরুদেবের। এদিকে ছেলের দল লেখা পেয়ে উল্লাসে দিল এক ছুট। আমরা ভেবেছিলাম গুরুদেব বলবেন—আচ্ছা, বেশ—রেখে যাও পত্রিকাখানা সময়মত পরে লিখে দিচ্ছি।

সংগীতগৃহে বসে গুরুদেব ছেলেদের শিক্ষা বিষয়ে কিছু কথা বলেছিলেন—'আমার মত হচ্ছে, ছেলেদের ছোটো মনে করে তাদের উপেক্ষা করলে চলবে না। এটা বুঝবে না ওটা বুঝবে না, এটার কিছু ছাঁটাতে হবে, ওটার কিছু বলতে হবে চেপে, উপমাটি বেশি করে বুঝতে গেলে চলবে না, রূপকটিকে একদম বাদ দিয়ে ডিঙিয়ে যাব, কলির সৌন্দর্য বুঝাব না, অতএব ব্যাখ্যা করা পণ্ডশ্রম মাত্র—এভাবে পড়ান অতিমাত্রায় খারাপ। যতটা বলার আছে সবটাই বলতে হবে। একথা অতি ঠিক, তারা সবটাই বুঝবে না। কিছু বোঝা না বোঝার মধ্য দিয়েই মন গড়ে ওঠে। বালকদের পড়াবার মধ্যে এমন একটি পদার্থ (Element) থাকা আবশ্যক যা তারা বুঝবে না, যা বুঝল তদ্দ্বারাই অবোঝাটার দ্বারে গিয়ে ঘা মেরে মেরে, ফিরে এসে এসে বুঝতে হবে, সেইভাবে মনকে পিপাসার অভিমুখে ছুটিয়ে দিতে হবে। আর যদি তা না হয়, যা বুঝতে পারে ঠিক তাই বলবার চেষ্টা করি, তবে তার উন্নতির পথে বাধা পড়ে। ছোটো বলে ছেলেদের তুচ্ছ করলে চলবে না। তারা ছোটো বলে নিজেদের কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না। তারা চায় নিজেদেরকে বড়ো বলে জাহির করতে।—এইটেই তাদের স্বভাব, সেইটিকে ভুলতে গেলে চলবে না।'

আমি যে সময়ের কথা বলছি সেটা হচ্ছে গীতাঞ্জলি রচনার

জোয়ার কাল। গুরুদেব নেমে আসতেন শান্তিনিকেতন কক্ষ থেকে সংগীতশালায় ধীর পদে, দিনেন্দ্রনাথ বসতেন এসে এস্রাজ হাতে, আর অজিতকুমার বসতেন সম্মুখে হারমোনিয়ম রেখে।

গানের পরে গান, গানের পরে গান গেয়েই চলেছেন তিনি। শুনে দিনেন্দ্রনাথ বললেন—

—'এ কী কাণ্ড, বরিদা! তুমি কি আর থামতে জান না! এত গান কি আর একসঙ্গে ধরে রাখা যায়?'

—'আরে! তোরা যদি তাই না পারবি তবে যে আমার এ গানগুলি হারিয়ে যাবে। আমার মনের মধ্যে কত বিচিত্র রকমের সুর ও বাণী এসে ধাক্কা দিচ্ছে।'

আমি ছিলাম সংগীতশালার মধ্যে, নাতি ঠাকুর্দার কথাবার্তায় অবাক হয়ে সে দিনটিকে বেশ উপভোগ করেছিলাম।

মনে আছে, একদিন গুরুদেব আমাদের ডেকে বললেন, 'আমি বাণী শুনেছি। আজ সে বাণীর কথা তোমাদের কাছে বলবো, অনেকদিন তাকে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয়বার আমার বাণী এসে হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করে যায়। কিছুদিন কোনো প্রকারে তাকেও ঠেকিয়ে রাখি। তোমাদের কাছে সেই বাণীর কথা তখনো কিছু বলিনি। না বলায় অপরাধ করেছি। বার বার দু'বার অগ্রাহ্য করেছি, দূরে ঠেলে রেখেছি। কিন্তু তৃতীয়বার, এবার যখন বাণী এল তখন আর কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারছি না। ঠেকাতে গিয়ে দেখছি সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। আজ আর নয়— কোনো মতেই না।

—'আশ্রমে মাছ-মাংস খাওয়া বন্ধ করে দিলাম। আশ্রমের প্রবেশ পথের প্রশস্ত প্রস্তর ফলকে মহর্ষিদেবের নিষিদ্ধ বাক্য লিখিত আছে তা কি তোমরা দেখনি? তাকে আমি অগ্রাহ্য করেছি অমান্য করেছি এতকাল, আর কিছুতেই করব না। আমি বিশেষভাবে অপরাধী, অগ্রাহ্য অমান্য করায়। আর নয়। বন্ধ হল আশ্রমে মাছ খাওয়া মাংস খাওয়া। চলবে—নিরামিষ আহার।'

গুরুদেবের এমনতরো কঠিন কথায় সকলের মনে অসন্তোষ গুন্‌গুনিয়ে উঠল—যেমন ওঠে গুন্‌গুনিয়ে মৌমাছিরা মধুচক্রে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হলে, মন্দির হতে উঠে বাইরে এসে দাঁড়ালেন, তখন শিক্ষক মহাশয়গণের মধ্যে কেউ কেউ বললেন: 'গুরুদেব, মাছ মাংস বাদ দিলে ছেলেদের বাড়ন্ত শরীর আশ্রমে কী করে টি'কবে? কী করে পড়াশুনো খেলাধুলা করবে? কেবল ডাল ভাত খেয়ে শরীর কী বাঁচে? আপনি তো জানেন—কোন্ দূরে সেই বোলপুর সহর, নানা প্রকারের যথেষ্ট তরিতরকারী সেখান থেকে আনা কঠিন। আর মেলাও ভার। মহা মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে যে বাস করছি। এখানে না আছে ভালো প্রচুর দুধ, না আছে যথেষ্ট পরিমাণ ঘি, আছে বলতে কিছুই নেই। মাছ মাংস না দিলে ছেলেরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে গিয়ে খাবে কী? আপনার এই আশ্রম বিদ্যালয় উঠে যাবে।'

উত্তরে গুরুদেবের দৃঢ় কণ্ঠের কথা।—'উঠুক। বাণীর অধিক আমার বিদ্যালয় নয়—সে যতই আমার প্রিয় হোক। বাণীর উপরে আর কিছুই না। বাণীই সবার উর্ধ্বে।

—'কিন্তু সবাই জানবেন ধ্রুব করে—আমার এ বিদ্যালয় উঠবার নয়। উঠতে পারে না। এর মৃত্যু নেই। অমর হয়ে থাকবেই। যে বিদ্যালয় সত্যের উপরে, জ্ঞানের উপরে, অন্তরের প্রেমের উপরে প্রতিষ্ঠিত, যে বিদ্যালয় মহান ধর্মের উপর দাঁড়িয়ে দূর দূরান্ত হতে ছাত্রমহলকে শিক্ষকমহলকে আহ্বান করবে শিক্ষা পেতে, শিক্ষা দিতে সমগ্র বিশ্ববাসীকে, সেই বিদ্যালয়কে চিরঞ্জীব হতেই হবে।

—'আর শুনুন এক কথা—যে-সব অভিভাবকদের আমার উপর যথেষ্ট বিশ্বাস আছে, যাঁরা আমাকে প্রকৃত শ্রদ্ধা ভক্তি করেন, তাঁরা ছেলেদের আমার কাছে পাঠাবেনই, না পাঠিয়ে পারবেন না।'

এরপর আমরা সবাই জানি গুরুদেব গুরুতর পরিশ্রম করে ভালো ঘি, ভালো দুধ, ভালো মাখন এ সবের ব্যবস্থা করেন, আর এও জানি শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পুত্র সন্তোষ মজুমদার

মহাশয়কে ভালো ভালো গরু মহিষ নিকট ও দূর হতে আশ্রমে আনিয়ে ঐসব জোগাড়ের কাজে বহাল করেন।

রাত্রে শয্যা গ্রহণের পূর্বে প্রত্যেক ছাত্র নিজ নিজ Dormitoryর শিক্ষক মহাশয়কে প্রণামান্তে শেষটায় যেত গুরুদেবের কক্ষে তাঁর পদধূলি ও আশীর্বাদ নিতে, এই ছিল তখনকার নিয়ম।

গভীর রাত, জ্যোৎস্না প্লাবিত। গুরুদেব তাঁর দ্বিতল কক্ষ থেকে এসে আমাদের Dormitoryর (শয়নকক্ষ) শালবীথি ধরে গুন্‌গুন্‌ করে পায়চারিতে রত ছিলেন। আমার তখন ঘুম ভেঙে যাওয়ায় বিছানা হতে উঠে তাঁর পাশ ধরে চলেছি। খানিক পরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'কী, এত রাতেও আপনি ঘুমোন নি?'

—'হ্যাঁ, ঘুমিয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় শুনতে পেলাম আপনার মধুর কণ্ঠের গুন্‌গুন্‌ আওয়াজ। তাই উঠে এলাম।' একত্র কিছুক্ষণ পায়চারির পর তিনি আমায় বললেন—'যান, এখন শুতে যান। অনেক রাত হল।'

আমি নত হয়ে তাঁর পদধূলি নিতেই বলে উঠলেন—'প্রণামের নিয়ম রেখেছি ছাত্রদের জন্য, শিক্ষক মহাশয়দের জন্য নয়, আপনাদের প্রণাম আমার পায়ে এসে পড়ে বটে, কিন্তু অনেক সময়েই আমি সংকোচ অনুভব করি।'

উত্তরে বললাম—'তা হোক। যদি আমরা ধূলি নিয়ে তৃপ্তি লাভ করি, নিজেদের ধন্য মনে করি তবে তা থেকে বঞ্চিত করবেন কেন আপনি আমাদের!'

গুরুদেব যখন বাইরে থেকে আশ্রমে ফিরতেন, তখন সন্ধ্যার সময় আমরা সবাই মিলে তাঁকে ঘিরে বসতাম আর তিনি নানা ধরনের গল্প বলতেন আমাদের। এমন একদিন আমরা তাঁকে বলি—'গুরুদেব, এবারকার 'মানসী' পড়েছেন?' 'হ্যাঁ পড়েছি। কিন্তু কি হয়েছে?' 'মানসীতে চিত্রাঙ্গদার উপর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কী ভীষণ আক্রমণ, পড়েন নি?—' 'হ্যাঁ পড়েছি, কি হয়েছে?' 'এর একটি কঠিন প্রতিবাদ লিখবেন না?—' 'না, লিখতে যাব না।

কথাটি কি শুনুন—একটি বৃক্ষ তার শিকড়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে মৃত্তিকার মধ্য হতে রস টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে তার বৃন্তের ফলকটিকে অল্পে অল্পে পাকিয়ে তোলে। যতক্ষণ সে বৃন্তে আছে ততক্ষণই ফলটি বৃক্ষের। যেই মুহূর্তে সেই পরিপুষ্ট সুপক্ক ফলটি বৃক্ষচ্যুত হয়ে ভূতলে পতিত হল তখনই সে মৃত্তিকার। বৃক্ষের যোগ, বৃক্ষের দাবি ছিন্ন হল। ফলটি তখন সকলের। দেবতার ভোগেও লাগতে পারে, আবার শেয়াল কুকুর যত সব পশু পাখি—এদের ভোগেও লাগতে পারে। তেমনি আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে চিত্রাঙ্গদাকে পাকিয়ে রাঙিয়ে তুলে বাক্সবন্দী করে যতক্ষণ রেখেছিলাম ততক্ষণই চিত্রাঙ্গদা ছিল আমার। আর যেই মুহূর্তে বাক্সের বন্দী অবস্থা হতে মুক্ত হয়ে যন্ত্রালয়ের শালা হতে বাইরে এসে দাঁড়াল, তখন সে বিশ্বের। যেমন-ভাবে যে গ্রহণ করতে পারবে তেমনভাবেই হবে সে তার। লেখকের এ বিষয়ে বলবার কিছু থাকবে না।’

জীবনে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে পেরে ধন্য হয়েছি, জীবনের গূঢ়তম তাৎপর্যের ইঙ্গিত পেয়েছি তাঁর সংস্পর্শে এসে। অতীতের স্মৃতিচারণ সেই অমৃতের স্পর্শ এনে দেয় জীবনে।

গুরুপল্লীর সূচনাপর্ব

সুধাময়ী মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন আশ্রমের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯১০ সনের গ্রীষ্মাবকাশ থেকে। সেখানে গুরুপত্নীদের মধ্যে আমি একজন। আমি যখন প্রথম আশ্রমে আসি, তখন গুরুপল্লীর কুটিরগুলি হয়নি। ঐ জায়গাটা তখন প্রায় আশ্রম-সীমানার বাইরে, ধূ-ধূ করছে মাঠ। আমাদের প্রথম আস্তানা হল এখনকার শিশুবিভাগের ঘরের কাছে দুটি কুটীরের মধ্যে একটি, আর একটিতে থাকতেন জগদানন্দ রায় মহাশয় তাঁর বড়ো মেয়ে আর নাতি-নাতনীদের নিয়ে। এই কুটীর দুটি এখন আর নেই। ক্ষিতিমোহনবাবুরা থাকতেন 'দেহলী'র পাশের বাড়িতে, সেখানেও কুটীর—নাম তার 'নতুন বাড়ি'। শুনেছি এই নতুন বাড়ি তৈরি হয়, যখন কবিগুরুর স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকতে আসেন। তারপর এই বাড়িতে থাকতেন আশ্রমের অধ্যাপকরা ২।৩টি পরিবার একত্রে। দেহলীতে থাকতেন গুরুদেব। প্রতিমা দেবীরা কখনো থাকতেন শ্রীনিকেতনে নতুন কেনা কুঠিবাড়িতে, কখনো দেহলীতে। দেহলীর সামনে 'দ্বারিক' তখন সবে তৈরি হয়েছে। তার দোতলায় বিশ্বভারতীর কলাভবনের পত্তন হচ্ছিল। মাঝের হল ঘরটিতে আশ্রমবাসীরা প্রায়ই সমবেত হতেন সন্ধ্যায় গুরুদেবের কাছে। তখন তিনি কিছু পড়তেন, তারপর চলত আলাপ আলোচনা। দ্বারিকের প্রায় লাগাও ছিল 'লেবুকুঞ্জ'; যেখানে থাকতেন মীরা দেবী—গুরুদেবের ছোটো মেয়ে। ছাত্রদের থাকবার 'বীথিকা' ঘর তখন ছিল দেহলী থেকে অল্প দূরে শালবীথির পাশে। দ্বারিক, বীথিকা, লেবুকুঞ্জ—তিনটি ঘরই এখন আর নেই। 'বেণুকুঞ্জে' থাকতেন তখন দিনুবাবু। আমাদের কুটীর থেকে কয়েক পা দূরে—চারখানি লম্বা কুটীরের সারি—শমী কুটীর, মোহিত কুটীর, সতীশ কুটীর আর সত্য কুটীর। যাঁদের নামের স্মৃতি বহন করছে এই কুটীরগুলি, তাঁদের মধ্যে শমী ছিল গুরুদেবের ছোটো ছেলে—

আশ্রমের ছাত্র। অল্প বয়সে সে মারা যায়, বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে অসুখ হয়ে। মোহিতচন্দ্র সেন ছিলেন আশ্রমের প্রথম দিককার অধ্যক্ষ, তিনি ছিলেন গুরুদেবের বন্ধু সাহিত্যরসিক। তাঁর সম্পাদিত কবিগুরুর কাব্যগ্রন্থগুলি তাঁর সাহিত্যরসানুভূতি পরিচায়ক। সতীশচন্দ্র রায় ছিলেন আশ্রমের অধ্যাপক। তরু বয়সে তাঁর প্রতিভার বিকাশ ও ঋষিবালক-সুলভ সরলতা দেখে কবিগুরু তাঁকে সস্নেহে টেনে নিয়েছিলেন আশ্রমের কাজে, কিন্তু অকালে এ জীবন ঝরে পড়ে জীবনের সব কাজ অসমাপ্ত রেখে; তাঁর গুরুদক্ষিণা বইখানিতে তিনি রেখে যান তাঁর গুরুদক্ষিণা। সেই বইখানিও বুঝি কালের স্রোতে ভেসে গেছে; তার সন্ধান এখনকার আশ্রমবাসীরা রাখে না। সত্য কুটীরের মধ্যে লুপ্ত আছে সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের স্মৃতি। ইনি ছিলেন আশ্রমের অধ্যাপক এবং চিকিৎসক। কবিগুরু তাঁর মেজো মেয়ে রেণুকার বিয়ে এঁর সঙ্গে দেন। আশ্রমের কাজে তিনি আপনাকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু অকালে এঁরও জীবনের সমাপ্তি ঘটে। এই কুটীর চারটি ছিল আশ্রম-বালকদের পঠন, শয়নের স্থান। প্রত্যেক কুটীরে দুই-একজন অধ্যাপক থাকতেন বালকদের সঙ্গে; বালকদের কর্মসূচী ছিল নিয়ন্ত্রিত। প্রত্যুষে উঠে পালাক্রমে তাদের ঘর ঝাঁট দিত হত; তারপর চলত তাদের কর্মধারা—স্নান, প্রাতঃরাশ, বৈতালিক, আসন ও বই নিয়ে গাছতলায় ক্লাস করতে যাওয়া। ছেলেদের সঙ্গে যে অধ্যাপকরা থাকতেন, তাঁরা করতেন ছেলেদের পড়ার (Study) সময় সাহায্য—ব্যায়াম, স্নান, খেলাধূলা নির্দিষ্ট সময়ে তারা করছে কিনা তাঁরা দেখতেন। বৈতালিকে অধ্যাপকরা সকলে উপস্থিত থাকতেন। রান্নাঘরে খেতে যাবার সময়ে ছেলেরা নিজেদের থালা, বাটি, গ্লাস সঙ্গে নিয়ে যেত। খাবার পর নিজেরাই সেগুলি ধু এনে রাখত নিজেদের জায়গায় ঐ কুটীরগুলির মধ্যে।

১৯১৯ সনে আশ্রমের গ্রীষ্মাবকাশ ফুরালে আশ্রমবালকদের কলগুঞ্জনে হতো আশ্রম মুখরিত। আশ্রমবাসিনী গুরুকন্যা

গুরুপত্নীদের সঙ্গে এর মধ্যে হয়েছে আমার ঘনিষ্ঠ যোগ। তাঁদের কাছ থেকেই জেনেছিলাম কবিগুরুর একান্ত ইচ্ছা—আশ্রমবালকদের কাছে টেনে নেন গুরুপত্নীরা—যেন তাদের বাড়ির কতকটা অভাব পূরণ হয় এঁদের স্নেহে। বড়োমা, দিনুবাবুর স্ত্রী কমল বৌঠান, মীরাদি—এঁরা সব আশ্রমের ছেলেদের খাওয়াতেন মাঝে মাঝে। আমার উপরেও ভার পড়ল, পালাক্রমে দুটি করে ছেলেকে রোজ বাড়িতে এনে খাওয়াতাম। সন্ধ্যাবেলা মাঝে মাঝে আমার ডাক পড়ত বিনোদন পর্বে ছেলেদের গল্প বলার জন্য।

আশ্রমের পরিধি বাড়ার সঙ্গে ক্রমে গুরুপল্লীর ন-দশখানি কুটীর এক সারিতে তৈরি হয়। ন-দশটি অধ্যাপক-পরিবার আমরা চলে এলাম সেই পল্লীতে। পল্লীগ্রামের পল্লীর মধ্যে যেমন আগে ছিল সকলের মধ্যে একটি আন্তরিক যোগ, আমাদের গুরুপল্লীতেও ছিল তেমনি। প্রত্যেকের অসুখে বিসুখে, সুখে দুঃখে সহায় ছিলেন প্রত্যেকে। সেই পল্লীতে ছিলেন নন্দলালবাবু, জগদানন্দবাবু, ক্ষিতিমোহনবাবু, প্রমোদবাবু, হরিবাবু, নেপালবাবুর পরিবার। মনে পড়ে, ছুটে গেছি ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রীর কাছে—ছেলের অসুখ, নিজের অসুখের জন্য ওষুধ ও ব্যবস্থা চেয়ে পাঠিয়েছি ক্ষিতিমোহন-বাবুর কাছ থেকে। নেপালবাবু আসতেন বাড়ি বাড়ি সকলের খোঁজ নিতে। কারও বাড়িতে অতিথি আসলে, হয়তো কোনো জিনিসের দরকার তখনই ; ঘরে তা নেই, প্রতিবেশীদের কাছে গিয়ে তা পাওয়া গেল। বাড়ির কোনো উৎসবে প্রতিবেশী গৃহিণীরা এসে কাজের ভার নিয়ে তা সুসম্পন্ন করতেন।

গুরুপল্লীর ছোটো ছেলেমেয়েরা খেলার সময় জড়ো হত এসে প্রায় রোজই আমাদের বাড়ির উঠানে। এখানকার প্রধান আকর্ষণ ছিল একটি পেয়ারা গাছ। সেই গাছে পাড়ার এমন ছেলে বা মেয়ে ছিল না—যে উঠে পেয়ারা খায়নি। হয়তো দু-তিনজন একসঙ্গে উঠে সেখানেই মারামারি করতে করতে একসঙ্গে পড়েছে নীচে। তাদের এখানকার আর একটি আকর্ষণ ছিল—গান আর

অভিনয়ের সাহিত্যসভা ও পত্রিকার জন্য লেখা। এই সব ছেলে-মেয়েরা ছিল এত ছোটো যে বিদ্যালয়ে তাদের যাওয়া চলে না। অথচ তাদের দেহমনের উদ্যমের খোরাক তারা চায়। তাই থেকে থেকেই চলত তাদের অভিনয় গুরুপল্লীর উঠানে গাছতলায়। কখনো 'বাল্মীকি প্রতিভা', কখনো কামিনী রায়ের লেখা 'একলব্য', কখনো 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা', কখনো বা 'রামের বনগমন'। এই রামের বনগমন লিখে দিয়েছিলেন সুজিত মুখোপাধ্যায় এদের জন্য। সুজিত মুখোপাধ্যায় তখন ছাত্র; এখন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক। শুধু নাটক লিখে দিয়েই তিনি ছাড়া পান নি। এদের রীতিমত শেখানো, অভিনয়ের দিন সাজানো সবই করতে হয়েছিল তাঁকে। ছেলেদের সাজাতে আসতেন আরও অনেকে। সত্যেন বিশী আর কলাভবনের কোনো কোনো ছাত্রও আসতেন।

গুরুপল্লীতে আমাদের বাড়িটি ছিল সব বাড়িগুলির প্রায় মাঝখানে আর এই বাড়ির পিছনেই একটি বাড়ি থাকায় দু-বাড়ির মাঝখানে উঠানটি ছেলেমেয়েদের জমায়েত হবার পক্ষে বেশ ভালো জায়গা ছিল। এখানে খেলাধূলা নাচ গান অভিনয় তারা করত নিঃসংকোচে। সাহিত্যসভাও জমত এখানে তাদের। কিছুটা বড়োদের কাছ থেকে সহায়তা পেয়ে তারা তাদের ভাষায় কত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা লিখত; সভায় পড়ত। তারপর সেই লেখাগুলি তাদের হাতের লেখা পত্রিকা 'হাতেখড়ি'তে মাসে মাসে বার করত। এইসব ছোটো ছেলেমেয়ে যাদের গানে, নাচে, লেখায় হাতেখড়ি হয়েছিল গুরুপল্লীর আঙিনায়—তারা কেউ কেউ পরে বড় হয়ে নাম করেছে। যেমন—মমতা, হাস্নুর নাম হল নাচে, মোহরের (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়) গানের আদর তো এখন সর্বত্র।

গুরুপল্লীর ছেলেমেয়েরা তাদের 'হাতেখড়ি' পত্রিকার জন্য একটি লেখা চাইতে গেল গুরুদেবের কাছে। কবিগুরুর কাছে এই সব অর্বাচীনদের ছিল অবাধ গতি। অনায়াসে তারা দল বেঁধে গিয়ে দাবি করল তাঁর হাতের লেখা। তিনি তাদের পরদিন আসতে

বললেন। মহানন্দে তারা পরদিন গিয়ে দেখল তাদের জন্য লেখা তৈরি, চার লাইন কবিতা :

লেখার কথা মাথায় যদি জোটে
লিখতে তখন পারি আমি হয়তো,
কঠিন লেখা নয়কো কঠিন মোটে
যাতা লেখা তেমন সহজ নয়তো।

গুরুদেব আশ্রমবালকদের সাহিত্যসভায়ও মাঝে মাঝে উপস্থিত থেকে, সভাপতি হয়ে তাদের উৎসাহ দিতেন। বালকদল তাঁকে শোনাবার জন্য মহা আনন্দে গান, আবৃত্তি, অভিনয় করত। আর 'শারদোৎসব', 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনী' ইত্যাদি নাটকে তো তিনি নিজেও অভিনয় করতেন ছাত্র অধ্যাপকদের সঙ্গে। অনাড়ম্বর স্বাভাবিক সে সব অভিনয়ের স্মৃতি মনের মণিকোঠায় জমা হয়ে আছে দুর্লভ রত্নের মতো।